সুকুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৭২২/১১
শ্রেণী সং



একাদশ বর্ষ ১৩৩০

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অদ্ভুত জীব ...	১৫৫	আঁধারে ...	২২৯
অপরাজিতা ফুলের কথা ...	১৯৪	আলিবিয়া ...	১৬৬
অদ্ভুত চাকর ...	১৯৮	ইতর প্রাণীর বুদ্ধি ...	৩০৮
অদ্ভুত ফল ...	২৯১	উতঙ্ক মেঘ ...	১৩৭
অঘ্রাণ ...	২৩৮	উৎসর্গ ...	২৫২
অভিমান ...	২৪২	উৎসবের রাজা ...	২৭৪
অগ্নি পরীক্ষা ...	২২	উড়ুক্কু জানোয়ার ...	২৮৬
অতি লোভের সাজা ...	১০৪	১৯২৪ ...	৩১৯
অফুরাণ ...	২০৩	উষা ও সূর্য্য ...	৫৭
অন্ধের আশ্চর্য্য শিক্ষা ...	৩৮৩	এগ্‌বার্টের লাঞ্ছনা	২২৬, ২৬২, ২৯৪, ৩২৬, ৩৭০
আজব জীব ...	২১	ঐ যা ! ...	২২৫
আবর্জ্জনায় ফলে সোণা ...	৯১	কাজের ফিকির ...	১৭৭
আশ্চর্য্য কবর ...	১৫৭	কাঁকড়া ...	২১৬
আনন্দ ...	১৯৩	কাকের জাত ...	২৫৩
আকাশে ওড়া ...	১৮৮	কালোর মাঝে আলো ...	৩৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিছু চাই	২১১
কুশ্রী	২৮৯
কুমীর চড়া	৩৫০
কৃপণ	১৫
ক্রীসাসের শান্তি	২
খুঁতখুঁতে হাঁস	১২৬
খেলা	২৯২
খেলোয়াড়	৩৩১
খেলাধূলা	৩১৩, ৩৩৫
ক্ষমা	২৫৭
গল্প-স্বল্প	৩৪৯
গাছের গোড়ায় শিকড় কেন ?	৫
গাছের শিক্ষা	৮৮
গাছ ত নয় কুমীর	১৫০
গোপালের পড়া	৮৯
গুহক চণ্ডাল	৮৬
গ্রীষ্ম	৩৩
ঘুমের ঘোরে	৮৫
চাঁদের বাতি	৯৭
চিনির কথা	১৪০
চিনে গল্প	৩১১
চীনে মাটির বাসন	৫৯
চেক্ চোবিদানের গল্প	৪০
চোর কে ?	১৮১
ছবির মানে	২২৩
ছুটির খেলা	২১২
ছুরি কাঁচি	২১৮
ছোট ছেলে মেয়ে	১৩০
জলের তলায় ছবি আঁকা	১৫৪
ঠেকে শেখা	১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
ডাকের শিক্ষা	১০৪
তখন আর এখন	২০৯
দান	৩২১
দাবা-বড়ে খেলা	৩৬৫
দুখিয়ার সুখ	২৫৮, ৩১৪, ৩২২, ৩৬৬
দেবধর্ম্ম	২১৯
ধাঁধার উত্তর	৬৩, ৯৬, ১২৭, ৩২০, ৩৫২
নববর্ষ	১
নাগপাশে বাঘ ধরা	৭৬
নাম	৩৮৪
নাচের গুণ	৩১২
নূতন ধাঁধা	৩১, ৬৪, ৯৬, ২৫৬, ৩১৯
পরলোকের মানুষ	৩৪
পশুরাজ	১৭২
পালোয়ান	১৫৬
পালোয়ানজী	৩৪৩
প্রতারণার ছাই	৩৫৬
প্রবাল	১০
প্রসারপিনা	২০৪
প্রতিদ্বন্দ্বী	৩০৪
বড় দিন	২৮৩
বন্য জন্তুর ছবি তোলা	২৪৭
বশীকরণ বিদ্যা	২৪৩
বর্ষার খালে	১২০
বন্ধুর দানে	১০৭, ১৩১
বাহাদুরী	১৯৬
বাঘের মন্ত্র	৪৯
বিষম কাণ্ড	৬৫
বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস	২৯
বিষম ভোজ	১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বুমরাং	১২২
বেবুনের বুদ্ধি	২৭৮
বৈশাখ	৯
ভালরে ভাল	৫৪
ভাবুক	১৭১
ভূতের গল্প	২৪০
মরুভূমিতে প্রাচীন সহর	৩৫
মনের কথা	১২৯
মানুষ মুখো	১২০
মায়ের আদর	৩৮০
মার্কপলো	১৮৫
মাম্মির পা	৩৭৭, ৩৬১
যুদ্ধের গল্প	৭৩
রবর	৩৪০
রঘু রাজার দান	১৮
রাত্রের ঘোড়া	৬৬
লক্ষ্মী ছেলে	১৪২
শনির দৃষ্টি	১১২
সময় হারা	৩২
সমুদ্রের ফুল	৭৪
সময়ের মাপ কাঠি	৯৩
সর্ব্বনেশে ঘর	২১৪
সন্দেশ	২৫১, ২৬২
সমালোচনা	৩২৪
সাপের ওষুধ	৩৩২
সাহসের কাজ	১৫২
শিশুর জয়	৩৫৩
সিংলীর ভাগ্য	৯৯
সুন্দরী	৩৪৭
সূর্য্যাস্তে গঙ্গা	২২২
স্বর্গীয় সুকুমার রায়	১৩২
স্বপ্নতরীর সমুদ্র যাত্রা	৬৭, ১১৫
হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী	২৪, ৫৪

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

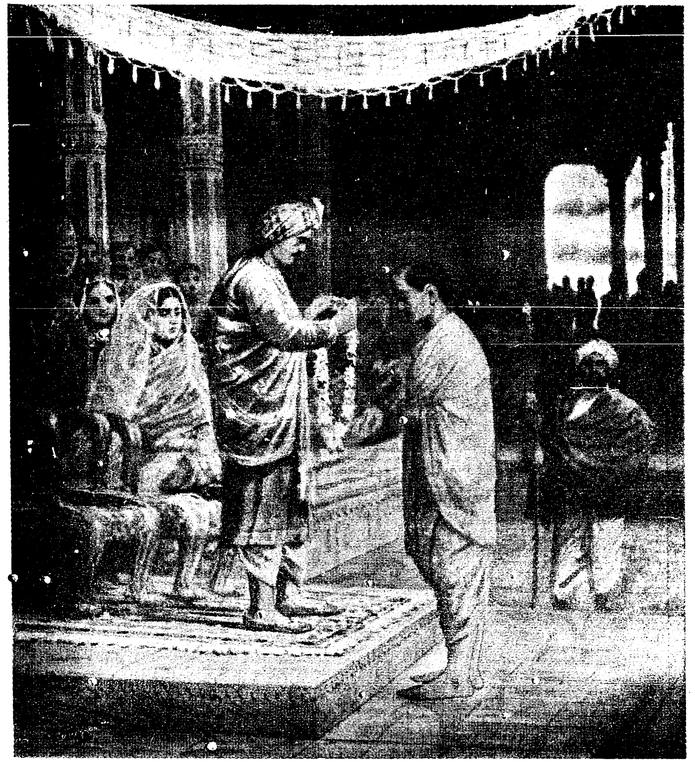

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় কবি কালিদাসের সম্বর্দ্ধনা

পৃষ্ঠা ৩০

নাতি, আমার নাম এড্রাস্‌টাস্‌। হঠাৎ অসাবধানতাবশতঃ আমি আমার নিজের ভাইকে মেরে ফেলেছি বলে, বাবা আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।”

ক্রীসাস্‌ বল্‌লেন—“ও! তুমি দেখ্‌ছি তাহলে আমারই এক মিত্র-পরিবারের ছেলে। তোমার ভয় নাই, তুমি বন্ধুদের মধ্যেই এসেছ। আজ থেকে যতদিন তুমি আমার আশ্রয়ে থাকবে, ততদিন তোমার কিছুরই অভাব হবে না।” সেদিন থেকে এড্রাস্‌টাস্‌ও সুখে রাজপ্রাসাদে থাক্‌তে লাগল।

এই সময়ে মিসিয়ান ওলিম্পাস্‌ নামে একটা পাহাড়ে জায়গায় একটা ভীষণ রাক্ষুসে বুনো শূয়র থাকত। শূয়রটা প্রায়ই পাহাড় থেকে নেমে গ্রামে এসে বড় উৎপাত করে; শস্যটস্য সব নষ্ট করে দেয়। সেইজন্য গ্রামবাসীরা সকলে মিলে শূয়রটাকে মারবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকে মারা দূরের কথা, সেটাই উল্টে লোকজন মেরে সাবাড় করে দিয়েছে। তখন সকলে মিলে ঠিক করল যে, একজন দূত পাঠিয়ে রাজা ক্রীসাসের কাছে সাহায্য চাইবে।

ক্রীসাস্‌ ছেলের বিয়ে এবং এড্রাস্‌টাস্‌কে আশ্রয় দিবার পর সবে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এমন সময় আবার হঠাৎ মিসিয়ানবাসীদের দূতেরা এসে বল্‌ল—“মহারাজ! বড় বিপদে পড়েছি আমরা। আপনি সাহায্য না কর্‌লে আর উপায় নাই। একটা বুনো শূয়র আমাদের বড় উৎপাত কর্‌ছে। আমাদের অনেক লোকও মেরেছে। আমরা কিছুতেই আর তার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ছি না। আপনি যদি আপনার ছেলেকে আর তাঁর সঙ্গে কিছু সৈন্য দেন তবে বড় উপকার হয়।”

দূতের প্রার্থনা শুনেই ক্রীসাসের দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি মহা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—“না, না, তা হবে না। ছেলের আমি সবে বিয়ে দিয়েছি, এখন সে যেতেই পারে না। তবে আমার শিকারী কুকুরগুলো আর অনেক বাছা-বাছা লিডিয়ান সৈন্য তোমাদের সাহায্যের জন্য দেবো।”

এই প্রস্তাবেই দূতেরা মহা খুসী হয়ে চলে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ এটিস্‌ সেখানে উপস্থিত হয়ে সব গণ্ডগোল করে দিল। সে কোত্থেকে জানি সব জান্‌তে পেরে, ক্রীসাসের কাছে এসে বল্‌ল—“বাবা, কোন দিনত আপনি আমাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেননি, বরং চিরকাল উৎসাহ দিয়েই এসেছেন। কিন্তু আজ কেন আপনি এ আদেশ করেছেন! কোনদিন কি আমার মধ্যে কোন কাপুরুষতার লক্ষণ

PAGES MISSING.

দেখেছেন? হয় আমাকে শূয়র শিকার কর্‌তে যেতে দিন্, নয় আপনার আপত্তি কিসে বলুন।"

ক্রীসাস্ ছেলের কথা শুনে বল্‌লেন—"এটিস্! তোমার ভেতর কাপুরুষতা বা এমন কিছু দেখিনি যাতে তোমাকে যেতে বারণ কর্‌ছি। কিন্তু জান? তোমার বিষয়ে আমি বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।" এই কথা বলে তিনি এটিস্‌কে স্বপ্নের কথা আগাগোড়া সব বল্‌লেন; আরো বল্‌লেন যে, এই জন্যই তিনি তাকে এত সাবধানে রাখ্‌ছেন, যাতে করে নাকি স্বপ্নের কথাটা মিথ্যা হয়ে যায়।

এটিস্ একটু হেসে উত্তর কর্‌ল—"বাবা! জানি তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেই এরকম বলেছ। কিন্তু আমার ত অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হবে দেখেছ? শূয়রের কি হাত আছে যে অস্ত্র ছুড়বে? এ ত আর আমি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে যাচ্ছি না? কাজে কাজেই তুমি অনুমতি দাও।" পুত্রের এই কথায় পিতা আর কি করেন বাধ্য হয়ে তাকে যেতে অনুমতি দিলেন আর বল্‌লেন—"এটিস্! তুমি স্বপ্নের কথাটা অন্যভাবে নিয়ে আমাকে জব্দ করে দিলে দেখ্‌ছি।" পুত্রকে যাবার অনুমতি দিয়ে, তিনি এড্রাস্‌টাস্‌কে ডেকে বল্লেন—"এড্রাস্‌টাস্! আমার ছেলেকে যেন পথে কোন দস্যু আক্রমণ না করে। এই সব বিপদ থেকে তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য তোমাকেও তার সঙ্গে যেতে হবে।" এই শিকারে যেতে কিছুতেই এড্রাস্‌টাসের ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু মহারাজের আদেশ বলে সে হাসিমুখেই যেতে রাজি হল।

ফ্রিজিয়ান সৈন্যদের ভেতর হৈচৈ পড়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শিকারী কুকুর আর লোকজন নিয়ে এটিস্ শূয়র শিকারে রওনা হ'লেন। ওলিম্পাস পৌঁছিয়েই সব সৈন্য চারধারে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর চার্‌দিক থেকে তাড়া দিয়ে দিয়ে অনেক কষ্টে শূকরটাকে খুঁজে বের করে, সকলে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে বর্ষা ছুড়্‌তে লাগ্‌ল। বেচারা এড্রাস্‌টাস্‌ও আর সকলেরই মত বর্ষা ছুড়েছিল। কিন্তু হায়! তার বল্লম গিয়ে লাগ্‌ল ঠিক এটিসের বুকে, সঙ্গে সঙ্গে এটিস্‌ও মাটিতে পড়ে গেলেন। আর ক্রীসাসের স্বপ্নও ফলে গেল।

তক্ষুণি একজন লোক ছুট্‌ল রাজাকে এ দারুণ সংবাদ দিতে। একে ত ছেলের মৃত্যু সংবাদে ক্রীসাসের ভয়ানক দুঃখ হয়েছে, তার উপর যখন শুন্‌লেন যে, এড্রাস্‌টাসের হাতেই এটিসের মৃত্যু হয়েছে, তখন আর তাঁর দুঃখের সীমা রইল না।

কিছুক্ষণ পরেই লিডিয়ানরা এটিসের মৃতদেহ ধরাধরি করে নিয়ে এল আর সকলের পিছনে এল এড্রাস্‌টাস্। সে এসে মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে ক্রীসাসের দিকে ফিরে বল্‌ল—"পূর্ব্বের অপরাধের বোঝাই বইতে পারি না, তার উপর আবার যিনি আমাকে বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁরই সর্ব্বনাশ করলাম আমি! সুতরাং আমার আর বেঁচে থাক্‌বার ইচ্ছা নাই।"

এড্রাস্‌টাসের এই বিলাপ শুনে নিজের দুঃখসত্ত্বেও তার জন্য ক্রীসাসের মনে বড় দয়া হ'ল, তাকে কাছে ডেকে বল্‌লেন—"বন্ধু! যা হবার তা হয়ে গেছে, তার জন্য তুমি আর দুঃখ করো না। ভেবে দেখ্‌তে গেলে এতে তোমার কোন দোষ নাই, এ শুধু ভগবানই আমার অহঙ্কারের সাজা দিয়েছেন। আমি আগেই বিপদের আভাস পেয়েছিলাম।" তারপর তিনি উপযুক্ত সমারোহের সঙ্গে ছেলেকে গোর দিলেন। কিন্তু হতভাগ্য এড্রাস্‌টাসের মনে আর কিছুতেই শান্তি এ'ল না। সকলে যখন চলে গেল, সে আস্তে আস্তে এটিসের কবরের কাছে গিয়ে নিজেই আত্মহত্যা করল। এইরূপে প্রাণাধিক পুত্রকে এবং বন্ধু এড্রাস্‌টাসকে হারিয়ে ক্রীসাসের দুঃখের আর সীমা পরিসীমা রইল না।

শ্রীইলা রায়।

গাছের গোড়ায় শিকড় কেন?

আদ্যিকালের কথা কেউ ভাল ক'রে জানে না; তবে, শোনা যায় যে তখন নাকি গাছেদের গোড়ায় শিকড় থাকৃত না; তারা যেমন ইচ্ছা চলাফেরা ক'রে বেড়াত। তা'তে পশুপাখীদের খুবই অসুবিধা হ'তো। হয়ত বেচারারা দিব্যি আরামে গাছের উপর বাসা বেঁধেছে কিম্বা গাছের গোড়ায় বাসা বানিয়েছে;—আর সন্ধ্যার সময় যেই তারা একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, অম্‌নি গাছেরাও যে-যা'র হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। পশু-পাখীরা ফিরে এসে দেখে, গাছেরা কে কোথায় স'রে গেছে তার ঠিক নেই; নিজের বাসাই খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়ত এক-জনের বাসা খোলা মাঠেই পড়ে রয়েছে,—গাছ সেখান থেকে স'রে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়ে হয়ত বৃষ্টি নেমেছে। যাবার সময় তারা দেখে

গিয়েছিল পথের দু'ধারে সারি সারি গাছ, কিন্তু বৃষ্টি নাম্‌লে তারা চেয়ে দেখে যে, সব ফাঁকা ;—গাছেরা কোথায় জানি বেড়াতে গিয়েছে। বড় অসুবিধার কথা!



এই সব ব্যাপারে সকলেই চ'টে যেতো ; কিন্তু বাঘ বেজায় রাগী লোক, তাই তার রাগ হ'তো সকলের চাইতে বেশী। সে যখন রাগের মাথায় 'হালুম-হালুম' ক'রে চীৎকার কর্‌ত, তখন সকলেই তাকে খুসী কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'তো। বাঘ যতই রাগী হোক না কেন, একটি জিনিষ পেলেই তার মেজাজটি হ'তো ঠাণ্ডা ; সেটি হচ্ছে পুলি-পিঠে। সে জন্যই জন্তুরা পালা ক'রে তা'কে পুলি-পিঠে খাওয়াবার ভার নিত।

ভাল্লুক ছিল পুলি-পিঠে বানাবার ওস্তাদ ; সে সব জন্তু আর পাখীদের পুলি-পিঠে বানাতে শিখিয়েছিল ; বাদে কেবল শেয়ালকে। সে কিছুতেই শিখ্‌বে না। সকলে তা'কে যখন বল্‌ত, "তোমার পালা এলে কর্‌বে কি? বাঘ যা রাগী, পুলি-পিঠে না পেলে তোমাকে ত গিলেই খাবে।" তখন শেয়াল বল্‌ত, "তোমাদের অত ভাবনার দরকার কি? আমার ভাবনা আমিই ভাব্‌ছি।"

শেষটায় একদিন শেয়ালের পালা এসেই পড়্‌ল। গাছেরা সব হাওয়া খেতে বেরিয়েছে ; বাঘ সন্ধ্যার আগে ফিরে গাছেদের দেখ্‌তে না পেয়ে রেগে খুন!



চীৎকারের চোটে অন্য সকলে ভয়েই অস্থির ; শেয়ালের কিন্তু কোন হুঁসই নাই। সে একমনে একটা গল্পের বই প'ড়েই চ'লেছে। গল্পটা ছিল অতি চমৎকার ;—কিঞ্চিকিং দেশের রাজা আর তার শিংওয়ালা হাতীর গল্প। বাঘ শেয়ালের অবস্থা দেখে মনে কর্‌ল, গল্পটা নিশ্চয়ই খুব ভাল ; না হ'লে শেয়াল অত মনোযোগ দিয়ে পড়্‌বে কেন? সেও পিছন থেকে উঁকি মেরে গল্পটা একটু প'ড়ে দেখ্‌ল। অম্‌নি আর যাবে কোথায়, একেবারে ঘাড় নীচু ক'রে গল্পে মেতে গেল ; রাগ-টাগ তার কোন্ চুলোয় গেল তার ঠিক নেই।

গাছেরা ফিরে এসে বাঘ আর শেয়ালের ঐ রকম অবস্থা দেখে, একবার উঁকি মেরে না দেখে পার্‌ল না। গল্পটা এতই চমৎকার যে গাছেরাও একটুখানি প'ড়ে আর ছাড়্‌তে পার্‌ল না। চারিদিকে তারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ব'লে বড় অন্ধকার হয়েছিল। ক্রমে সন্ধ্যাও হয়ে এল। শেয়াল তখন আস্তে আস্তে বইখানা বন্ধ ক'রে একটু মুচ্‌কি হেসে, তারপর একেবারে 'হো হো' ক'রে হেসে উঠ্‌ল। বাঘ জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হাস্‌ছ কেন?" শেয়াল তার কাণে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি জানি বল্‌ল আর অম্‌নি বাঘও হেসে গড়াগড়ি!

তারপর রাত হয়ে গেলে বাঘ শেয়াল আর অন্য সব জন্তুরা মিলে একটা গর্ত্ত

খুঁড়ে তার মধ্যে বইটা পুঁতে ফেল্‌ল। সকালে উঠে গাছেদের ডেকে শেয়াল বল্‌ল, "গাছভায়ারা! কালকে যে চমৎকার গল্প পড়্‌ছিলাম, সেই গল্পের বইটা



মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। মাটি খুঁড়ে যদি বই বের ক'রে নিতে পার, তবে বইটা তোমরা পড়্‌তে পাবে।" গাছেদের গল্পটা খুবই ভাল লেগেছিল, তাই তারা তখনই মাটি খুঁড়্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বইটা এক কোণে লুকান হয়েছিল;—গাছেরা সেইখানটাই খুঁড়েনি। কাজেই তারা সহজে বইটা বের কর্‌তে পার্‌ল না। যতই গাছেরা মাটি খুঁড়্‌ছে, ততই জন্তুরা গর্ত্তে মাটি দিচ্ছে। শেষটায় যখন বেশ গভীর গর্ত্ত হলো আর গাছেদের কয়েকটা ডালপালাও মাটিতে ঢুকে গেল, তখন তারা একেবারে মাটিতে আট্‌কা প'ড়ে গেল। সেই ডালপালাগুলোই নাকি আজকাল গাছের শিকড় হয়েছে, আর সেই ঘটনার পর থেকেই নাকি সব গাছেরই শিকড় থাকে।

শ্রীসুবিনয় রায়।

বৈশাখ

তারকা বিশাখা আসে, দূরে আকাশের পাশে
সুরু হয় ঝড়ের আসর,
নিয়ে তার আগমনী, আমরা বরষ গণি;
হালখাতা, নূতন বছর!
বনে আর উপবনে গাছেরা প্রলয় গণে,
পুরাতন কেঁদে চলে যায়,
ঝড়ে পাতা উড়ে পড়ে, ফুলের পাপড়ি ঝরে,
ভূমিতলে লতিকা লুটায়।
আসে নূতনের পালা, চারিদিকে ডাল পালা,
পরে সাজ সবুজ পাতার,
মুকুল আমের শাখে, অশোকে পাতার ফাঁকে
তাজা রাঙা ফুলের বাহার!
নিম গাছ সেও আজ, পরেছে ফুলের সাজ,
অতীতের তিতো গেছে ভুলে,
আশা আর ভালবাসা, আজি মনে তারি বাসা
কচি পাতা ফল আর ফুলে!
যদিও সাঁজের বেলা, কাল ব'শেখের খেলা
কালো মেঘ আর ধূলো ঝড়,
ঝর ঝর বৃষ্টি ঝরে, থেকে থেকে বাজ পড়ে,
বিজুলি দেখিয়া লাগে ডর,
তবু রাতে তারা হাসে স্নিগ্ধ বায়ু আশে পাশে
মৃদু পায়ে করে বিচরণ,
আলো ধোয়া ভোর বেলা ফুলের আনন্দ মেলা
গানে গানে ভরা ত্রিভুবন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রবাল

লোকে কথায় বলে, "সাত রাজার ধন এক মাণিক।" ভাল হীরার মত দামী জিনিষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। হীরা অনেক সময়ে মানুষের নানা রকম কাজে আসে না, কিন্তু কাজের জিনিষ বলিয়া ইহার দাম নয়। ইহার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মানুষ ইহাকে মাথার মুকুটে গলার হারে গাঁথিয়া পরে। কিন্তু আমরা জানি সামান্য কয়লা ও হীরা প্রায় একই জিনিষ। মুক্তারও দাম খুব; কিন্তু মুক্তাও অতি সামান্য পোকার খোলার ভিতরে, সেই পোকার গায়ের রসে তৈয়ারী হয়। তেমনি, প্রবালের সুন্দর লাল রং দেখিয়া লোকে ইহাকে আদর করিয়া অলঙ্কার রূপে ব্যবহার করে, যদিও প্রবাল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের দেশে যাঁহারা লঙ্কায় যান, তাঁহারা সেখান হইতে প্রবাল ও প্রবালের তৈয়ারী নানারকম গহনা লইয়া আসেন, দেখিয়াছি। প্রবাল সমুদ্রে জন্মায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমুদ্রে প্রবাল থাকে, খুব শীতে থাকিতে পারে না। খুব গভীর সমুদ্রেও প্রবাল প্রায় থাকে না। অল্প জলের নীচে সাধারণতঃ প্রবাল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবালের খবর আগে লোকে বিশেষ কিছু জানিত না। সমুদ্রে জাল ফেলিয়া জেলেরা মাঝে মাঝে মাছের সঙ্গে প্রবাল পাইত। সেগুলি দেখিতে অনেকটা পাথরের ফুলের মত দেখায়। প্রবাল যে কেবল লাল হয় তাহা নয়, শাদা এবং কখন কখন মেটেরংও হয়। লোকে ইহাকে সমুদ্রের নীচের এক রকম ফুল বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু ফুল কি করিয়া এত শক্ত হইল, ভাবিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইত। জেলেরা অনেক সময়ে বুঝাইয়া দিত যে, প্রথমে যখন জালে উঠে তখন প্রবাল ফুলের মত নরমই থাকে, পরে বাতাস লাগিয়া শক্ত হইয়া যায়।

কিন্তু ডুবুরীরা যখন সমুদ্রের জলে নামিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা দেখিল যে, প্রবাল জলের উপরে যেমন, জলের নীচেও তেমনি শক্ত। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রবালের বিষয়ে অনেক কথা জানা গিয়াছে। তাহারা দেখিতে ফুল বা গাছের মত হইলেও, বাস্তবিক তাহারা একরকম অতি ছোট জীব এবং শামুক গুগ্‌লির চেয়েও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যেগুলিকে এক একটি ফুলের বা গাছের মত দেখায়, সেগুলি একটিমাত্র প্রবাল নয়, অসংখ্য প্রবাল একসঙ্গে থাকিয়া একটি ফুলের মত হইয়াছে।

এমন সামান্য জীবেরও জীবনের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জলের নীচে পাথরের গায়ে এক একটি প্রবালের ঝাড় দেখা গেল। তাহার গোড়াটা শক্ত পাথরের মত, খুব শক্ত হইয়া পাথরের গায়ে লাগিয়া আছে, ঠিক যেন একটি গাছের গুঁড়ি। সেই গুঁড়ি হইতে প্রবাল ক্রমে ডাল পালা মেলিয়া উপরে উঠিয়াছে। অবশ্য প্রবাল নানা আকারের হয়। এই ঝাড়ের গোড়ার দিকটাকেই আমরা প্রবাল বলিয়া জানি। পাখীতে ডিম পাড়ে, অন্যান্য অনেক জীব জন্তুর সন্তান হয়, কিন্তু প্রবালের বংশ বাড়ে কি করিয়া? সে এক মজার ব্যাপার। ঠিক যেমন গাছের একটি কুঁড়ি বাহির হয় ও সেইখান হইতে ডাল বা পাতা বা ফুল বাহির হয়, সেই রকম প্রবালের গায়ে কুঁড়ির মত বাহির হয়। সেই কুঁড়ি হইতে ক্রমে অন্য একটি প্রবাল জন্মায় কিন্তু নূতন প্রবাল পুরাণ প্রবালকে ছাড়িয়া যায় না, তাহারই গায়ে লাগিয়া থাকে এবং নূতন ডালপালার মত গজায়। সেই নূতন প্রবালের গায়ে আবার নূতন প্রবাল জন্মায়। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রবালের ঝাড় বাড়িয়া চলে।



প্রবালের কুঁড়ি

প্রবাল পাথরের মত শক্ত বলিয়াছি। প্রবালের ঝাড়ের উপরদিকটা কিন্তু শক্ত নয়, নরম মাংসল মত। যতটুকু নরম ততটুকু জীবন্ত; যতটা শক্ত ততটা প্রবালের কঙ্কাল মাত্র। এই কঙ্কাল খায় না বা বাড়ে না। খায় না এইজন্য বলিলাম—আমরা যেমন খাই, প্রবালও কতকটা সেই রকমই খায়। জল হইতে সে খাবার সংগ্রহ করিয়া তাহার নিজের দেহ পুষ্ট করে। কিন্তু এই রকম এক জায়গায় বাঁধা থাকিতে তাহার ভাল না লাগিবার কথা, অনেক অসুবিধা হইবার কথা। সকল প্রবালকে সারা জীবন এইরকম অচল থাকিতে হয় না। প্রবালের আগায় যেমন কুঁড়ি হয়, অনেক সময় তাহার গোড়ায় তেমনি গোল গোল ডিমের মত জন্মায়। ক্রমে সেই ডিমগুলি খসিয়া পড়ে এবং সময়ে ফুটিয়া নূতন রকমের প্রবাল হইয়া জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। তখন তাহাদের শরীর নরম থল্‌থলে থাকে। কিছুদিন পরে তাহারাও আবার জলের নীচে কোন পাথরের গায়ে, আঁটিয়া বসে ও ডালপালা মেলিয়া নূতন ঝাড়ের সৃষ্টি আরম্ভ করে। জল হইতে তাহারা যে খাবার নেয়, সেই খাবার হইতেই তাহাদের শরীরে পাথরের মত শক্ত জিনিষটা তৈয়ারী

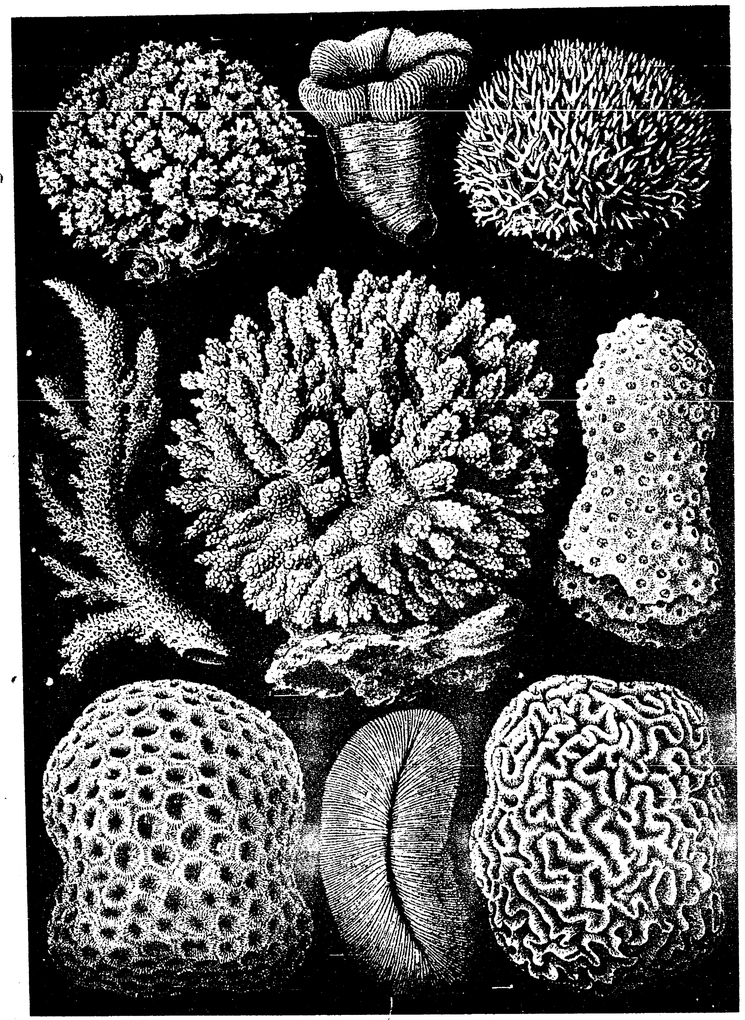

নানা রকমের প্রবাল

হয়। প্রবাল মরিয়া গেলে তাহার মাংসল ভাগটা পচিয়া যায়, শক্ত কঙ্কালটুকু পড়িয়া থাকে।

প্রবাল দেখিতে কত রকমের ও কেমন সুন্দর হয় তাহার কয়েকটি ছবি দেওয়া গেল।

কেবল সুন্দর অলঙ্কার উপহার দিয়া যে প্রবাল মানুষের কাজে লাগে তাহা নহে। এই সামান্য জীব পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত কাজ করে যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রবাল স্বভাবতঃই অনেকগুলি একসঙ্গে বসতি করে। কত যুগ ধরিয়া তিল তিল করিয়া, তাহারা কঙ্কালের উপর কঙ্কাল সাজাইয়া আসিতেছে, তাহার ফলে সমুদ্রের মধ্যে বড় বড় প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রের ধারে হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া নূতন জমি প্রস্তুত হইতেছে। অনেক সময়ে দেখা যায়, প্রবালদ্বীপগুলি বালার ধরণের গোল হয়। জলের নীচে অনেক পাহাড় আছে। যদি এইরকম কোন পাহাড়ের চূড়ার চারদিক ঘিরিয়া প্রবালের বসতি হয়, তবে প্রবালেরা যুগের পর যুগ নিজেদের কঙ্কাল সাজাইয়া, গোলভাবে কঠিন জমি প্রস্তুত করিতে থাকে। সেই জমি ক্রমে উঁচু হইয়া যখন জলের উপরে উঠে, তখন সুন্দর গোলাকৃতি প্রবাল দ্বীপ সৃষ্ট হয়। কত সময়ে সেই সব দ্বীপে গাছপালা দেখা দেয়, জীব জন্তুর বসতি হয়।

শ্রীসুখলতা রাও।

ঠেকে শেখা

একজন ভদ্রলোকের একটা বদ্ অভ্যাস ছিল; তিনি রোজ আফিসে যেতে দেরী কর্‌তেন। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে বিছানা থেকে সহজে উঠ্‌তে চাইতেন না। এক ঘণ্টা কেবল এপাশ ওপাশ কর্‌তেন, তারপর গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে কুড়ি মিনিট খালি হাই তুলতেন। কোন কোন দিন এত দেরীতে উঠ্‌তেন যে, স্নান করবার সময় পেতেন না, কোন মতে চারটি ভাত মুখে গুঁজে আফিসে দৌড়াতেন। তার জন্য ভদ্রলোকের শরীরও খারাপ হচ্ছিল, আফিসের কাজেরও ক্ষতি হচ্ছিল, কিন্তু তিনি তবু ঘুম থেকে উঠ্‌তে দেরী করতেন।

একদিন তিনি উঠে দেখেন যে, ভাত খাবার আর সময় নাই, আফিসে যাবার বেলা হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পথের একটা দোকান থেকে কয়েকটা

কচুরি আর একটা রসগোল্লা কিনে নিয়ে, তাই খেতে খেতে আফিসের দিকে ছুট দিলেন। একটু দূর যেতেই একটা চীল ছোঁ মেরে কচুরির ঠোঙাটি নিয়ে গেল; তিনি একরকম না খেয়েই আফিসে গেলেন। আফিসে গিয়েই তাঁর মনে হ'ল—ঐ যা! তিনি কচুরিওয়ালাকে একটা টাকা দিয়েছিলেন, খাবারের দাম ত হয়েছিল মোটে ছয় পয়সা, কিন্তু আফিসে যাওয়ার তাড়ায় বাকী পয়সা ত ফেরত নেওয়া হয়নি! সুতরাং সেদিন ভদ্রলোকের খাওয়াও হ'ল না, অথচ টাকাও গেল— অচেনা দোকানদার টাকার কথা কিছুতেই স্বীকার কর্‌ল না। তিনি সেদিন ঠিক কর্‌লেন যে আর ঘুম থেকে উঠ্‌তে দেরী কর্‌বেন না।

কিন্তু পরদিনও তিনি উঠ্‌তে এত দেরী কর্‌লেন যে, ভাত খাবার আর সময় পেলেন না, তাড়াতাড়ি শুধু একটু দৈ খেয়ে আফিসে ছুট্‌লেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একটা ষাঁড়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে, তিনি রাস্তায় পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুট্‌তে লাগ্‌লেন। খানিকদূর গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখ্‌তে পেলেন। তিনি ভাব্‌লেন যে গাড়ীতে গেলে অল্প সময়ের ভিতর আফিসে পৌছাতে পারবেন, তাই ছুটে গাড়ী ধর্‌তে গেলেন। কিন্তু গাড়ী ধর্‌বার আগেই একটা আমের খোসায় পা পড়াতে পা পিছ্‌লিয়ে গেল। নিজেকে সাম্‌লাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি পাশের একজন কাবুলীওয়ালার জামা খাম্‌চিয়ে ধর্‌লেন। হঠাৎ জামায় টান পড়াতে কাবুলীওয়ালা একপাশে কাৎ হয়ে পড়্‌ল আর নিজেকে বাঁচাবার জন্য পাশের এক পুলিসের পাগ্‌ড়ীতে খাম্‌চিয়ে ধর্‌ল। পুলিসের মাথা থেকে পাগ্‌ড়ী তখনি খুলে এল, তাই কাবুলীওয়ালা সেই ভদ্রলোকের উপর প'ড়ে গেল। ভদ্রলোকটি কাদাটাদা মেখে অনেক কষ্টে উঠে, কাবুলী আর পুলিসকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে একটা গাড়ী ধর্‌লেন। ততক্ষণে আফিসে যাবার সময় অনেকক্ষণ হ'ল পার হ'য়ে গিয়েছে।

গাড়ী আফিসের কাছে এসে থামবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামতে গিয়েছেন, আর অমনি গাড়ীর দরজার এক পেরেকে জামার পকেট আট্‌কিয়ে গিয়ে, প্রায় আধ হাত জামা ফ্যাঁস্ ক'রে ছিঁড়ে গেল। তারপর গাড়োয়ানকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখেন যে তাড়াতাড়িতে পয়সার ব্যাগ্ বাড়ীতে ফেলে এসেছেন। তারপর আফিসে যেই ঢুক্‌ছেন অমনি আফিসের লোকেরা তাঁকে দেখেই 'একি মশাই! একি ক'রেছেন!' বলে চীৎকার ক'রে উঠেছে। তিনি ব্যাপার বুঝ্‌তে

না পেরে আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দেখেন যে, বাড়ী থেকে দৈ খেয়ে আস্‌বার সময়



তাড়াতাড়িতে ভাল ক'রে মুখ মুছ্‌তে পারেন নি, তাই সমস্ত দাড়িতে আর গোঁফে দৈ লেগে রয়েছে। নিজের দই মাখা চেহারা দেখে সেদিনই তিনি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন যে, আর কখনও ঘুম থেকে উঠ্‌তে দেরী কর্‌বেন না। তখন থেকে তিনি প্রতিদিন সকালে উঠ্‌তেন আর আফিসে যেতেও দেরী হ'ত না।

শ্রীসুবিমল রায়।

কৃপণ

এক কৃপণ যখন শুন্‌লে যে তার চেয়েও একজন কৃপণ সেই গ্রামে বাস করে, তখন সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, 'তাই ত, আমি মুখে খুব বড়াই কর্‌তুম যে আমার চেয়ে কৃপণ বুঝি জগতে নাই! যাহক্, দেখ্‌তে হবে সে কি রকম আমার

চেয়েও কৃপণ।' এই ভেবে সে একখানা গামছা কাঁধে করে, একটা মাটীর ঘটি, একটা ভাঁড় ও একখানা বাতাসা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুল। রাস্তায় যেতে যেতে যখনই তার তেষ্টা পায়, বাতাসাটি এক ভাঁড় জলে একবার ডুবিয়ে তুলে নেয়, তারপর সেই জল পান করে। এই রকম কর্‌তে কর্‌তে সে তার পথ চল্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে সেই কৃপণও যখন শুন্‌লে, যে তার চেয়েও একজন কৃপণ এই গ্রামে বাস করে, তখন সেও একটা লাঠি আর একটা সন্দেশ নিয়ে বেরুল। পথে যেতে দুজনের সঙ্গে দেখা। প্রথম কৃপণ, যে ঘটি, ভাঁড় আর বাতাসা নিয়ে বেরিয়েছিল, সে বল্‌লে, "মহাশয়, এই গ্রামে একজন কৃপণ বাস করে, আপনি কি তাকে জানেন?" তখন দ্বিতীয় কৃপণ বল্‌লে, "আমিই সেই কৃপণ।" তখনই দুজনের কোলা-কুলি কার্য্য সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তাহার পর প্রথম কৃপণ বল্‌লে, "আসুন, আমরা উভয়েই ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত। এখানেই কিছু জল-যোগ করা যাক্।"

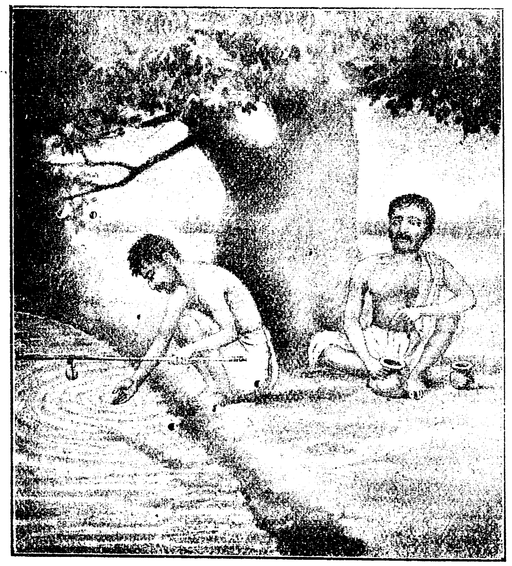

দ্বিতীয় কৃপণ বল্‌লে, "তাই হোক্।" তারপর তারা এক পুকুর ধারে এক গাছতলায় এসে বস্‌ল। প্রথম কৃপণ আগেকার মত সেই বাতাসা-খানি এক ভাঁড় জলে ডুবিয়ে সেই জলটুকু পান ক'রে, জলযোগ শেষ কর্‌লে। দ্বিতীয় কৃপণ যে সন্দেশটি সঙ্গে এনেছিল সেইটি সেই লাঠিতে বাঁধ্‌লে, তারপর জলের ধারে এসে সেই লাঠিটাকে জলের উপরে ধরলে। সন্দেশের প্রতিবিম্ব সেই জলের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা



পট্‌লা ট্যাঁপা ব্যস্ত দু'জন টপ্‌টপাটপ্‌ মিঠাই ভোজে,
হঠাৎ দেখে কার দুটো হাত এগিয়ে তাদের কাণটি খোঁজে।

উপর পড়ল। সে সেই সন্দেশের প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে লাগ্‌ল আর হাতে করে জল পান কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন প্রথম কৃপণ মনে মনে ভাব্‌লে যে "এ একজন কৃপণের মত কৃপণ বটে! এর মত কৃপণ হতে হলে, আমাকে অনেক দিন এর কাছে থেকে শিখ্‌তে হবে।"

শ্রীগদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষম ভোজ

"অবাক্ কাণ্ড!" বল্‌লে পিসী, "এক চাঙাড়ি মেঠাই এল—
এই ছিল সব খাটের তলায়, এক নিমিষে কোথায় গেল?"
"সত্যি বটে" বল্‌লে খুড়ী, "আন্‌ল দু'সের মিঠাই কিনে—
হঠাৎ কোথায় উপ্‌সে গেল? ভেল্কিবাজি দুপুর দিনে?"
"দাঁড়াও দেখি" বল্‌লে দাদা, "কর্‌ছি আমি এর কিনারা
কোথায় গেল পট্‌লা ট্যাঁপা—পাচ্ছিনে যে তাদের সাড়া?"
পর্দ্দাঘেরা আড়াল দেওয়া বারান্দাটার ঐ কোণেতে
চল্‌ছে কি সব ফিস্ ফিস্ ফিস্ শুন্‌ল দাদা কানটি পেতে।
পট্‌লা ট্যাঁপা ব্যস্ত দু'জন টপ্‌টপাটপ্‌ মিঠাই ভোজে,
হঠাৎ দেখে কার দুটো হাত এগিয়ে তাদের কানটি খোঁজে।
কানের উপর প্যাঁচ্ ঘোরাতেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ছোটে,
গিল্‌বে কি ছাই মুখের মিঠাই, কাণ বুঝি যায় টানের চোটে।
পটল বাবুর হোম্‌রা গলা মিল্‌ল ট্যাঁপার চিকণ সুরে
জাগ্‌ল করুণ রাগরাগিণী বিকট তানে আকাশ জুড়ে।

COLOURED DOCUMENT.

রঘুরাজার দান

(রামায়ণ)

[ফাল্গুনের সন্দেশে বাহির হইয়াছিল—দিলীপ রাজার যজ্ঞের ঘোড়া দেবরাজ ইন্দ্র চুরি করিলে, দিলীপের পুত্র রঘু ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বাঁধিয়া অযোধ্যায় লইয়া আসেন। তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁহাকে মুক্তি দিলেন বটে কিন্তু ইন্দ্রকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে—তখন হইতে ইন্দ্র প্রতিদিন অযোধ্যার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পাহারা দিবেন, যাহাতে শস্যের কোন ক্ষতি না হয়।]

দিলীপ রাজার মৃত্যুর পর রঘু অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া, প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। যাগ যজ্ঞ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগকে এতই দান করিতেন যে, তাঁহার ধনাগার শূন্য হইয়া যাইত, কিছুই সঞ্চয় থাকিত না। তাঁহার নিজের কোনই জাঁকজমক ছিল না,—মাটির থালায় ভাত খাইতেন, মাটির গেলাসে জলপান করিতেন।

সেই সময়ে মহামুনি কশ্যপের এক শিষ্য ছিল, তাঁহার নাম বরদত্ত। কশ্যপের কৃপায় বরদত্ত সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলে, তাঁহার ইচ্ছা হইল, গুরুকে কিছু দক্ষিণা দেন্। গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো! আপনাকে কি দক্ষিণা দিব অনুগ্রহ করিয়া বলুন।" কশ্যপ বলিলেন—"বৎস! তোমাকে চৌষট্টি রকম বিদ্যা শিখাইয়াছি। যদি দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাকে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দাও।"

গুরুর কথা শুনিয়া শিষ্যের ত চক্ষু স্থির! মনে মনে ভাবিলেন—"এখন এই চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাইব কোথায়? আচ্ছা, লোকে বলে রঘুরাজা নাকি বড়ই দানশীল। দেখি, তাঁহার নিকট চৌদ্দকোটি সোণা ভিক্ষা পাই কিনা।" এই ভাবিয়া, বরদত্ত গুরুর নিকট এক সপ্তাহের সময় চাহিয়া লইলেন।

গুরুর নিকট বিদায় হইয়া বরদত্ত অযোধ্যায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুর প্রাসাদে ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার—বরদত্ত বিনা বাধায় একেবারে রাজার অন্তঃপুরে গিয়া উপস্থিত! দেখিলেন, রঘু মাটির থালায় খাইতে বসিয়াছেন এবং মাটির গেলাসে জলপান করিতেছেন। দেখিয়া বরদত্ত ভাবিলেন—"ভাল লোকের নিকট মাগিতে আসিয়াছি! নিজেই মাটির গেলাসে জল খান, আমাকে ইনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিবেন কি?" এই ভাবিয়া বরদত্ত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, রাজা দেখিতে

পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া খুব আদর যত্ন করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! আপনি আসিয়াছিলেনই বা কেন আর আমাকে কিছু না বলিয়াই বা চলিয়া যাইতেছেন কেন?"

রাজার কথায় বরদত্ত বলিলেন—"মহারাজ! তুমি পুণ্যবান্, তোমার কাছে দান লইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, আমাকে আর দান করিবে কি? নিজেই ত মাটির পাত্রে খাইতে বসিয়াছ!" রঘু বলিলেন —"ঠাকুর! আপনার কত ধন চাই বলুন। যদি না দিতে পারি তবে আমার যেন অর্গলাভ না হয়।" বরদত্ত বলিলেন—"আমি চৌদ্দকোটি স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা চাই।"

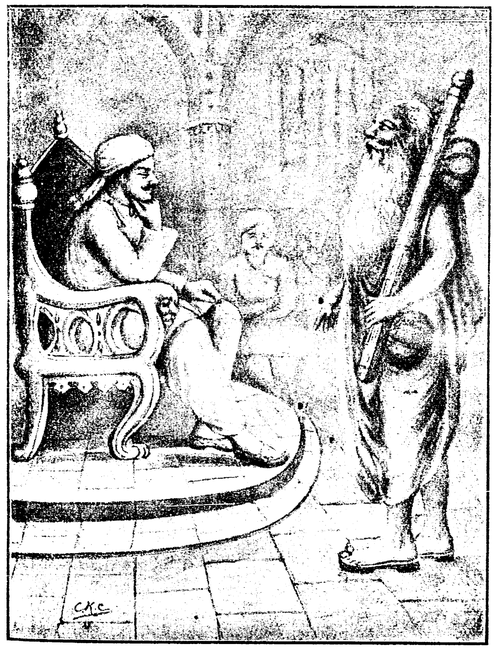

রাজা বলিলেন—"বেশ! আজ, রাত্রিটা আমার বাড়ীতে থাকুন, কাল প্রাতে আপনাকে চৌদ্দ-কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিব।"

সেই রাত্রে রঘু বড় বড় বণিকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন —"যে আজ রাত্রে আমাকে চৌদ্দকোটি স্বর্ণমুদ্রা কর্জ দিতে পারিবে, কাল প্রাতঃকালে তাহাকে চৌদ্দ- দশ কোটি দিয়া ঋণ শোধ করিব।" রাজার কথা শুনিয়া বণিক্‌গণ বলিল—"মহারাজ! আপনার রাজ্যে চার কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে কিনা সন্দেহ, চৌদ্দ কোটিত দূরের কথা!"

রাজা রঘু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন—কি উপায় হইবে? এমন সময় মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত। রাজাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,

রঘু সব ঘটনা বলিলেন। শুনিয়া নারদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "মহারাজ! তোমার কোন চিন্তা নাই। এক কাজ কর, আজই রাত্রে ঢোল পিটাইয়া দাও যে, কাল প্রাতে তুমি কুবেরের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিবে। তবেই দেখিও, চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা তোমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইবে।" এই বলিয়া নারদমুনি তখনই কৈলাস পর্ব্বতে কুবেরের বাড়ীতে যাত্রা করিলেন।

এদিকে রাজা ঢোল পিটাইবামাত্র সমস্ত সৈন্য সাজিতে লাগিল। কুবেরের এক দূত ছিল অযোধ্যায়, সে সব সংবাদ জানিতে পারিয়া, সেই রাত্রেই ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে মহর্ষি নারদও কুবেরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"কুবের! তুমি যে বড় নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ, এদিকে অযোধ্যার রঘু কিন্তু তোমার ভাণ্ডার লুঠিতে আসিতেছে—আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম। এক ব্রাহ্মণ রঘুর নিকট চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা চাহিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাণ্ডারে নাকি একটি পয়সাও নাই।"

রঘুর হাতে ইন্দ্রের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা কুবের বিলক্ষণ জানিতেন। সুতরাং তাঁহার নাম শুনিয়াই কুবেরের দারুণ ভয় হইল। তিনি করিলেন কি, অযোধ্যা হইতে যে তাঁহার দূত আসিয়াছিল, তাহাদ্বারা সেই রাত্রেই রঘুর ভাণ্ডারে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা রঘু বরদত্তকে চৌদ্দকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। বরদত্ত সেই ধন লইয়া গুরু কশ্যপকে দিলে পর তিনি বলিলেন—"বৎস বরদত্ত! আমি তপস্বী মানুষ, বনে পর্ণ-কুটীরে থাকি, এত ধন আমি কোথায় রাখিব? ধনের সন্ধান পাইলেই চোর ডাকাত তাহা লুঠিয়া লইয়া যাইবে। তুমি এই ধন লইয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রাখ। যজ্ঞকালে যখন আমার ধনের প্রয়োজন হইবে, তখন উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসিব।"

বরদত্ত সেই ধন লইয়া ইন্দ্রের নিকটে গিয়া বলিলেন—"দেবরাজ! আমার গুরু কশ্যপ এই ধন দক্ষিণাস্বরূপ পাইয়াছেন, আপনার ভাণ্ডারে ইহা রাখিয়া দিন্।" ইন্দ্র মহা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর! তোমার গুরু দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তিনি এত ধন কোথায় পাইলেন?" বরদত্ত বলিলেন—"গুরুদেব আমার নিকট চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা চাহিয়াছিলেন। আমি পুণ্যাত্মা রঘুরাজার নিকট হইতে এই দক্ষিণার ধন ভিক্ষা করিয়া আনিয়া গুরুকে দিয়াছি।"

রঘুরাজার নাম শুনিয়াই ইন্দ্র "রাম রাম" বলিয়া কাণে হাত দিয়া কহিলেন—"ঠাকুর! রঘুরাজার নাম আমার সাক্ষাতে বলিও না। তাহার ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। সারারাত্রি জাগিয়া অযোধ্যা নগরে তাহার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমাকে ভ্রমণ করিতে হয়। রঘুর ধন দেখিয়াই আমি ভয় পাইতেছি, তুমি এই ধন নিয়া অন্য স্থানে রাখ।"

বরদত্ত ধন লইয়া গুরুর নিকট ফিরিয়া গেলেন। গুরু কশ্যপ, সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"বৎস! তবে তুমি কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া কুবেরের নিকটেই ধন রাখিয়া দাও।"

কুবের সেই ধন পাইয়া ভাবিলেন—"ভালই হইল, যাহার ধন তাহার নিকটেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

আজব জীব

কি ভাই সন্দেশ, বড় যে দেখেও দেখ্‌ছ না? আমায় চেন না বুঝি? তোমার ঘরের কাছেই আমায় কত দেখেছ, তবু পরিচয় জান না? আচ্ছা তাহ'লে পরিচয় দেই।—

আমায় এখন যেমন দেখ্‌ছ, আগে কিন্তু সে রকম ছিলাম না। এখন কেমন দুপায়ে ভর দিয়ে চলে বেড়াই; তখন অন্য অন্য জন্তুরা যেমন চার পায়ে চলে আমিও তেমনি করে চল্‌তাম। তোমাদের এই ডাল ভাত মাছ মাংস এসব কিছুই খেতে পার্‌তাম না। তখন আমার পায়ে এক রকম ধাতুর তৈরী বেড়ী আট্‌কান ছিল, হাতেও সেই রকম ছিল।

আমাদের বাসা তুমি দেখেছ,—কেমন অদ্ভুত বল দেখি? খানিকটা কাঠ আর পোড়ামাটি, লোহা বালি আর মাটির গুঁড়ো, এই রকম সব জিনিস দিয়ে আমরা বাসা বানাই। বাসায় ঢুক্‌বার আর বের হবার জন্য, আলো আর বাতাস আস্‌বার জন্য বাড়ীর গায়ে নানা জায়গায় ফাঁক থাকে, ইচ্ছা কর্‌লে সে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায়।

আমরা অনেক রকম জিনিস খাই। নানা রকম ফল মূল শিকড় এসব ত খাই-ই, তার উপর আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে নানা রকম ঘাসের বীজ। আমরা

সেই সব যত্ন করে সংগ্রহ করে, তা থেকে কত রকমের যে খাদ্য বানাই, শুন্‌লে অবাক্ হবে। এক রকম জন্তু আছে, আমরা তার দুধ খেতে খুব ভালবাসি। তাই অনেক সময়ে সেই রকম জন্তু ধরে এনে আমাদের বাড়ীতে বেঁধে রাখি। এক রকম গাছ হয় দেখ্‌তে অনেকটা বাঁশের মত, আমরা তার থেকে রস বার করে সেই রস জমিয়ে খেতে খুব ভালবাসি।

আমরা কি পরি জান? কোন কোনও ফলে লম্বা লম্বা আঁশ থাকে,—সেই আঁশের জট ছাড়িয়ে, আঁশগুলোকে পাকিয়ে তা থেকে আমরা নানা রকম জাল বুনি। অন্যান্য আঁশাল জিনিস থেকেও এই রকম জাল বোনা যায়। পোকার বাসা, জানোয়ারের লোম, কত রকম জিনিস থেকে যে আঁশ সংগ্রহ হয়, আমিও তার সব খবর জানি না। এই আমার গায়ে দেখ না কত রকম জালের টুক্‌রা জোড়া দিয়ে আমার মা কেমন সুন্দর গা-ঢাক্‌নি বানিয়েছেন। এই রকম জালের মধ্যে চাপ চাপ আঁশ ভরে তার উপর শুতে যা আরাম!

আমাদের মধ্যে নানা রকম অদ্ভুত প্রথা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যারা আমাদের চাইতে বড় তাদের সঙ্গে দেখা হ'লে আমরা সাম্‌নের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দুটো হাত এক সঙ্গে ওঠাই ও নামাই—না হয় মাটি পর্য্যন্ত হাত নামিয়ে একেবারে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ি। কেন করি তা আমি বল্‌তে পারি না।—

কি বল্‌লে? তবু চিনতে পার্‌ছ না? ভাব্‌ছ আমি কোথাকার অদ্ভুত জীব? তা নয় গো, তা নয়। আমি আফ্রিকার হটেন্‌টট্‌ও নই, মালয় দেশের বনমানুষও নই, আমি নিতান্তই তোমাদের বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে—সন্দেশের পাঠক। পরিচয়টা ভুল হ'য়েছেবল্‌ছ? আর একটিবার মন দিয়ে পড়ে দেখ, আগাগোড়া সমস্তই ঠিক বলা হয়েছে দেখ্‌তে পাবে।

অগ্নি-পরীক্ষা

তোমরা দ্বারভাঙ্গার নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। দ্বারভাঙ্গার প্রাচীন নাম মিথিলা। মিথিলা সীতার পিতা জনকের রাজধানী ছিল। এবার দ্বারভাঙ্গা যাইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার কথাই তোমাদের নিকট বলিব।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুরের নিমন্ত্রণে, এবার বিহারপ্রদেশের গভর্ণর সার হেন্‌রী হুইলার সপত্নীক মহারাজ বাহাদুরের রাজধানী রাজনগরে গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে এক হিন্দু যোগী তথায় যে এক আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত।

রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে ২০ হাত দীর্ঘ ২০ হাত চওড়া ও ২ হাত গভীর এক চৌবাচ্চার মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া, তথায় সকাল হইতে কাঠ পোড়ান হইতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে বহুলোক, এক হিন্দু সন্ন্যাসী জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবেন শুনিয়া, সেখানে আসিয়াছিল। অপরাহ্ণে সপত্নীক লাট বাহাদুর, পাটনা



হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর ও অন্যান্য গণ্যমান্য

লোকের সম্মুখে সন্ন্যাসী তাঁহার শক্তি প্রদর্শন করিলেন। সমস্তদিন চৌবাচ্চাতে কাঠ পুড়িয়া বেশ গট্‌গটে আগুন হইয়াছে; সন্ন্যাসীর আদেশ পাইয়া তাঁহার এক শিষ্য প্রথমে তাহার উপর দিয়া খালি পায়ে হাঁটিয়া গেল। তৎপরে সন্ন্যাসীর আদেশ লইয়া বহু লোক অক্ষত শরীরে সেই জ্বলন্ত অগ্নিরাশির উপর দিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে হাঁটিয়া গেল। সেই সব লোকদের মধ্যে মহারাজার কয়েকজন পরিচারিকাও ছিল। কাহারও কোনঅনিষ্ট হইল না। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার আদেশ লইয়া যে কেহ আগুনের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে যাইতে পার"। ইহা শুনিয়া মহারাজার একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীও জুতা-মোজা খুলিয়া আগুনের মধ্য দিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু লাট বাহাদুর ও মহারাজা তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া, তাঁহার সাহসের বহু প্রশংসা করিলেন। ছবিতে দেখ একজন লোক আগুনের উপর দিয়া কেমন হাঁটিয়া চলিয়াছে।

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী

(প্রফেসার হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারী রাগ করেছেন। আমরা সন্দেশে সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানাকথা ছাপিয়েছি; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকারকাহিনীর কোনও উল্লেখ করিনি। সত্যি, এ আমাদের ভারী অন্যায়। আমরা সে সব কাহিনী কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রফেসার হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরী থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এ সব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।)

"২৬ জুন ১৯২২,—কারাকোরম্, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবশুদ্ধ দশজন,—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুইজন শিকারী (ছক্কড় শিং আর লক্কড় শিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

"নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিস পত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজনকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিষ। দু ঘণ্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম, সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড় বড় গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানিনা। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মত মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুল্‌ছে; একটা ফুলের গাছ দেখ্‌লাম তাতে হল্‌দে শাদা ফুল

হয়েছে, এক একটা দেড় হাত লম্বা। আর একটা গাছে ঝিঙ্গের মত কি সব ঝুল্‌ছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝাল গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক্ হয়ে এই সব দেখ্‌ছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্, গুব্‌গাপ্ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স



থেকে দুই টিন্ জ্যাম্ বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগ্‌ল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাক্‌বার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখ্‌তে পেল হাতীর চাইতেও বড় কি একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাস্‌ছে। প্রথমে দেখে মনে হ'ল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তারপর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তারপর দেখি মানুষও নয় বাঁদরও নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মত করে হাস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পঁচিশ ত্রিশটা ফল সে টপাটপ্ খেয়ে শেষ কর্‌ল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেল্‌লাম। তারপর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আস্‌ল। জন্তুটা মহা খুসী হয়ে এক গ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটী আর প্রায় আধ সের গুড় শেষ ক'রে,

তারপর পাঁচ সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলা শুদ্ধ কড়্‌মড়িয়ে খেয়ে ফেল্‌ল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিন্‌টাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু



খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চীৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলা থেরিয়াম্।"

"২৪শে জুলাই, ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর।—এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এত সব গাছপালা জীবজন্তু, যে তারই সন্ধান কর্‌তে আর নমুনা সংগ্রহ কর্‌তে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দু'শ রকম পোকা আর প্রজাপতি, আর পাঁচশ' রকম গাছপালা ফুল ফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোন জ্যান্ত জানোয়ার ধ'রে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক্ কতদূর কি হয়। সেবার যখন কট্‌কটোডন্ আমায় তাড়া করেছিল, তখন সেকথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছি।

"আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরীপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। অমার হিসাবে হল ষোল হাজার ফুট কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব কর্‌ল বেয়াল্লিশ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দুজনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দু'হাজার সাতশ ফুট্। বোধ হয় আমাদের যন্ত্রে কোনও দোষ হয়ে থাকবে। যাহোক্ এটা নিশ্চয় যে এ পর্য্যন্ত ঐ পাহাড়ের চূড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ্ নিজেরা তৈরী করে পথ চল্‌তে হয়।

আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত পা খিঁচিয়ে সে আর্ত্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল। তাই দেখে ছক্কড় সিং "ভাইয়া রে, ভাইয়া" বলে কেঁদে অস্থির। যাহোক, মিনিট দশেক ঐ রকম হাত পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠে বস্‌ল। তখন আমাদের চোখে পড়্‌ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় যে, সংসারে তার কোনও সুখ নেই, এ সব গোলমাল কান্না-কাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোম্‌রাথেরিয়াম। এমন খিট্‌খিটে খুঁত্‌খুতে

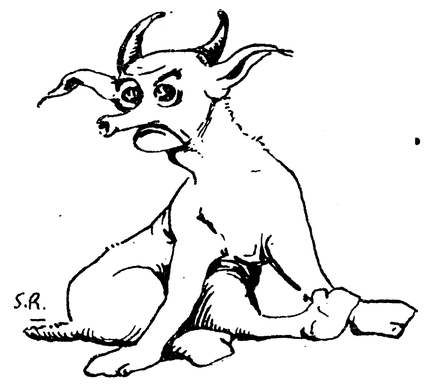

গোমরা মেজাজের জন্তু আমরা আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ-টোয়াজ ক'রে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা ক'রেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রী মত মুখ ক'রে, ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার 'জেলি' মুখে দিতেই এমন চ'টে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল।"

"১৪ই আগষ্ট, বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর।—ট্যাপ্ ট্যাপ্ থ্যাপ্ থ্যাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্।—সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এই রকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উট্‌পাখীর মতন বড় একটা অদ্ভুত রকম পাখী অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন্ দিকে চল্‌বে তার কিছুই যেন ঠিক ঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় ত বাঁ পা ওদিকে; সাম্‌নে চল্‌বে ত পিছনবাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে। তার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভাল করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখ্‌তে পেয়ে সে এমন ভড়্‌কে গেল যে তক্ষুণি হুম্‌ড়ি খেয়ে হুড়্‌মুড়্ করে পড়ে

গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলে দুলে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দেখ্‌তে লাগল। চন্দ্রখাই বল্‌ল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক্।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে! আমি ছক্কড় সিংকে বল্‌লাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তাহ'লে পাখীটা নিশ্চয়ই চম্‌কে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।" ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ কর্‌তেই পাখীটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হ'ল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখীটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখীটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড় সিঙের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়্‌ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখীটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল।



কিন্তু সে আঘাতটা পাখীটার মাথায় লাগ্‌ল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিঙের বুকে। তাতে পাখীটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে উঠ্‌ল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কি তখন! আমি আর দুইজন কুলি ছক্কড় সিঙের জামা ধরে টেনে রাখ্‌ছি, সে আমাদের শুদ্ধ হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁসি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমত ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিঙের কোমর ধরে লট্‌কে আছে, ছক্কড় সিং তাই শুদ্ধ মাটির থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্ বন্ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখীটা যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যাহোক এই ল্যাগ্‌ব্যাগে পাখী বা

ল্যাগ্‌ব্যাগর্ণিসের কতগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস*

রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদের এই ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল যশোধর্ম্মদেব, কিন্তু বিক্রমে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যতুল্য ছিলেন বলে তাঁর এই উপাধিটাই তাঁর নামের মত লোকের মুখে মুখে চলে আস্‌ছে। তাঁর যেমন বাহুবল তেমনি বিদ্যা বুদ্ধি ছিল। দুর্দ্দান্ত হুণদিগকে পরাজয় করে তিনি একদিকে যেমন ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন সভ্যতা রক্ষা করেছিলেন, নানা দেশের অগ্রগণ্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ দান করে তেমনি বিদ্যার প্রচার করেছিলেন। তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে বহু অসাধারণ পণ্ডিত তাঁর সভায় অবস্থিতি কর্‌তেন। এঁদের মধ্যে কেউ হয়ত চিকিৎসা-শাস্ত্রে, কেউ জ্যোতিষে, কেউ শব্দার্থনিরূপণে, কেউ কাব্যে, কেউ ব্যাকরণে, এক একটি বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। এঁদের মধ্যে ন'জন অপর সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে লোকে তাঁদিগকে "নব রত্ন" বল্‌ত। বাস্তবিকই রত্নের ন্যায় তাঁরা বিক্রমাদিত্যের সভা সমুজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। কালিদাস এই নব রত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। এমন কোন শিক্ষিত হিন্দু নাই যিনি কালিদাসের নাম না জানেন। সংস্কৃত ভাষার তিনখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য 'রঘুবংশ', 'কুমার সম্ভব' ও 'মেঘদূত' কালিদাসের রচিত। সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' কালিদাসই রচনা করেছিলেন। তিনি আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, বড় হলে তোমরা তা'দের নাম জান্‌তে পার্‌বে।

বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নাম ছিল উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী এখনও বর্ত্তমান আছে। সিপ্রা নামে একটি নদী এখনও তার পাশ দিয়ে কুল কুল স্বরে, যেন

* কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "ছোট ছোট গল্পের" বিক্রমাদিত্য ও তাল-বেতাল গল্প হইতে সঙ্কলিত। পুস্তকখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিক্রমাদিত্য কালিদাসের কথা গান কর্‌তে কর্‌তে, প্রবাহিত হচ্ছে। বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনীর শোভা ও সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। প্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য উদ্যান, নির্ম্মল জলাশয় তার শোভা বৃদ্ধি কর্‌ত। নানা দেশের বণিকেরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সম্মিলিত হ'ত। এখনও যে বৎসর এখানে কুম্ভ মেলা বসে, সে বৎসর কত লক্ষ যাত্রী সমবেত হয়, তা' গণনা করা যায় না, পথ ঘাট মাঠ যাত্রীতে পূর্ণ হয়। একবার কুম্ভ মেলার উপলক্ষ্যে নানা দেশের বহু সহস্র, ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্ ব্যক্তি উজ্জয়িনীতে আগমন করেছিলেন। তাঁদের সন্তোষ বিধানের জন্য নানারূপ আমোদ প্রমোদের আয়োজন হয়েছিল। আতসবাজী, হাতী ঘোড়ার শোভাযাত্রা, সৈনিকদের যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি সাধারণ লোকের তৃপ্তিকর অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিদ্বান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জনের জন্য মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকও অভিনীত হয়েছিল। যেমন মনোহর দৃশ্যপট তেমনি সুললিত সঙ্গীত এবং তেমনি স্বাভাবিক অভিনয়। দর্শকেরা একেবারে মোহিত হ'লেন। সকলেই একবাক্যে কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বল্‌তে লাগলেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রথম অভিনয়ের পর বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে প্রকাশ্য সভায় সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য সঙ্কল্প করলেন। মহাকালের মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গনে এক মনোহর সভাগৃহ নির্ম্মিত হ'ল। স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বহু মূল্য আসনে উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ নাগরীকগণ এবং কুম্ভমেলায় আগত নানা দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রেণীর পর শ্রেণীক্রমে উপবিষ্ট হলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর প্রধানা মহিষী ভানুমতী দেবীর সঙ্গে এক মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করলেন। তিনি কালিদাসকে সমাদরে আহ্বান করে তাঁর কপালে চন্দনের টীপ এবং কণ্ঠে পুষ্পমাল্য প্রদান করে বল্লেন, "আমি এই মহাসভার প্রতিনিধিরূপে আপনাকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে বরণ কর্‌ছি। অপনার আবির্ভাবে উজ্জয়িনী ধন্য হয়েছে। আপনার জাতি ও সমাজ উন্নত হয়েছে। দেবাদিদেব মহাকালের নিকট আমাদের সকলের প্রার্থনা আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করে, আপনার এই প্রতিষ্ঠা, এই গৌরব ভোগ করুন।" কালিদাস গদ গদ কণ্ঠে রাজার নিকট তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌লেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পুনঃ পুনঃ সাধুবাদের সঙ্গে সভা ভঙ্গ হ'ল।

নূতন ধাঁধা

১। দুইটি আকার মোর, ভুল নাই তাতে—
চক্রবৎ গোলাকার ফিরি হাতে হাতে।
শেষের আকার মোর কেড়ে নিলে পরে
দেহ মোর মোলায়েম ফাঁকা রূপ ধরে।
নিরাকার হ'লে হই অম্বরসময়;
সংসারে সকলে মোর জানে পরিচয়।

২। নানা অর্থে দেখা দেই আমি নানা ভাবে;
গণিতের গণনায় মোরে তুমি পাবে।
মোর পরিচয় লোকে পায় যার মাঝে
তাহারে খাতির করে মানব সমাজে।
ধনুর্দ্ধর যোদ্ধা মোরে ভালমতে জানে;
ডবল হইয়া থাকি মৃদু মৃদু তানে।

৩। নড়ে কিন্তু নাহি চলে, মাঝে মাঝে নাচে,
দেখে কিন্তু নাহি শোনে—সে কি তোর আছে?

৪। প্রথম অক্ষর মোর মুখে আছে বুকে নাই,
দ্বিতীয় কুসুমে আছে, ফুলে তারে নাহি পাই।
তৃতীয় সে ছন্দে থাকে, সুরে নাহি পাবে তায়,
চতুর্থ না থাকে দিনে, রাত্রে তারে দেখা যায়।
মনে থাকে প্রাণে নয়, পঞ্চমের রীতি এই,—
পাঁচে মিলি', দেখ বুঝে, কবি হয় সহজেই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

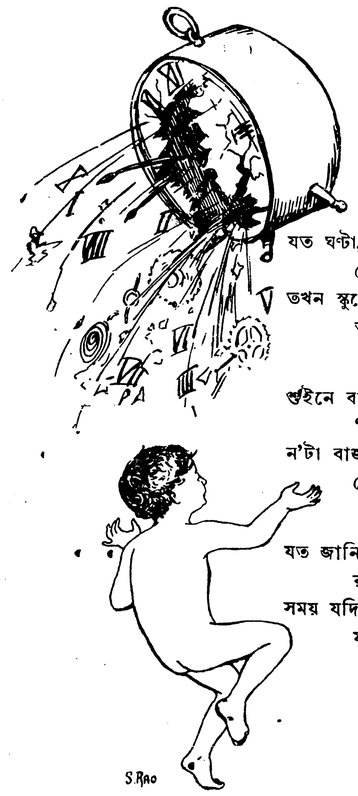

সময় হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মত,
তখন স্কুলে নেইবা গেলেম; কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বল্‌ব, "দশটা বাজাই বন্ধ!"
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্!

শুইনে বলে' রাগিস্ যদি, আমি বল্‌ব তোরে,
"রাত না হ'লে রাত হ'বে কি করে?
ন'টা বাজাই থাম্‌ল যখন, কেমন করে' শুই!
দেরি বলে' নেই ত, মা, কিচ্ছুই।"
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্।

যত জানিস্ রূপ কথা, মা, সব যদি যায় বলে'
রাত হ'বে না, রাত যাবে না চলে';
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না ত খেলা,
ফুরোয় না ত গল্প বলার বেলা!
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

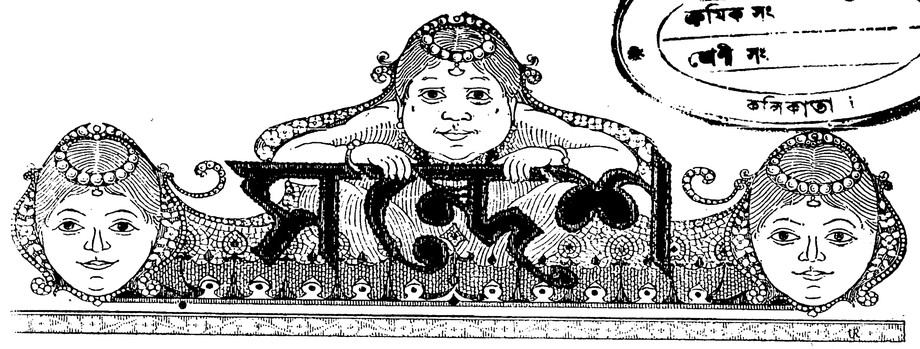

একাদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ | ২য় সংখ্যা

গ্রীষ্ম

সর্ব্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষশেষে রুদ্রবেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে।
তাপিয়ে গগন কাঁপিয়ে ভুবন মাত্‌ল তপন নাচ্‌ল পবন,
রৌদ্র ঝলে আকাশতলে অগ্নি জ্বলে জলেস্থলে।
ফেল্‌ছে আকাশ তপ্ত নিশাস ছুট্‌ছে বাতাস ঝল্‌সিয়ে ঘাস,
ফুলের বিতান শুক্‌নো শ্মশান যায় বুঝি প্রাণ হায় ভগবান।
দারুণ তৃষায় ফির্‌ছে সবায় জল নাহি পায় হায় কি উপায়,
তাপের চোটে কথা না ফোটে হাঁপিয়ে ওঠে ঘর্ম্ম ছোটে।
বৈশাখী ঝড় বাধায় রগড় করে ধড়্‌ফড়্ ধরার পাঁজর,
দশ দিক্ হয় ঘোর ধূলিময় জাগে মহাভয় হেরি সে প্রলয়,
করি তোলপাড় বাগান বাদাড় ওঠে বার বার ঘন হুঙ্কার,
শুনি নিয়তই থাকি থাকি ওই হাঁকে হৈ হৈ মাভৈ মাভৈঃ।

পরলোকের মানুষ

একজন তুর্কী তার স্ত্রীকে নিয়ে দূরদেশে যাচ্ছিল, পথে একটা নালা দেখে সে স্ত্রীকে রাস্তার ধারে বসিয়ে, ঘোড়াটাকে জল খাওয়াবার জন্য নালার দিকে নেমে গেল।

তুর্কী-গিন্নী একলা বসে আছে, এমন সময়ে তার সামনে রাস্তা দিয়ে একটি লোক চলে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কোত্থেকে আস্‌ছ?" লোকটা গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—"পরলোক থেকে।" বুড়ি বেচারা সাদা সিধে মোটা-বুদ্ধি মানুষ—অত ঠাট্টা বোঝে না—একথা শুনেই সে আগ্রহ করে বল্‌ল—"আহা! তাই না কি? ভাগ্যে তোমার সহিত দেখা হয়ে গেল! আমার ছেলে মৌয়ো যে পরলোকে গিয়েছে—তার খবর কিছু বল্‌তে পার? তাকে চেন কি?" পথিক বেশ সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল—"হাঁ, মৌয়োকে চিনি বৈ কি, খুব চিনি।"

"আহা! বাছা আমার সেখানে কেমন আছে?"

"আজ্ঞে, আছে ত এক রকম ভালই, তবে একটা বড় কষ্ট—পয়সা নেই। তামাক আর কফি খেতে এত ভালবাসে, কিন্তু বেচারার কিনে খাবার সাধ্য নেই।" এই কথা শুনবামাত্র বুড়ি তার টাকার থলিটি পথিকের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌ল—"দেখ বাবা, তুমি যদি দয়া করে এইটে, আমার ছেলেকে গিয়ে দাও, তবে বড় উপকার হয়।" পথিকও দ্বিরুক্তি না করে টাকার থলি নিয়ে প্রস্থান কর্‌ল।

একটু পরেই ঘোড়াটাকে জল খাইয়ে তুর্কী ফিরে এল—তাকে দেখেই তার স্ত্রী মহা উৎসাহের সঙ্গে সব কথা বল্‌ল। শুনেই ত বুড়ো বুঝ্‌তে পার্‌ল ব্যাপারখানা কি—তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে সেই লোকটা যে দিকে গিয়েছিল সেই দিকে রওনা হ'ল।

পথিক ত টাকার থলি নিয়ে হৃষ্টমনে চলেছে, হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ফিরে দেখে—ও বাবা! তীরের মতন ঘোড়া ছুটিয়ে একটা লোক তার দিকে তেড়ে আস্‌ছে! এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, কাছেই একটা পাহাড়ের গোড়ায় একটা ময়দার কল রয়েছে দেখে, তার মধ্যে পথিক ঢুকে পড়্‌ল। ঢুকেই হাঁপাতে হাঁপাতে কলওয়ালাকে বল্‌ল—"পালাও ভাই, প্রাণ নিয়ে পালাও! ঐ দেখ ডাকাত আস্‌ছে।" সে অঞ্চলে দস্যুর উৎপাত প্রায়ই ঘট্‌ত, কাজেই একথা শুনবামাত্র, কলওয়ালা সব ফেলে প্রাণের ভয়ে পাহাড় বেয়ে পালাতে লাগ্‌ল।

ততক্ষণে পথিক কলওয়ালার টুপীটা মাথায় দিয়ে, গায় ময়দা মেখে, ময়দা-ওয়ালা সেজে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। খানিক পরেই ঘোড়ায় চড়ে তুর্কী সেখানে এসে, তাকেই কলওয়ালা ভেবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"এখান দিয়ে এখনই কাউকে যেতে দেখেছ?" পথিক অমনি দূরে পাহাড়ের গায়ে ময়দাওয়ালাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌ল—"হাঁ, হাঁ, ঐ যে একটা লোক যাচ্ছে।" তখনি তুর্কী ঘোড়া থেকে নেমে পথিককে বল্‌ল—"ঘোড়াটা ধর ত", আর নিজে তলোয়ারটা কাম্‌ড়িয়ে ধরে, হাতে পায়ে আঁকড়িয়ে পাহাড় বেয়ে সেই লোকটাকে তাড়া কর্‌ল।

ময়দাওয়ালা বেচারা অনেক চেষ্টা করেও যখন পালাতে পার্‌ল না, তখন তুর্কীর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল। তুর্কী গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, "হতভাগা! জোচ্চোর! শিগ্‌গীর আমার টাকার থলি বা'র কর!" ময়দাওয়ালা কেঁদে বল্‌ল—"দোহাই বাবা, আমি টাকার থলির কথা কিছুই জানি না।" খানিকক্ষণ চেঁচামেচির পর তারা পরস্পরের ভুল বুঝ্‌তে পার্‌ল। তখন পথিককে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য দুজনেই ছুটে গেল—কিন্তু সেয়ানা পথিক ততক্ষণে তুর্কীর ঘোড়ায় চড়ে বহুদূর চলে গিয়েছে!

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে, ধুলোগায়ে, ছেঁড়া পোষাকে তুর্কী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এল। তার দশা দেখে স্ত্রী অবাক্ হয়ে বল্‌ল—"ও কি গো! ঘোড়া কি হ'ল?"

তুর্কী উত্তর দিল—"তোমার টাকার থলি যেখানে আমার ঘোড়াও সেখানে—ছেলেটার হেঁটে বেড়াতে কষ্ট হচ্ছে, তাই ঘোড়াটাও পাঠিয়ে দিলাম।"

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

মরুভূমিতে প্রাচীন সহর

চীনদেশের গোবি-মরুভূমির মত ভয়ঙ্কর নির্জ্জন যায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র যদি হটাৎ জ'মে গিয়ে স্থির হয়ে যায়, তাহ'লে যে রকম দেখায়, এই মরুভূমির চেহারা কতকটা সেই রকম। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এই মরুভূমিতে বড় বড় বালির স্তূপ বা ঢিপি আছে। গোবি-মরুভূমিতে ঢুক্‌লে, প্রথমে ছোট ছোট ছেয়ে রঙের বালির স্তূপ চোখে পড়ে। এক একটা স্তূপ প্রায়

৭ হাত উঁচু। কিন্তু আরও ভিতরে গেলে বড় বড় হল্‌দে রঙের বালির স্তূপ দেখা যায়। মরুভূমির মাঝখানে গেলে ১০০ হাত থেকে ২০০ হাতেরও বেশী উঁচু, আর এক মাইলেরও বেশী লম্বা লাল রঙের বালির স্তূপ দেখা যায়।

দিনের বেলায়ও এই মরুভূমিতে ভাল ক'রে আলো আসে না। কারণ, দিনের বেলায় ক্রমাগত বালি উড়ে মরুভূমির বাতাসকে এমন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে যে, তাতে সূর্য্যের আলো একেবারে ঝাপ্‌সা আর ম্লান হয়ে যায়। সমস্ত মরুভূমি একটি বিরাট অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা প'ড়ে, ভূতের রাজ্যের মত প'ড়ে থাকে। সেখানে মানুষ, জন্তু, পাখী কিম্বা পোকামাকড় কিছুই নাই। রাত্রে চাঁদের আলোয় সেখানকার বড়ই গম্ভীর আর সুন্দর শোভা হয়। গোবি-মরুভূমির পশ্চিম ভাগকে 'তাক্লা মাকান' (Takla makan) বলে। 'তাক্লা মাকান' চীন-তুর্কীস্থানের দক্ষিণ ধার দিয়ে গিয়েছে।

কাপড়ের দুই ধারে যেমন রং-করা পাড় থাকে, এই মরুভূমির চারধারে তেমনি সবুজ রঙের ক্ষেত, জঙ্গল আর পাহাড় আছে। এই সব জঙ্গল আর ক্ষেত কোথাও ২০ মাইল চওড়া, আবার কোথাও বা মাত্র ৪০০ কি ৫০০ হাত চওড়া। এরা সবুজ রঙের ফিতার মত মরুভূমির চারধার দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে। এখানকার লোকদের মধ্যে অনেকে চাষ-বাস করে, অনেকে শিকার ক'রে বেড়ায়, আবার অনেকে যাযাবর অর্থাৎ এক যায়গা থেকে আর এক যায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এরা সকলেই মোঙ্গলিয়ান (Mongolian)। এদের চেহারা অনেকটা চীনে, বর্ম্মা আর ভুটীয়াদের মত। মরুভূমির ভিতরে ঢুক্‌লে মানুষ কিম্বা জন্তু দেখা যায় না। তবে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট হ্রদের ধারে পাখী দেখা যায়। কিন্তু মরুভূমির মাঝখানে গেলে কোন রকম পাখী বা পোকামাকড়, গাছপালা; জল, কিছুই দেখা যায় না। চারদিকে কেবল ঢেউ-খেলান বালি চোখে পড়ে।

কিন্তু প্রায় দুই হাজার বছর আগে এই ভয়ানক মরুভূমির চেহারা অন্য রকম ছিল। তখন এখানে নদী ছিল, নদীর ধারে সুন্দর সুন্দর সহর আর গাছ-পালা ছিল। নদী শুকিয়ে যাওয়ায় গাছ-পালা সব শুকিয়ে গেল, তখন মানুষেরা সহর ছেড়ে চ'লে গেল। নির্জ্জন সহরের বাড়ী ঘর সব ক্রমে ক্রমে বালিতে ঢাকা পড়ে গেল। মরুভূমি ছাড়া সেখানে আর কিছুই রইল না। কিন্তু কয়েকটা খুব বড় বাড়ী আর মন্দিরের চূড়ো বালির উপরে মাথা তুলে রইল।

কিন্তু লোকেরা সেই প্রাচীন লুপ্ত সহরগুলির কথা একেবারে ভুলে যায়নি। মরুভূমির আশে পাশের জঙ্গলের আর পাহাড়ের লোকদের মধ্যে সেই লুপ্ত রাজ্য

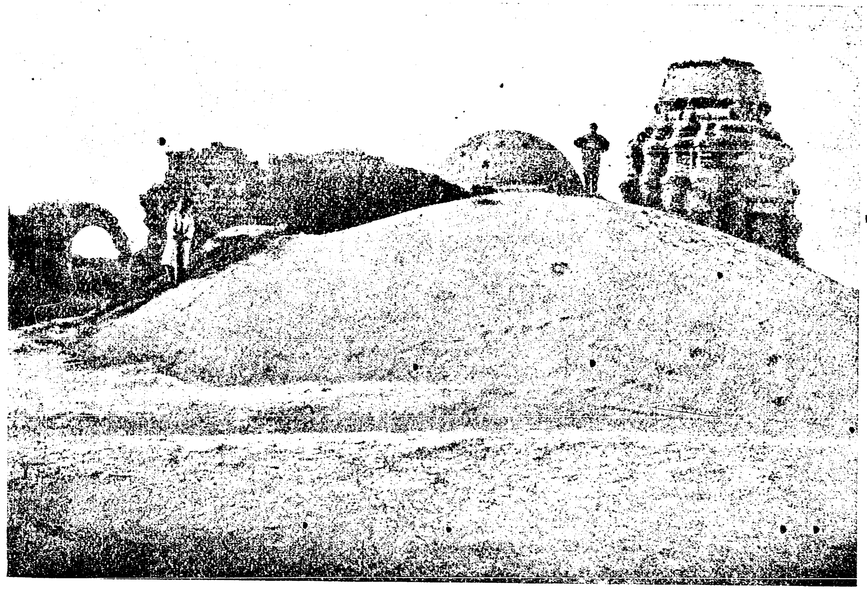

বালির স্তূপের মধ্যে প্রাচীন মন্দির

সম্বন্ধে অনেক রকম গল্প আর প্রবাদ চলে আস্‌ছিল। এক হাজার বছরেরও বেশী আগে একজন চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী মরুভূমির ভিতরে লুপ্ত রাজ্যের চিহ্ন দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তিনি একখানা বইএ সে কথা লিখে গিয়েছেন। প্রায় ৩০ বছর আগে প্রসিদ্ধ সুইডেন দেশীয় পর্য্যটক স্বেন হেদিন (Sven Hedin) চীন-তুর্কীস্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি মরুভূমির আশেপাশের লোকদের কাছে সেই লুপ্ত রাজ্য সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনেন। স্বেন হেদিন ঠিক কর্‌লেন যে, তিনি মরুভূমিতে ঢুকে এ বিষয়ে ভাল ক'রে অনুসন্ধান কর্‌বেন। তিনি অনেক লোকজন, উট, কুকুর আর খাবার নিয়ে মরুভূমিতে ঢুক্‌লেন। তাঁর সঙ্গের লোকদের মধ্যে অনেকেই

তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেল। কেউ কেউ ম'রে গেল, আবার দু একজন পাগল হয়ে গেল। অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম সহ্য ক'রে অনেক দিন ঘুরে বেড়াবার পর, তিনি সেই লুপ্ত সহরগুলির চিহ্ন দেখ্‌তে পেলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালির স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় বাড়ীর চূড়ো মাথা তুলে রয়েছে। তিনি একখানা প্রাচীন মন্দির দেখ্‌তে পেয়ে তার ভিতরে ঢুক্‌লেন। ভিতরে গিয়ে যা দেখ্‌লেন তাতে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। মন্দিরের দেয়ালে রং দিয়ে আঁকা চমৎকার চমৎকার সব ছবি—মানুষের ছবি, সমুদ্রের উপর নৌকা দুল্‌ছে তার ছবি, কুকুরের ছবি, ঘোড়ার ছবি, আরও অনেক রকম ছবি। আর একটা বাড়ীতে ঢুকে তিনি একখানা চরকা আর কাঠের তৈরী বর্গা আর কড়িকাঠ দেখ্‌লেন। বাড়ীর পাশের বাগানে শুক্‌নো মরা গাছ রয়েছে। তাছাড়া ভাঙা কলসী, কাঠের স্ক্রু (screw) আর রেশমের গুটি দেখ্‌লেন। কয়েকখানা বৈও পেলেন; তার ভাষা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না।



দেয়ালে আঁকা ছবি

স্বেন হেদিনের পর ডাক্তার অরেল্ ষ্টাইন্ (Dr. Aurel Stein) 'তাক্লা মাকান' মরুভূমিতে গিয়ে আরও অনেক লুপ্ত সহর আবিষ্কার করেন। 'তাক্লা মাকান' গোবি-মরুভূমিরই পশ্চিম ভাগ। তিনি একটি প্রাচীন মন্দিরে গ্রীস্ আর রোমদেশীয় লোকদের ছবি পেয়েছেন। এতে প্রমাণ হয় যে, গ্রীস্ আর রোমের সঙ্গে প্রাচীন সহরগুলির কারবার আর আদান প্রদান চল্‌ত। মন্দিরের দেয়ালে লেখা, "চিত্রকর টাইটাস্ (Titus) এই ছবিগুলি এঁকেছেন, এজন্য তিনি তিন সহস্র মুদ্রা পেয়েছেন।" তাছাড়া চীন ভাষায় আর প্রাচীন তুর্কী ভাষায় লেখা বৈ পাওয়া গিয়েছে। চীন দেশ, ভারতবর্ষ আর পারস্য দেশের সঙ্গেও মরুভূমির সহরগুলির কারবার চল্‌ত।

এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। অরেল্ ষ্টাইন্ সাহের 'তাক্লামাকান' মরুভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক কীর্ত্তি আবিষ্কার করেছেন।

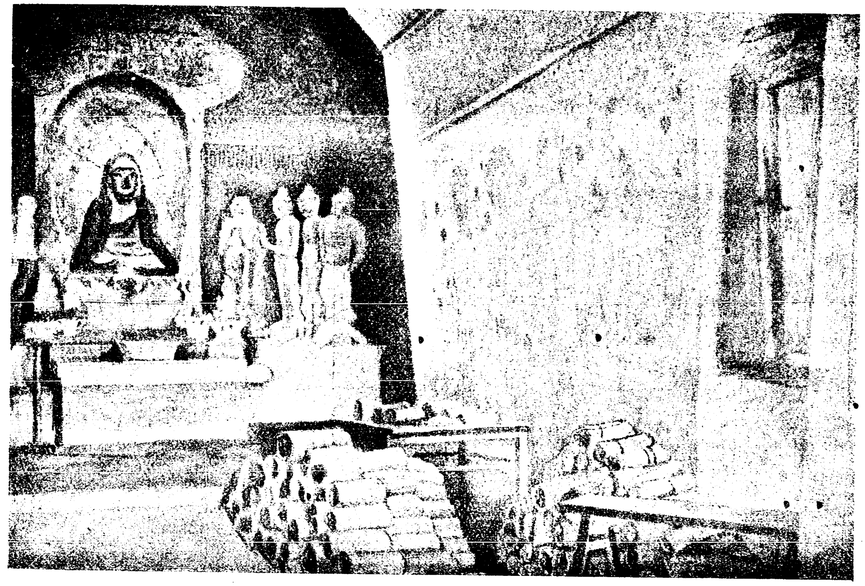

লুপ্ত সহরের লাইব্রেরী

স্বেন হেদিন যে সব মানুষের ছবি দেখেছিলেন, তাদের চেহারা ঠিক আর্য্যজাতীয় লোকদের চেহারার মত। অনেক বড় বড় পণ্ডিত বলেন যে, প্রায় ৪ হাজার বছর আগে মধ্য এসিয়াতে (Central Asia) যে প্রাচীন আর্য্যজাতিরা থাক্‌ত, গোবি-মরুভূমির প্রাচীন লোকেরা তাদেরই একটি শাখা ছিল। মধ্য এসিয়া তখন গাছপালায় ভরা ছিল। মধ্য এসিয়ার আর্য্যজাতিদের কোন শাখা প্রায় ৪ হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয়া (Babylonia) আক্রমণ করে। আর এক শাখা মিশরদেশ (Egypt) জয় করেছিল। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে, মধ্য এসিয়া থেকেই আর্য্যেরা

ইউরোপে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে গোবি-মরুভূমির মত মধ্য এসিয়াও শুকিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়।

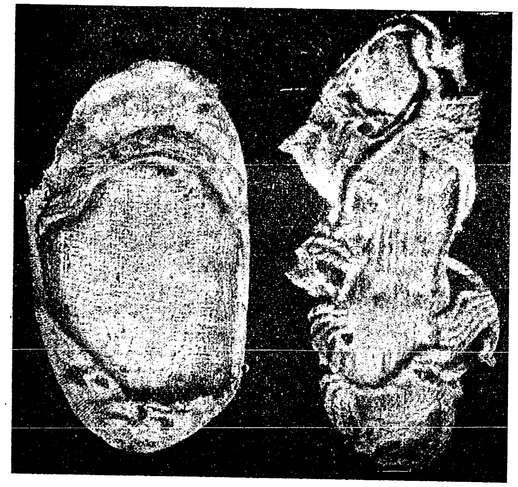

বালির নীচে পাওয়া সেকালের দড়ির জুতা

গোবি-মরুভূমি শুকিয়ে গেলে পর মানুষের সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। তখন তারা মরুভূমি থেকে বার হয়ে এল আর আশে পাশের জঙ্গলে আর পর্ব্বতে যে সব হূন, তাতার, তুর্কী আর মোঙ্গল থাকে, তাদের সঙ্গে মিশে গেল। এখনও আল্‌টাই পর্ব্বতের আশে পাশে যে সব মোঙ্গলিয়ান জাতি দেখা যায়, তাদের মধ্যে অনেকের মুখে আর্য্য-জাতির চেহারার ছাপ দেখা যায়; তাদের মধ্যে কারো কারো শরীরে সেই প্রাচীন লুপ্তরাজ্যের লোকদের রক্ত আছে।

শ্রীঋবিমল রায়।

চেক্ চোবিদানের গল্প

(তুরস্কের উপকথা)

বহুকাল পূর্ব্বে মিসরদেশে খুব ক্ষমতাশালী এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজারা বড় সুখে থাকিত। নিজের ভোগ সুখের দিকে রাজার নজরই ছিল না; কি করিলে রাজ্যের মঙ্গল হইবে তাহাই তিনি রাত দিন ভাবিতেন। এই কারণে প্রজারা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত।

একদিন মিসররাজ রাজ্যের সমস্ত বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি সভা করিলেন। সভায় আসিয়া সকলেই নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন

সময় কথায় কথায় একজন বলিলেন—"একদিন মহম্মদ ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় দেবদূত গেব্‌রিয়াল আসিয়া তাঁহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া লইয়া গেল। সে মহম্মদকে চক্ষের নিমেষে স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল দেখাইয়া, আবার তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া বিছানায় রাখিয়া চলিয়া গেল। মহম্মদ বিছানাটি ছুঁইয়া দেখিলেন, তাহা তখনও গরমই রহিয়াছে। স্বর্গদূত তাঁহাকে লইয়া যাইবার সময় একটি জলের পাত্র পড়িয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহম্মদ দেখিলেন, পাত্রটি তখনও সেই ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার জল এক ফোটাও মাটিতে পড়ে নাই।"

এই অদ্ভুত কথা মিসররাজ একটুও বিশ্বাস করিলেন না, অধিকন্তু তিনি হাসিতে লাগিলেন।

সভাসদেরা বলিলেন—"মহারাজ! এ সমস্ত ঘটনা নিতান্তই অদ্ভুত, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সবই সম্ভব হইতে পারে, ঐশী শক্তির কোন সীমা নাই।" কিন্তু ইহার পরও রাজা বলিলেন—"আমি ঐশী শক্তি টক্তি কিছুই বিশ্বাস করি না।" রাজা ঐশী শক্তির ক্ষমতাকেও মানেন না, এই কথা ক্রমে রাজ্য মধ্যে প্রচার হইয়া গেল।

সেই সময়ে মিসর দেশে চেক্ চোবিদান নামে একজন লোক ছিলেন তিনি যেমন সাধু তেমন পণ্ডিত, তেমনই মায়াবী, আবার তেমনই ভাল চিকিৎসক ছিলেন। মিসররাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের সকলেই চেক্ চোবিদানকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। রাজবাড়ীর সভার দিন চোবিদান কোন কাজে অন্যত্র গিয়াছিলেন, সেজন্য সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। মিসরে ফিরিয়াই তিনি শুনিলেন যে, রাজা ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতাকেও অবিশ্বাস করেন। ইহা শুনিবামাত্র তিনি রাজার নিকট গিয়া উপস্থিত। রাজা তাঁহাকে খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলে, চোবিদান্ বলিলেন—"মহারাজ! আপনার সঙ্গে নির্জনে একটু কথাবার্ত্তা বলিবার ইচ্ছা আছে।" তখন রাজা অন্য সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন।

রাজা যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরের চারিটি জানলা ছিল। চোবিদান্ বলিলেন—"এই জানালা চারিটি বন্ধ করিতে হইবে।" রাজার হুকুমে চাকর আসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। ঘরে রহিলেন শুধু রাজা আর চোবিদান্। একটি জানালা দিয়া বাহিরে একটি সুন্দর পাহাড় দেখা যাইত। ক্ষণকাল পরে চোবিদান্ রাজাকে সেই জানালাটি খুলিয়া বাহিরের দিকে দেখিতে বলিলেন।

জানালা খুলিয়া রাজা দেখিলেন—পর্ব্বতের নিকটে অস্ত্রশস্ত্রধারী বিশাল একটি সৈন্যদল দাঁড়াইয়া আছে। ইহা দেখিয়াই তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, কোন শত্রু রাজা তাঁহার নগর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে!

রাজাকে ভীত দেখিয়া, চোবিদান্ বলিলেন—"মহারাজ! কোন ভয় নাই।" এই বলিয়াই তিনি সেই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার জানালাটি খুলিয়া দেখিতে বলিলে, রাজা দেখিলেন—সেই সব সৈন্যসামন্তের চিহ্ন মাত্রও নাই, শুধু সুন্দর পর্ব্বতটি দাঁড়াইয়া আছে! ইহা দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।



দ্বিতীয় জানালাটি দিয়া কেইরো নগর দেখা যাইত। চোবিদান্ তখন সেই জানালা খুলিয়া রাজাকে দেখিতে বলিলে, তিনি দেখিলেন—ভীষণ আগুনে কেইরো নগর পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। নগরের এই দারুণ অবস্থা দেখিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন চোবিদান্ জানালাটি বন্ধ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! নিশ্চিন্ত হউন, ভয়ের কোন কারণ নাই।" একটু পরেই জানালাটি আবার খুলিয়া রাজাকে দেখিতে বলিলে, তিনি দেখিলেন—কেইরো নগর ঠিক যেমনটি তেমনই আছে, আগুনের কোন চিহ্ন নাই!

তৃতীয় জানালা দিয়া নীল নদী দেখা যাইত। চোবিদান্ সেই জানালা খুলিয়া রাজাকে দেখিতে বলিলেন। রাজা দেখিলেন—নদীতে বন্যা আসিয়া নদীর জল সহরটিকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছে। ঘর বাড়ী, পশুপক্ষী সমস্ত ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া রাজা হায় হায় করিতে লাগিলেন। তখন চোবিদান্ বলিলেন—"মহারাজ! স্থির হউন, কোন ভয় নাই।" এই বলিয়া জানালাটি বন্ধ করিয়া একটু পরেই আবার খুলিয়া দেখাইলেন যে, নদী ঠিক পূর্ব্বের মত কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে, জল একটুও বাড়ে নাই। ইহা দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

চতুর্থ জানালা দিয়া একটি মরুভূমি দেখা যাইত। চোবিদান্ সেই জানালা খুলিয়া রাজাকে দেখাইলেন যে, মরুভূমির যায়গায় পরম সুন্দর একটি বাগান্ রহিয়াছে। তারপর জানালা বন্ধ করিয়া, আবার খুলিয়া দেখাইলেন—যেই মরুভূমি সেই মরুভূমি, বাগানের চিহ্নও নাই। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মিসররাজের চক্ষুস্থির হইয়া গেল!

তখন চোবিদান্ বলিলেন—"মহারাজ! আপনাকে আরও আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইব। এখন আপনি একটি জলপূর্ণ টব আনিতে বলুন।" চাকরেরা টব আনিলে চোবিদান্ বলিলেন—"মহারাজ! ছোট্ট একখানি কাপড় পরিয়া আপনি টবের জলে নামিয়া ডুব দিন্।" রাজা টবের জলে ডুব দিবামাত্র দেখিলেন, তিনি সমুদ্রের ধারে ভীষণ বনপূর্ণ এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন! চারিদিকে সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি জন্তু ডাকিয়া বেড়াইতেছে! ইহা দেখিয়া রাজা ভয়ানক ভয় পাইলেন এবং চোবিদানের উপর তাঁহার খুব রাগ হইল। স্থির করিলেন, মিসরে ফিরিয়া যাইতে পারিলে চোবিদান্কে গুরুতর সাজা দিবেন।

এখন আর রাগ করিয়া কোন লাভ নাই, এই ভাবিয়া রাজা, চারিদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া, একস্থানে দেখিতে পাইলেন কতগুলি কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে। তিনি তাহাদের নিকটে গেলেন। ছোট্ট একখানি কাপড় পরা, এরূপ অবস্থায় তিনি মিসরের রাজা বলিয়া পরিচয় দিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং তিনি কাঠুরিয়াদিগকে বলিলেন—"আমি একজন সওদাগর। আমার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, জিনিসপত্র লোকজন সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একখানি কাঠ ধরিয়া কোন মতে ভগবানের কৃপায় ডাঙ্গায় উঠিয়াছি। এখন আমি কি করিব, কোথায় যাইব তোমরা দয়া করিয়া বলিয়া দাও।"

কাঠুরিয়ারা নিতান্ত গরিব, রাজাকে আশ্রয় দিবার সাধ্য নাই। তবু একজন তাঁহাকে একটি পুরাতন পোষাক এবং আর একজন তাঁহাকে এক জোড়া জুতা দিল। তারপর তাঁহাকে সহরে লইয়া গিয়া বলিল—"এখানে আপনি আশ্রয় খুঁজিয়া লউন।" এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

মিসররাজ ঘুরিয়া ফিরিয়া এক পাট্‌নীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পাট্‌নীর কাছেও তিনি পূর্ব্বের মত মিথ্যা পরিচয় দিলেন। পাট্‌নী বলিল—"মহাশয়! আপনাকে দেখিয়া বড় লোক বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, আপনি খুব সুখের দেশেই আসিয়াছেন। এমন সুন্দর স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এখন আপনি একটি কাজ করুন—ঐ যে দূরে স্ত্রীলোকদিগের স্নান করিবার ঐ ঘরটি দেখা যাইতেছে, তাহার দরজায় গিয়া বসিয়া থাকুন। যখনই স্নান করিয়া কোন মেয়ে বাহির হইবে, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'আপনি বিবাহিতা, না কুমারী?' বিবাহিতা মেয়ে হইলে সে আপনার কথার উত্তর দিবে। কিন্তু কুমারী হইলে সে হয়ত কোন উত্তর দিবে না, চুপ করিয়া আপনার দিকে তাকাইবে কিংবা বলিতেও পারে যে 'আমি কুমারী'। তখন আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া সেইখানে বসিয়া থাকিবেন। ক্ষণকাল পরেই সেই কুমারী মেয়ে আপনাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিবাহ করিবে। তখন আপনার আর সুখের সীমা থাকিবে না।"

বৃদ্ধ পাট্‌নীর উপদেশে মিসররাজ সেই বাড়ীর ফটকে গিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পরমসুন্দরী একটি মেয়ে বাহির হইলেন। অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুন্দরি! তুমি কি বিবাহিতা?" যুবতী "হাঁ" বলিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে নিতান্ত কুৎসিত একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল। রাজা ভয়ে ভয়ে তাহাকে ঐ প্রশ্ন করিলে, সেও 'হাঁ' বলিয়া চলিয়া গেল। রাজা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, যেন বাড়ীর দরজা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাজা চাহিয়া দেখিলেন—অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে বাহির হইয়াছে। এমন সুন্দরী তিনি জীবনে কখন দেখেন নাই। সুন্দরী নিকটে আসিলে রাজা যখন তাহাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন, তখন সে "না, আমি কুমারী" এই বলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

মিসররাজ স্নানাগারের দরজায়ই বসিয়া আছেন। খানিক পরে একটি ভৃত্য আসিয়া বলিল—"দয়া করিয়া আমার সঙ্গে চলুন। কর্ত্তঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র রাজা তাহার সঙ্গে চলিলেন।

খানিক দূর গিয়া ভৃত্য তাঁহাকে সুন্দর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করাইল। এমন আশ্চর্য্য সুন্দর বাড়ী রাজা আর কখনও দেখেন নাই। একটি ঘরে তাঁহাকে বসাইয়া ভৃত্য ভিতরে সংবাদ দিতে গেল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া, একটি ঘরে প্রবেশ করিতে বলিল। রাজা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন—সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি একটি সোণার আসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার রূপের জ্যোতিতে ঘরটি উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। রাজাকে দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন। তারপর বলিলেন—"আপনাকে দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি আপনি খুব সম্ভ্রান্ত বংশের কেহ হইবেন। এখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে বিবাহ করিলে যারপর নাই সুখী হইব। আমার এই বাড়ী-ঘর, ধন-দৌলত সবই আপনার।" এ প্রস্তাবে রাজা তখনই সম্মত হইলেন। সেই রাত্রেই মহা সমারোহ করিয়া তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর সাতটি বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে মিসররাজের কয়েকটি সন্তান হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া মহা ধুমধামে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু হায়! বৃথা অপব্যয় করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা নিতান্ত অভাবে পড়িয়া গেলেন। ক্রমে পেটের দায়ে ঘরের আসবাব-পত্র সমস্তই বিক্রয় করিতে হইল। চাকর-বাকর সমস্ত ছাড়াইয়া দিয়া, বাড়ীতে শুধু রাজা, তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা-গণকে লইয়া রহিলেন।

সন্তানগুলিকে কিরূপ প্রতিপালন করিবেন, এই চিন্তায় মিসররাজ অস্থির হইয়া পড়িলেন। কোন কাজ কর্ম্ম তিনি জানেন না, পথে পথে মুটে মজুরের কাজ করিয়া দিন কয়েক অতি কষ্টে চলিল।

একদিন বৈকালে রাজা ভাবিতে ভাবিতে সমুদ্রের তীরে গিয়া উপস্থিত। ক্রমে নমাজের সময় উপস্থিত হইল, তিনি স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন। জলে ডুব দিয়া মাথা তুলিবামাত্র বিস্ময়ে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! দেখিলেন, নিজের রাজধানীতে সেই জলের টবের উপরেই তিনি দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহার সমুখে পণ্ডিত চোবিদান্! চোবিদান্‌কে দেখিয়াই রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া

গেল। অতিশয় কর্কশ স্বরে বলিলেন—"ওরে দুরাত্মা! তোর মনে কি ভয় নাই? আমি মিসরের রাজা, আমারই সঙ্গে তুই এরূপ তামাসা করিতেছিস্?"

চোবিদান্ একটুও ভয় পাইলেন না, বলিলেন—"মহারাজ! মিছামিছি রাগ করিবেন না। আপনি এইমাত্র টবের জলে ডুব দিয়াছিলেন, এখন আবার উঠিয়াছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চাকরদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলে চাকরেরাও সেই কথাই বলিল। কিন্তু তবু রাজার বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন—"আমি সাত বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়াছি। এই হতভাগা চোবিদান্ আমাকে দিয়া মজুরের কাজ পর্য্যন্ত করাইয়াছে।"

চোবিদান্ বলিলেন—"মহারাজ! আপনার বিশ্বাস না হয়, একবার নিজ চক্ষে দেখুন।" এই বলিয়া তিনি ছোট্ট একখানি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া টবের জলে ডুব দিলেন। এদিকে রাজাও তলোয়ার হাতে প্রস্তুত, চোবিদান্ মাথা তুলিবামাত্র তাঁহাকে বধ করিবেন। কিন্তু চোবিদান্ রাজার দুষ্ট মতলব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই ডুব দিয়া তিনি আর উঠিলেন না, মায়াবিদ্যার বলে অদৃশ্য হইয়া একেবারে ডামস্কাস্ নগরে গিয়া পৌঁছিলেন এবং সেখানে গিয়াই মিসররাজকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে;—

"মহারাজ! আপনি, আমি এবং অন্য সকলেই ঈশ্বরের দাসানুদাস। যাঁহার হুকুমে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র অবিরাম শূন্যপথে ঘুরিতেছে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি টবের জলে ডুবিয়া নিমেষ মধ্যে নানা দেশ ঘুরিয়া আসিলেন এবং মনে করিলেন সাত বৎসরকাল ঘুরিয়াছেন। যদি ক্ষণকালমধ্যে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে, তবে স্বর্গের দূত যে মহম্মদকে নিমেষ মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ঘুরাইয়া আনিয়াছেন, সে কথা কেন সম্ভব হইবে না?"

পত্রখানি পড়িয়া রাজার চৈতন্য হইল এবং ঐশী শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

সমুদ্রের ফুল

একটি ছোট ছেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। একজন জেলে তাকে একটা শুক্‌নো আলুর মত জিনিষ দিয়ে বল্‌ল, "এটা যদি ফুটে ওঠে, তাহ'লে দেখ্‌বে কেমন মজা হয়। যদি ওর কোন রকম না লেগে থাকে তবে ও ফুট্‌বেই; তুমি ওকে নিয়ে একটা বোতলে সমুদ্রের জল দিয়ে তাতে রেখে দিও।"

ছেলেটি বাড়ী এসে সেই শুক্‌নো আলুর মত জিনিষটাকে সমুদ্রের জল ভরা বোতলে দিতেই, জিনিষটা টপ্ করে জলের নীচে পড়ে গেল। কিন্তু খানিক মরার মত পড়ে থেকে, সেটা বড় হ'তে লাগ্‌ল। বড় হ'তে হ'তে শেষে বোতলের অর্দ্ধেকের চেয়ে উঁচু হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড! চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার গায়ে লাল সবুজ ডোরা হ'ল, আর মাথায় মস্ত একটা চন্দ্র-মল্লিকা ফুল যেন ফুটে উঠ্‌ল; ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি সরু সরু লম্বা লম্বা, সুন্দর সবুজ মত রং, গোড়ার দিকটা গোলাপী। প্রকাণ্ড ফুলের মত জিনিষটা বোতলে আর ধরে না। এই অদ্ভুত ফুল দেখ্‌তে ছেলেটির ভাইএরা ছুটে এল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ একটা জ্যান্ত মাছ বোতলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। অম্‌নি সেই ফুলের পাপ্‌ড়ির মত শুঁয়োগুলো যেন আরও ছড়াতে লাগ্‌ল। মাছটা পালাবার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। যেই শুঁয়ো মাছের গায়ে ঠেক্‌ল, অম্‌নি মাছটা যেন একেবারে অসাড় হয়ে পড়্‌ল, আর কোন রকম পালাবার চেষ্টা কর্‌ল না। তখন শুঁয়োগুলো আস্তে আস্তে গুটিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, আর মাছটা কেমন ক'রে জানি ফুলের পেটের মধ্যে চ'লে গেল। ফুলের মত জন্তুটার মাঝ্‌খানটায় একটা গর্ত্ত, সেইটাই তার পেট। এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে এতক্ষণে বোঝা গেল যে, ওটা ফুল নয়, জন্তু। ওর শরীরের সমস্তটাই প্রায় পেট; মুখের চার ধারের শুঁয়োগুলো খাবার শিকার ধর্‌বার কল। সেগুলো এমন ভাবে তৈরী যে, কোন জন্তুর গায়ে ঠেক্‌লে, তার শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, তাকে অবশ ক'রে ফেল্‌তে পারে।

এই জন্তুগুলি ফুলের মত দেখ্‌তে ব'লে, তাদের 'সমুদ্রের ফুল' নাম দেওয়া হয়েছে। এরা অনেক রকমের হয়। এবারের সন্দেশের প্রথম পাতায় কয়েক রকমের ছবি দেওয়া হয়েছে। তোমরা গতবারে রঙিন্ ছবিতে শুনেছ, প্রবালেরাও

অনেকটা এম্‌নি ক'রে খায়। 'সমুদ্রের ফুল' আর প্রবাল দেখ্‌তেও কতকটা এক রকম। তফাৎ এই যে, 'সমুদ্রের ফুলের' শরীরের সমস্তটাই মাংসল, কঙ্কাল নাই, প্রবালের কঙ্কাল আছে। এই ফুলের মত চেহারা, পেট সর্ব্বস্ব 'সমুদ্রের ফুল' সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শোনা যায়। এরা নাকি ভারি লোভী। অনেক সময় নিজের চেয়ে বড় এক একটা খাবার গিল্‌তে গিয়ে বিভ্রাট বাধিয়ে বসে। একবার এক সাহেব ছোট্ট একটি 'সমুদ্রের ফুল'কে একটা আধ্‌লা 'পেনি' দিয়েছিলেন। সে সেটাকে গিল্‌বার জন্য এমন প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে আঁক্‌ড়িয়ে ধর্‌ল যে, তার শরীর ফেটে দুখানা হয়ে গেল। কিন্তু সে মর্‌ল না, দুটো ভাগ দুটো নূতন 'সমুদ্রের ফুল' হয়ে গেল।

আর একটা দু ইঞ্চি চওড়া 'সমুদ্রের ফুল' (১৫নং ছবি) একটা চায়ের পিরীচের মত বড় ঝিনুক গিলে ফেলেছিল। ঝিনুকটা তার পেটে গিয়ে আড় ভাবে এমন আট্‌কিয়ে গেল. আর অত বড় জিনিষটা ঢোকাতে তার শরীরে এমন টান পড়্‌ল যে, প্রায় ফেটে যাবার যোগাড়। লম্বাটে জন্তুটা হাতগড়া রুটির মত চ্যাপ্‌টা হয়ে গেল। কিন্তু তবু সে মর্‌ল না। পেটের মধ্যে খাবার ঢুক্‌লে মাঝ পথে ঝিনুকে আট্‌কিয়ে যায়, অর্দ্ধেকটা পেট খালিই থেকে যায়। তখন হ'ল কি, নীচের অর্দ্ধেকে আর একটা মুখ গজাল, ঠিক আসল মুখের মত দুই সারি নূতন শুঁয়ো ওয়ালা। তখন জন্তুটা বেশ মজা ক'রে দুই মুখ দিয়ে খেতে লাগ্‌ল।

আগে লোকে জান্‌ত যে, 'সমুদ্রের ফুল' কুড়ি ত্রিশ বৎসরের বেশী বাঁচে না। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় একটি মেম, তাঁর কতকগুলি পোষা 'সমুদ্রের ফুল' দেখিয়ে ছিলেন, সেগুলি ষাট বৎসরেরও বেশী বেঁচেছিল। সেগুলিকে তিনি একটা চৌবাচ্চার মত যায়গায় সমুদ্রের জল দিয়ে রাখ্‌তেন! কিছু দিন অন্তর অন্তর মেমটি সমুদ্রের ধারে গিয়ে, জেলে দিয়ে সমুদ্রের একটু ভিতর দিক থেকে জল আনাতেন; চৌবাচ্চার জল বদ্‌লিয়ে এই নূতন জল দিতেন; আর বাজার থেকে খুব ভাল মাংস কিনে এনে 'সমুদ্রের ফুল'দের খাওয়াতেন।

কত রকম জন্তু যে পৃথিবীতে আছে ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

শ্রীসুখলতা রাও।

বাঘের মন্ত্র

ড্যাংরা গরীব মুসলমান কৃষক। রাধু সিং ভাণ্ডারী খোঁড়া মানুষ। সে ড্যাংরাকে নিয়ে এসেছে, তার ক্ষেতে নিড়ান দেবার জন্য। ড্যাংরা কাজ কর্‌ছে আর রাধু সিং মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছে। একবার রাধু সিং দেখ্‌ল পাশের ক্ষেতে একটা জায়গায় ধানগুলো যেন উঁচু হয়ে উঠেছে। আর একটু ঠাওর করে সে দেখে সেইখানে একটু বাঘ বসে রয়েছে। দেখেই ত তার চক্ষুস্থির! সে ব্যস্ত হয়ে চাপা গলায় ড্যাংরাকে বল্‌ল—"আরে সর্ব্বনাশ! ঐ দেখ ক্ষেতের মধ্যে বাঘ!" ড্যাংরা লোকটা একটা গোঁয়াড় গোবিন্দ গোছের, সে বল্‌ল—"তার জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমি ধূলো পড়ার মন্ত্র জানি।" রাধু সিং ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—"সে কি রকম?" ড্যাংরা বল্‌ল, "এই দেখ না—এই এক মুঠো ধূলো নিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝেড়ে দিচ্ছি; বাঘ আর চোখেই দেখ্‌তে পাবে না। তারপর আমার এই লাঠি দিয়ে তাকে পিটিয়ে সাবাড় কর্‌ব।" রাধু সিং বল্‌ল, "তা বেশ কথা; কিন্তু আমি খোঁড়া মানুষ, কিছু একটা অনর্থ ঘটলে তাড়াতাড়ি ছুট্‌তে পার্‌ব না, আমি একটু এগিয়ে নি।"

এই কথা বলেই সিং মশাই তাঁর খোঁড়া পা যথাসম্ভব চালিয়ে একেবারে ক্ষেত পার হয়ে নিজের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন আর চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "ওরে ড্যাংরা, এই বেলা মন্ত্র ঝাড়"। ড্যাংরা তখন একমুঠো ধূলো নিয়ে কি যেন বিড়্‌বিড়্‌ কর্‌তে কর্‌তে খানিক এগিয়ে গিয়েই ঝোপের মধ্যে ধূলোটা ছুঁড়ে দিল।

তারপর চক্ষের নিমেষে কি যেন কাণ্ড হয়ে গেল, তা ড্যাংরাও বল্‌তে পারে না, রাধু সিংও ভাল করে বুঝ্‌তে পারেনি। খালি এইটুকু বোঝা গেল যে বাঘটা ড্যাংরার ঘাড়ের উপর দিয়ে তীরের মত সাঁই করে বেরিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ড্যাংরার মুখের এক পাশের বেশ এক খাবল মাংস কোথায় যেন উড়ে গেল। যাহোক্ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এমন সাংঘাতিক চড় খেয়েও ড্যাংরা প্রাণে মরেনি। সে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে ছিল কিন্তু বাঘের থাবার চিহ্ন তার চেহারাটিকে একদম মাটি করে রেখেছিল।

এটা যে বল্‌লাম, এটা একটা সত্য ঘটনা। কিন্তু আর একটা গল্প আমি শুনেছি, তার কতখানি সত্যি তা আমি বল্‌তে পারি না। যাহোক্ গল্পটা হ'চ্ছে এই—এক সাহেব আসামে না কোথায় যেন শিকার কর্‌তে বেরিয়েছিলেন। তাঁর

আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না, সঙ্গে লোকজনও যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ঘুরেও তিনি বাঘের সাক্ষাৎ পেলেন না। বাঘের পায়ের দাগ, বাঘের খাওয়া হরিণ, এই সবই তাঁরা দেখ্‌লেন—কিন্তু অনেক ঘোরাঘুরি আর রাত জাগা সত্ত্বেও জলজ্যান্ত বাঘ কারো চোখে পড়্‌ল না। শেষটায় একদিন এক গ্রামে এসে সাহেব খবর পেলেন যে তার পাশেই জঙ্গলে পাঁচ সাত দিন হ'ল বাঘ এসেছে। বাঘের ডাক অনেকেই শুনেছে, কেউ কেউ নাকি জ্যোৎস্নার আলোয় তাকে চোখেও দেখেছে। শুনে সাহেবের খুব উৎসাহ হ'ল ; তিনি এক জায়গায় গাছের উপর মাচা বেঁধে তার কাছেই একটা গরু বেঁধে রেখে দিলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। চার দিন ক্রমাগত রাত জেগে শেষটায় সাহেব বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—"তাঁবু ওঠাও, এ অঞ্চলে আমাদের বাঘ মিল্‌বে না।"

এমন সময় গ্রামের এক সর্দ্দার এসে খবর দিল যে, মন্দিরের বুড়ো পুরুত ঠাকুর নাকি বাঘ আনাবার মন্ত্র জানে। সে বড় আশ্চর্য্য মন্ত্র। রীতিমত যজ্ঞ করে ঠিক মত সে মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌লে, বারো ঘণ্টার মধ্যে বাঘ এসে হাজির হ'তে বাধ্য। সাহেব প্রথম কথাটায় কাণ দেননি, কিন্তু সঙ্গের শিকারীদের আগ্রহ দেখে তিনি অগত্যা আর একটা দিন সেখানে থাক্‌তে রাজী হলেন। তিনি হুকুম দিলেন, "যজ্ঞের জন্য পুরুতঠাকুরের যা যা লাগে সব যেন ঠিক মত তাকে দেওয়া হয়।"

বিকাল না হতেই পুরুতঠাকুর এসে হাজির। তাঁর কথামত চন্দন কাঠ, সিঁদুর, ধূপ ধূনা ও নানা রকম গন্ধ মশলা সংগ্রহ হয়েছে, তাছাড়া এক হাঁড়ি দৈ, সের দুই চিঁড়ে আর মস্ত এক থালা বাতাসা, এসবও হাজির করা হয়েছে। পুরুতঠাকুর এসেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়ে একটা চার-কোণা বেদীর মত তৈরী কর্‌লেন ; সেই বেদীর উপর একটা খোঁটা পুঁতে তার গায়ে চন্দন আর সিঁদুর দিয়ে চিত্র কর্‌লেন ; তারপর ধূপ ধূনা জ্বালিয়ে মন্ত্র পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। একটুখানি মন্ত্র পড়েন আর গপাগপ্ কয়েক গ্রাস দৈ চিঁড়ে ফলার মারেন। পুরুতঠাকুর যজ্ঞ কর্‌ছেন, সকলে অবাক্ হয়ে তাই দেখ্‌ছে আর রাত্রে কখন বাঘ আস্‌বে তাই নিয়ে আলোচনা চল্‌ছে। সাহেব রাত্রে ঘুমাননি, তিনি খানিক দূরে একটা বটগাছের ছায়ায় বসে ঝিমোচ্ছেন। গরুটা এক পাশে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট হৈ হৈ চীৎকার আর সেই সঙ্গে লোক পালাবার শব্দ সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। ব্যাপার কি জানবার জন্য তিনি সবে তাঁর

চাপ্‌রাসিকে ডাক্‌তে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখ্‌লেন, বাঘ লেজ খাড়া করে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে একেবারে তাঁর সাম্‌নে দিয়ে সুড়্‌সুড়্ করে ছুটে পালাচ্ছে। সাহেব তখন করেন কি ? এই সময় যে বাঘ দেখা দেবে তা তিনি একবারও ভাবেননি, সুতরাং তাঁর বন্দুক টন্দুক কিছুই প্রস্তুত নাই। কাজেই তিনি খালি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়েই রইলেন। পরে তিনি শুন্‌লেন যে পুরুতঠাকুরের ফলার অর্দ্ধেক শেষ না হতেই হঠাৎ কোত্থেকে বাঘ এসে গরুটার উপর লাফিয়ে

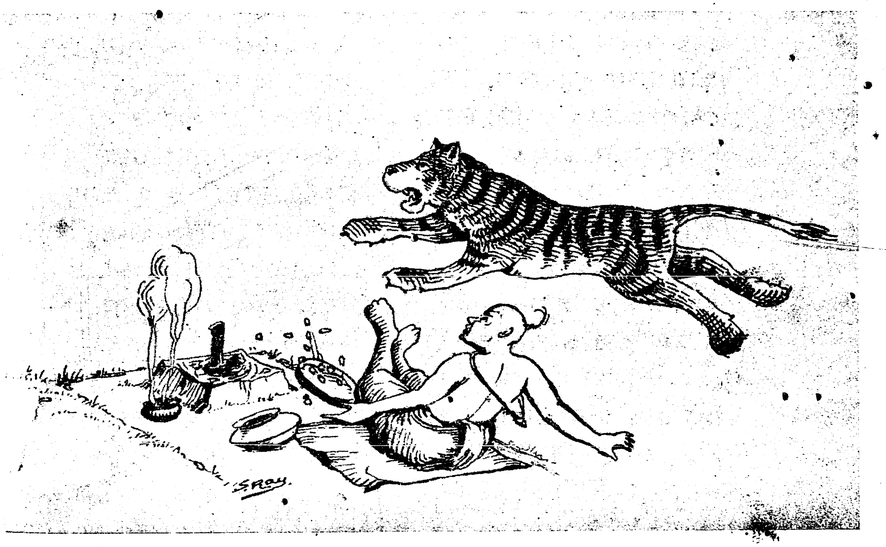

পড়েছিল। তারপর লোকজনের চীৎকার শুনে বাঘটা কেমন ঘাব্‌ড়িয়ে গিয়ে সোজা পুরুতঠাকুরের যজ্ঞবেদী আর ফলারের আয়োজন সব উল্‌টিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে প্রস্থান। যাহোক্, পুরুতঠাকুরের মন্ত্রের যে আশ্চর্য্য শক্তি একথা সাহেব ছাড়া আর সকলেই একবাক্যে স্বীকার কর্‌ল, কারণ তা না হলে মন্ত্র পড়ামাত্র সদ্য সদ্য বাঘ এসে হাজির হবে কোত্থেকে ?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ভাল রে ভাল!

দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর—

এই দুনিয়ার সকল ভাল,
সস্তা ভাল দামীও ভাল,
ওদের গানের ছন্দ ভাল,
মেঘ মাখান আকাশ ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্ম্মা ভাল,
চালকুম্‌ড়োয় চাল্‌তা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাকও ভাল,
খেলাও ভাল পড়াও ভাল,
কালও ভাল আজও ভাল,
লাঠিও ভাল ছাতিও ভাল,
ঠেলার গাড়ী ঠেল্‌তে ভাল,
গিট্‌কিরি গান শুন্‌তে ভাল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,

আসল ভাল নকল ভাল,
তুমিও ভাল আমিও ভাল,
এদের ফুলের গন্ধ ভাল,
ঢেউ জাগান বাতাস ভাল,
ময়লা ভাল ফরসা ভাল,
মাছপটলের দোল্‌মা ভাল,
ঝিঙের টকে পল্‌তা ভাল
সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
টিকিও ভাল টাকও ভাল,
মিঠেও ভাল কড়াও ভাল,
ফাঁকিও ভাল কাজও ভাল,
ঘুঁষিও ভাল লাথিও ভাল,
খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভাল,
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল

—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী

১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকাড়ামতী নদীর ধারে।—আমাদের সঙ্গের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আস্‌ছে। তরীতরকারী যা ছিল, তা ত আগেই ফুরিয়েছে। টাট্‌কা জিনিষের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুর্‌গী আছে তারা রোজ একটা করে ডিম দেয়, তাছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাংস আর মাংস,

এই সব কয়েক সপ্তাহের মত আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফির্‌তে হবে। আমরা এই সব জিনিষ গুণছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌ছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বল্‌ল, যে লক্কড় সিং ভোর বেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখন পর্য্যন্ত ফেরেনি। আমরা বল্‌লাম "ব্যস্ত কেন, সে আস্‌বে এখন। যাবে আবার কোথায়?" কিন্তু তার পরেও দুই তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিংএর দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজ্‌তে বেরোবার পরামর্শ কর্‌ছি এমন সময়, হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠ্‌ছে নাম্‌ছে আর মাতালের মত টল্‌ছে। দেখেই আমরা সুড়্‌সুড়্‌ করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুন্‌লাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বল্‌ছে, "পালিও না, পালিও না, ও কিছু বল্‌বে না।" তার পরের মুহূর্ত্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগ্‌ড়ীর কাপড় দিয়ে সে ওই অত বড় জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বল্‌ল, যে সে সকালবেলা কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আন্‌তে গিয়েছিল। ফির্‌বার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই জন্তুটা মাটিতে শুয়ে কোঁ-কোঁ শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল। সে দেখ্‌ল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়্‌ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে, বেশ ক'রে ধুয়ে, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে দেখে সে তাকে পাগ্‌ড়ী দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই



বল্‌লাম, "তা'হলে ওটা ওই রকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কি না।" জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম।

সকালে ত এই কাণ্ড হল; বিকাল বেলা আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবে মাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চীৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর প্যাঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যে রকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেই রকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চীৎকার শুন্‌বামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেই রকম ধরণের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে কতক দৌড়িয়ে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে, ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু,—সেটা কুমীরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটারই কিছু কিছু আদল আছে,—সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে; আর একটা ছোট নিরীহ গোছের কি যেন জানোয়ার হাত পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সাম্‌নে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে কর্‌লাম যে এইবার

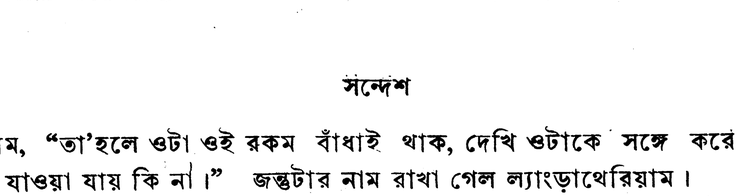

বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চীৎকারই চল্‌তে লাগ্‌ল; খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বল্‌ল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বল্‌লাম, "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিক মত না লাগে, তা'হলে জন্তুটা ক্ষেপে গিয়ে কি জানি করে বস্‌বে, তা কে জানে?" এই বল্‌তে বল্‌তেই ধেড়ে জন্তুটা চীৎকার থামিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বল্‌ল, "এ জন্তুটার নাম দেওয়া যাক্ 'চিল্লানোসরাস্'।" ছক্কড় সিং বল্‌ল, "উ বাচ্চাকো নাম দেও, 'বেচারাথেরিয়াম'।"

৭ই সেপ্টম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে।—নদীর বাঁক ধরে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোন দিকে এগোবার জো নাই। দেওয়ালের মত খাড়া পাহাড়; সোজা দুশো তিনশো হাত নীচে সমতল জমি পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই এ রকম। নীচের যে সমতল জমী সে একেবারে মরুভূমির মত; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এই সব দেখ্‌ছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কি যেন একটা ধড়্‌ফড়্ করে' উঠ্‌ল। দেখ্‌লাম বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমি মাছের মত মস্ত কি একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁক্‌ড়ে ধরে বাদুড়ের মত মাথা নীচু করে ঘুমাচ্ছে। তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে এই রকম আরো পাঁচ সাতটা জন্তু দেখ্‌তে পেলাম। কোনটা ঘাড় গুঁজে ঘুমাচ্ছে, কোনটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট্ ঢুকিয়ে কি যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এই রকম দেখ্‌ছি এমন সময় হঠাৎ কট্‌কটাং কট্' শব্দ করে সেই

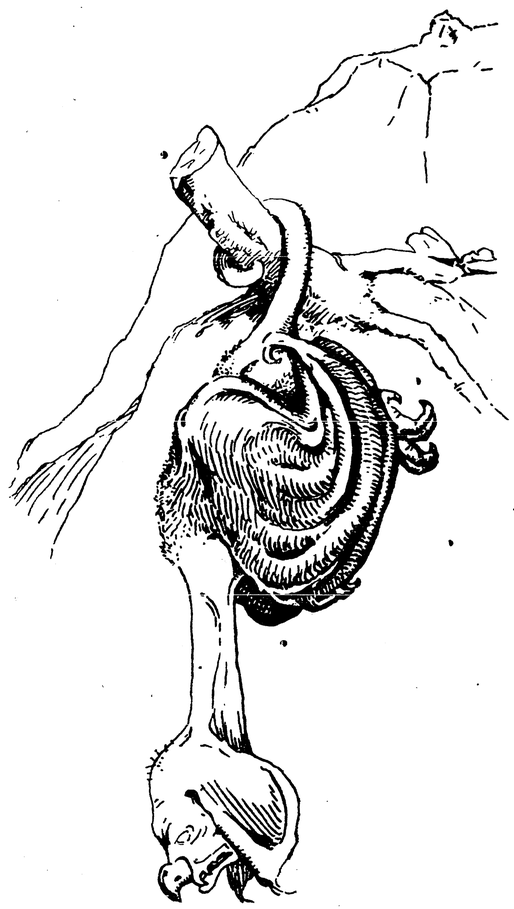

প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ ক'রে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। ভয়ে আমাদের হাত পাগুলো গুটিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল; এমন বিপদের সময় যে পালান দরকার, তা পর্য্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার' উপরে এসে পড়্‌ল। তারপর যে কি হ'ল তা আমার ভাল করে মনে নাই—খালি একটু একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিট্‌কেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মত ডানা ঝাপ্‌টান্ আর জন্তুটার ভয়ানক কট্‌কটাং আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপ্‌টা আমার গায়ে লেগেছিল তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার জোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেই রকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ্ হ'ল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়্‌ছে। ছক্কড় সিঙের একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিঙের বাঁ হাতটা এমন মচ্‌কে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ কর্‌ছে; আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছ্‌ছে, আর এক হাতে একমুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনি আর বেশী আলোচনা না করে জিনিষপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চল্‌লাম।

(প্রফেসার হুঁশিয়ারের ডায়েরী এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখ্‌লেন, "এর কাছেই সব খবর পাবে।" চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্ত্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই :—

আমরা। আপনারা যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে সব কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

চন্দ্র। সে সব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কি! হারিয়ে গেল? এমন এমন জিনিষ সব হারিয়ে ফেল্‌লেন?

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে দেশের ঝড় তো আপনারা দেখেননি। তার এক এক ঝাপ্‌টায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড় বড় তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মত হুস্ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই ত পাঁচ সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার ত ভাব্‌লাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল, সে ত আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা কম্পাস, প্ল্যান ম্যাপ্, খাতা পত্র, কিছুই আর বাকী রাখেনি। কি ক'রে যে ফির্‌লাম, তা শুন্‌লে আপনার ওই চুল দাড়ি সব সজারুর মত খাড়া হয়ে উঠ্‌বে। আধপেটা খেয়ে, কোনদিন বা না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হ'তে আমাদের পুরো তিন মাস লেগেছিল।

আমরা। তা'হলে আপনাদের প্রমাণটমান যা কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে?

চন্দ্র। এই ত আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কি প্রমাণ চাই? আর এই আপনাদের "সন্দেশে"র জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বল্‌ল, "আপনি কোন্ 'থেরিয়াম'?" আর একজন বল্‌ল, "উনি হচ্ছেন 'গপ্প-থেরিয়াম'—বসে বসে গপ্প মার্‌ছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার ত এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরো জান্‌তে চাও, তা'হলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসার হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখ্‌লে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।)

উষা ও সূর্য্য

রাত্রির কন্যা উষা। রাত্রি যখন দেখা দেন তখন উষা তার মায়ের বুকে লুকিয়ে থাকে। রাত্রি যখন বিদায় নেন, তখন অল্পক্ষণের জন্য তাঁর সুন্দর স্নিগ্ধ রূপ সকলের চোখে পড়ে।

ছায়া হলেন সূর্য্যের স্ত্রী, কিন্তু তাঁর রং কালো বলে সূর্য্য তাঁকে পছন্দ করেন না। একদিন রাত্রি যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন মুহূর্ত্তের জন্য সুন্দরী উষার উপর হঠাৎ সূর্য্যের চোখ পড়্‌ল। কি চমৎকার রূপ, কি সুন্দর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্ত্তি। সূর্য্য অবাক হয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চোখের সাম্‌নেই উষা কোথায় মিলিয়ে গেল।

সে দিন সূর্য্যের আর কাজে মন নাই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় অস্তাচল পাহাড়ের ওপারে রাত্রির সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। রাত্রি তখন বসে বসে ভাব্‌ছেন আমার মেয়ের জন্য মনের মত জামাই কোথায় পাই। সোণার মত উজ্জ্বল রূপ, আগুনের মত তেজস্বী, এমন জামাই কোথায় পাওয়া যায়। এমন সময়ে সূর্য্য এসে বল্‌লেন, "আমি আপনার মেয়ে উষাকে বিয়ে কর্‌তে চাই।" শুনে রাত্রি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

পরের দিন রাত্রি তাঁর মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে সূর্য্যের সঙ্গে বিবাহের কথা তাকে জানালেন; কিন্তু উষা বল্‌ল, "আমি কিছুতেই সূর্য্যকে বিয়ে কর্‌ব না। থাকুক তার অনেক গুণ, থাকুক তার আশ্চর্য্য রূপ, আমি তাকে বিয়ে কর্‌ব না।"

আবার সন্ধ্যার সময় যখন সূর্য্যের সঙ্গে রাত্রির দেখা হ'ল, তখন রাত্রি সূর্য্যকে সব কথা খুলে বল্‌লেন। শুনে সূর্য্য বল্‌লেন, "একটিবার যদি তাকে কাছে পেতাম, বুঝিয়ে সুঝিয়ে, মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে নিশ্চয়ই তাকে রাজি কর্‌তে পার্‌তাম।" রাত্রি বল্‌লেন, "তা কি করে সম্ভব হয়?" সূর্য্য বল্‌লেন, "আপনার যখন বিদায় নেবার সময় হবে তখন যদি হঠাৎ তাকে একলা ফেলে পালাতে পারেন, তবে সেই সুযোগে আমি তার কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত্তে তার মন গলিয়ে দিতে পারি।"



সূর্য্য উষাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছেন।

পরের দিন রাত্রির যখন যাবার সময়, তখন উষা হঠাৎ দেখ্‌ল তার মা তাকে ফেলে যেন কোথায় সে পালিয়ে যাচ্ছেন। ভয় পেয়ে বলে উঠ্‌ল "মা, আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

এমন সময় হঠাৎ পূবের আকাশ ভেদ করে মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্য্যদেব বেরিয়ে এলেন। উষা দেখ্‌ল সূর্য্য তাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আস্‌ছেন। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, সে প্রাণপণে ছুটে আকাশভরা মেঘের মধ্যে, পৃথিবীজোড়া আলোর মধ্যে, লুকিয়ে পড়ল। সূর্য্য সারাদিন ব্যাকুল হয়ে তার সন্ধানে ছুটে ছুটে সন্ধ্যার সময়ে রাত্রিকে বল্‌লেন, "আপনার কন্যা ছুট্‌তে ছুট্‌তে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, আমি তাকে খুঁজেই পেলাম না।" রাত্রি বল্‌লেন, "তুমি চেষ্টা কর্‌তে থাক একদিন না একদিন সে ধরা দিবেই।"

সেই থেকে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর আকাশ ভরে কেবল এই খেলাই চলেছে। রাত্রি এসে বিদায় নেন, সুন্দরী উষাকে একলা ফেলে; সূর্য্য রঙীন সাজে পূব আকাশে দেখা দেন; আর তা দেখ্‌লেই উষা দিক্‌বিদিকের আলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। আর ছায়া?—বেচারা বুঝ্‌তে পারে না, কার সন্ধানে তাঁর স্বামী সারাদিন এমন করে আকাশময় ছুটে বেড়ান। তিনি গাছের আড়ালে, পাহাড়ের আড়ালে সংসারের সকল বস্তুর আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিঃশব্দে সূর্য্যের সকল কাণ্ড দেখ্‌তে থাকেন। যে দিকে সূর্য্য যান, সর্ব্বদা সাবধানে তার বিপরীত দিকে আপনাকে আড়াল করে রাখেন,—পাছে সূর্য্য দেখ্‌তে পান। আর সমস্ত পৃথিবীর লোকে অবাক হয়ে দিবা ও রাত্রি রৌদ্র ও ছায়ার এই খেলা দেখ্‌তে থাকে।

চীনে মাটির বাসন

এক সাহেবের একটি খুব দামী চীনে মাটির ফুলদানী ছিল,—সেটা চীনদেশের তৈরী। একদিন সেই ফুলদানী কেমন করে জানি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সাহেব বড় দুঃখ করতে লাগ্‌লেন। শেষটায় ফুলদানীর টুকরাগুলি আস্তে আস্তে কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন করে আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে, খুব সাবধানে বাক্সবন্দি ক'রে চীন দেশে পাঠিয়ে দিলেন; সঙ্গে একখানা চিঠি লিখে দিলেন, যে, ঠিক ঐ রকমের আরেকটি ফুলদানী তাঁকে তৈরী ক'রে দিতে হবে। কয়েক মাস বাদে চীনদেশ থেকে একটা বাক্স তাঁর কাছে এসে হাজির। সাহেবের আনন্দ আর ধরে না; তাঁর ফুলদানী এসেছে! কিন্তু, খুলে যা' দেখ্‌লেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির। তিনি লিখেছিলেন ঠিক

নমুনার মতন ফুলদানী বানাতে, তাই চীনে কারিকর নমুনার মতন ফুলদানী তৈরী ক'রে পাঠিয়েছে—যেখানে যা ভাঙা বা ফাটার দাগ ছিল, যেখানে যেমন দোষ ছিল, সব অবিকল নকল করেছে।

উপরের গল্পটি সত্য ব'লে শোনা গেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চীনেমাটির বাসন বানাতে চীনেরা কত বড় ওস্তাদ। 'চীনে'-মাটি নাম থেকেই বোঝাযাচ্ছে, যে, ঐ জিনিষের আদিস্থান চীনরাজ্যে। বাস্তবিকই চীনেরা প্রায় ১৭০০ বৎসর আগে চীনে মাটির বাসন বানাতে জান্‌ত। ইউরোপের লোকে তখনও এ জিনিষের ব্যবহার শেখেনি; এর অনেক বৎসর পরে ইউরোপে চীনে বাসনের চল হয়েছে। ৩ হাজার বৎসর আগে চীনেরা যে সব যন্ত্র-পাতি ব্যবহার ক'রে, যে উপায়ে চীনে মাটির বাসন বানাত, আজও সেই সব যন্ত্র পাতি দিয়ে সেই উপায়েই তারা কাজ কর্‌ছে। এক 'চিন্‌-তে-চেন' সহরেই প্রায় ২ লক্ষ লোক চীনে-মাটির বাসনের কারখানায় অথবা দোকানে কাজ করে। সেখানে চীনে-মাটিরই রাজ্য—চারিদিকে কেবল কুমারের চাকা ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘুর্‌ছে, বাসন-পোড়াবার উনুনের ধোঁয়া উঠ্‌ছে, আর হাজারে হাজারে লোক বাসন তৈরী কর্‌ছে। এক একটা রাস্তায় কেবলই চীনে-বাসনের দোকান।

সহরের কাছেই নদী, তার ওপারেই চীনে-মাটির পাহাড়। সেখান থেকে ইঁটের মত চাক্‌তি কেটে নৌকা বোঝাই ক'রে এপারে নিয়ে আসে। এই চাক্‌তি ভেঙে গুঁড়ো ক'রে, ছেঁকে নিয়ে, জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঠাসা-ময়দার মত তালপাকিয়ে নেয়। তারপর সেই তালপাকান মাটির উপর দাঁড়িয়ে, তা'কে পা দিয়ে আচ্ছা করে ঠেসে নেয়। সেই ঠাসা মাটি নিয়ে কুমার তার চাকায় নানারকমের বাসন গড়ে। চীনে কুমারেরা বাসন গড়্‌তে বড় ওস্তাদ। মোটা বাসন তাদের কাছে খেলার জিনিষ;—ডিমের খোলার মত পাতলা, এমন কি কাগজের মত পাতলা বাসনও তারা বানাতে পারে! কাগজের মত পাতলা কেবল পিরিচ কিম্বা থালা ছাড়া আর কিছু বানান যায় না।

বাসন গড়্‌বার পর ওস্তাদ চিত্রকরেরা তার গায়ে নানা রকম দাগ, নক্সা কিম্বা ছবি এঁকে দেয়। এই কাজের জন্য খুব ভাল কারিকর অনেক আছে, যারা অতি চমৎকার ছবি আঁক্‌তে জানে। চেয়ারে ব'সে, হাঁটুর উপর বাসনটি রেখে, তুলি দিয়ে এরা বেশ তাড়াতাড়ি ছবি আঁকে।

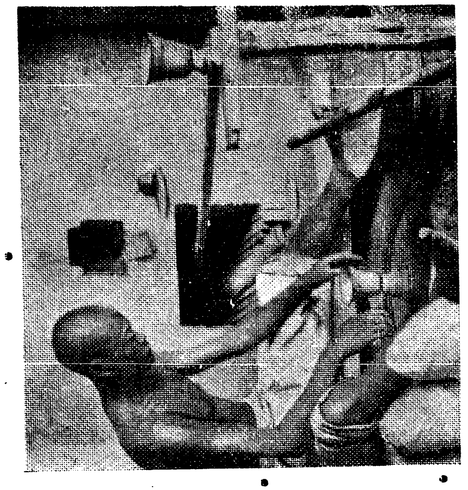

কুমার বাসন গড়িতেছে



পা দিয়ে বাসনের মাটি ঠাসিতেছে



বাসনের গায়ে পালিশের মসলা লাগাইতেছে



বাসনের গায়ে নক্সা করিতেছে

এরপর বাসনটিকে পোড়াবার বন্দোবস্ত কর্‌তে হয়। পোড়াবার উনুনে দেবার আগে, বাসনের গায়ে একটা পালিশের মসলা লাগাতে হয়। এই কাজটি কর্‌বার রকমটা একটু অদ্ভুত। বাসনটিকে একটা গোল টেবিলের উপর বসান হয়; সেই টেবিলটাকে আস্তে আস্তে পা দিয়ে ঘোরান যায়। একজন কারিকর একটা পাত্রে ক'রে পালিশের মসলা নিয়ে (মসলাটা জলের মত তরল) একটা বাঁশের চোঙায় খানিকটা মসলা তার থেকে তুলে নেয়। তারপর বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে, সেই মসলা বাসনের গায়ে লাগায় আর পা দিয়ে আস্তে আস্তে টেবিল শুদ্ধ বাসনটাকে ঘোরায়। এইভাবে সমস্তটা বাসনের গায়ে সমানভাবে মসলা লেগে যায়। তারপর, বাসনটাকে একটা তুন্দুরের মত উনুনে ভ'রে দিয়ে, জোর আগুনে পুড়িয়ে নিলেই বাসন তৈরী হয়ে গেল।

গড়া এবং পোড়ানর কাজ কর্‌তে গিয়ে অনেক বাসন ভেঙে যায়; গড়ার পরও অনেক বাসন ভাঙে। সেই সব ভাঙা বাসন ফেল্‌বার জায়গা একটা দেখবার জিনিষ। 'চিন্-তে-চেন' সহরে ভাঙা বাসনের রীতিমত একটা পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

বৈশাখের ধাঁধার উত্তর

১। টাকা ২। গুণ ৩। চোখ ৪। মুকুন্দরাম

এবারে ধাঁধার উত্তর অনেকেই দিয়াছেন। যাঁহাদের সবগুলি উত্তর নির্ভুল হইয়াছে শুধু তাঁহাদেরই নাম প্রকাশ করা হইল :—

গোবিন্দচন্দ্র দাশ, ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ রায়, সুধাংশুকুমার বসু, শরদিন্দু বসু, জিতেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, হিমাংশুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবকুমার সেন, মধুরমোহন চক্রবর্ত্তী, কালিপদ ভৌমিক, মৃণালপ্রভা দেবী, শিশিরকুমারী দেবী, প্রভাবতী দেবী, প্রকৃতি দেবী, অমিয়াবালা দেবী, মিনুপিনু, অলকা দেবী, জ্যোতিপ্রভা দেবী, সরোজিনী দাস, নীলিমা দেবী, উমাশশী দেবী, ভাপ্রভা দেবী, দত্তফ্যামিলি লাইব্রেরীর সভ্যগণ, রাজেন, অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীথদ সিং দুগড়, টাউন স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চিন্মোহন সেহানবিশ, সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্খচূড় ঘোষ, ব্যোমকেশগণ চৌধুরী, মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবেশচন্দ্র ঘোষ, দাশরথি চক্রবর্ত্তী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, কচি, কল্পনা দত্ত, নির্ম্মলকুমার দাসগুপ্ত, কালীচরণ চৌধুরী, কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলকুমার ঘোষ, প্রদ্যোতকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, অর্দ্ধেন্দুভূষণ গুপ্ত, তারকনাথ সিংহ, হীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য, নির্ম্মলকান্তি গুহ, হৃদয়রঞ্জন অধিকারী, অমরচন্দ্র মিত্র, ব্রজগোপাল কুণ্ডু,

সুধেন্দু দাস, অনিমেষচন্দ্র রায়চৌধুরী, শান্তিচরণ পাল, হিমাংশুশেখর চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভায়া, শচীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, সত্যব্রত ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ বল, বিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য, যতীশকুমার বসু, অশোককুমার রায়, সিদ্ধেশ্বর সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীহারবালা বসু, শৈলেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, প্রীতিকণা বসু, শৈলবালা দেবী, হৈমলতা দাশ, মডেল ট্রেনিং হোমের ছাত্রবৃন্দ, পরিমলচন্দ্র রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বীণাপাণি চৌধুরী, গোবিন্দপ্রসাদ হালদার, হরিপ্রসন্ন সেন, সুখেন্দু ভট্টাচার্য্য, অপরাজিতা দেবী নীলিমা ঘোষ, দিলীপকুমার নন্দী, তারাচরণ সিংহ, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র কুমার বসু, অমিয়চন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন, অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহলতা মজুমদার, উমারাণী দেবী, ইন্দিরা, মৃণালকান্তি ঘোষ, হীরেন্দ্রকুমার সেন, স্নেহলতা দেবী, সুরমা দত্ত, অশোককুমার সেন, নলিনবিহারী সরকার, সুধীরকুমার লোহ, রণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শান্তিপ্রভা দত্তরায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রমজীবি বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র, অনুভা সেন, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত, সুষমা সেন, প্রহ্লাদচন্দ্র সরকার, জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত, বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জি।

নূতন ধাঁধা

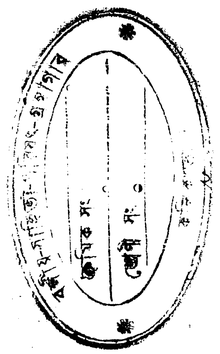
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

১। ধরিয়া চুলের মুঠি—কি ভীষণ হায়!
ঘন ঘন টানাটানি মোচড় কষায়।
নীরবে সহিছে তাও, তবু দেখ তারে
বাঁধিয়া কণ্টকবিদ্ধ করে বারে বারে!

২। বুড়ো, কিন্তু বুড়ো নয়, বয়সে সমান হয়,
কিন্তু সবে বৃদ্ধ কয়—জান তার পরিচয়?

৩। প্রভাতে বায়সকুল জাগি' উঠে যবে
আমিও জাগিয়া উঠি সেই কলরবে।
কৃষ্ণবর্ণ হয় জল আমার পরশে,
পুরুষ সাহসহারা মোর সঙ্গদোষে।

৪। [এক চোর আর এক চোরকে চিঠি লিখিতেছে, তাহার পত্রাংশ নীচে দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে আসল চিঠিখানা লুকান রহিয়াছে। গুপ্ত চিঠি পড়িবার সঙ্কেতটি খুবই সহজ, তোমরা একটু চেষ্টা করিলেই বাহির করিতে পারিবে। গুপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড় দেখি?]

চোদ্দ রাত ইন্দুর মা ললিতের শিয়রে বসিয়া পুত্রসেবায় রত। পার্ব্বতী ঠাকুরুণ ইদু বেচারাকে দেখিতেই রীতিমত হয়রান। ইন্দ্রনাথটা লেখাপড়ায় সর্ব্বাংশে মূর্খ, হরিশেরও বিশেষ পড়াশুনা দরকার। খুড়ামশাইকে বলিও, সারদা বলিল ধানবাদে নেড়া চমৎকার লিচু বেচিতেছে।

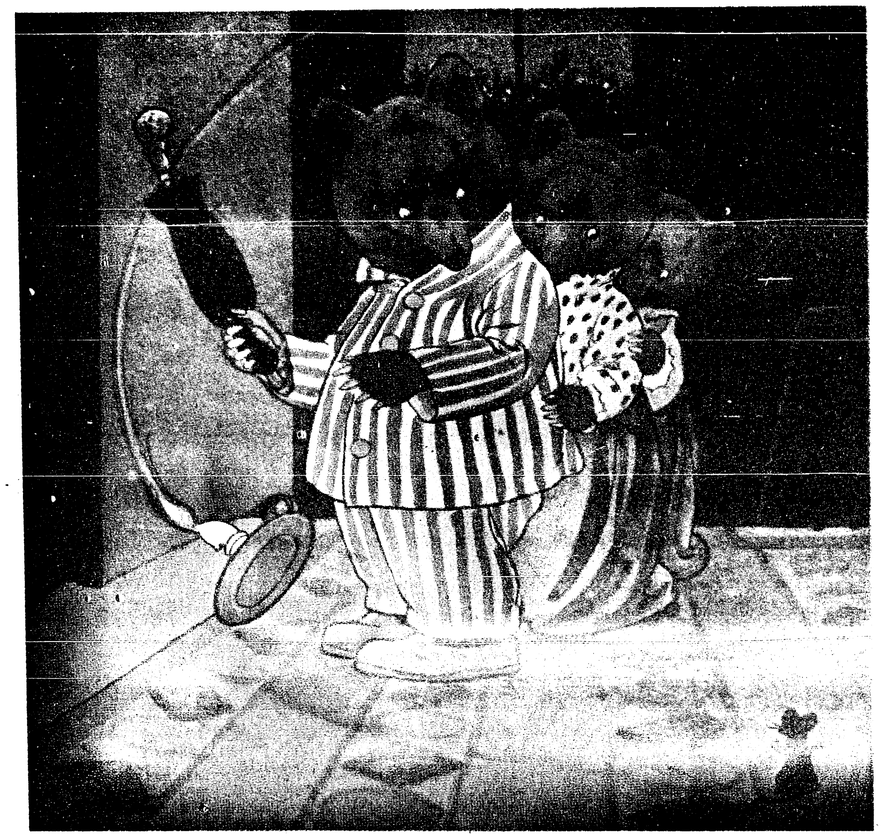

ভাব্‌ছে বুড়ো, কর্‌বো গুঁড়ো ছাতার বাড়ি মেরে,
আবার ভাবে ফস্‌কে গেলে কাম্‌ড়ে দেবে তেড়ে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

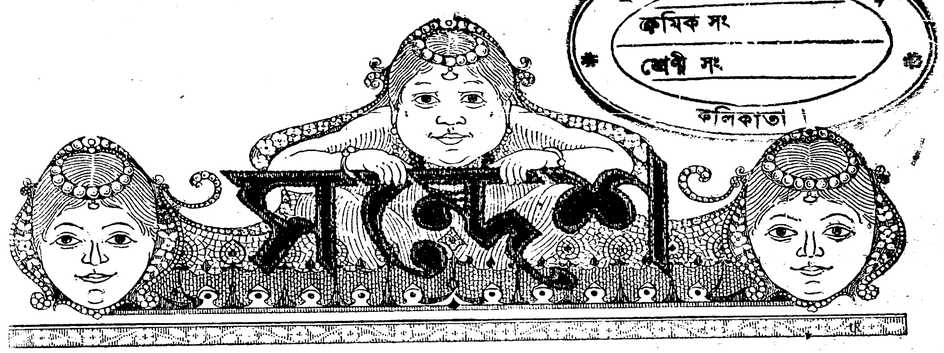

একাদশ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩০ | ৩য় সংখ্যা

বিষম কাণ্ড!

কর্ত্তা চলেন, গিন্নী চলেন, খোকাও চলেন সাথে,
তড়্‌বড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে।
তেড়ে হন্‌হন্ চলে তিন জন যেন পল্টন চলে,
সিঁড়ি উঠ্‌তেই, একি কাণ্ড! এ আবার কি বলে!
ল্যাজ্ লম্বা, কান্ গোল্ গোল্, তিড়িং বিড়িং ছোটে,
চোখ্ মিট্‌মিট্, কুটুস্ কাটুস্—এটি কোন্ জন বটে!
হেই! হুস্! হ্যাস্! ওরে বাস্‌রে মতলবখান কিরে,
কর্‌লে তাড়া যায় না তবু, দেখ্‌ছে আবার ফিরে।
ভাব্‌ছে বুড়ো, কর্‌বো গুঁড়ো ছাতার বাড়ি মেরে,
আবার ভাবে ফস্‌কে গেলে কাম্‌ড়ে দেবে তেড়ে।
আরে বাপ্‌রে! বস্‌ল দেখ দুই পায়ে ভর ক'রে,
বুক দুর্ দুর্ বুড়ো ভল্লুর, মোমবাতি যায় প'ড়ে।
ভীষণ ভয়ে দাঁত-কপাটি, তিন মহাবীর কাঁপে,
গড়িয়ে নামে হুড়্‌মুড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

COLOURED DOCUMENT.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রাত্রের ঘোড়া

রাত্রে উঠে চাষা তার বাড়ীর বাগানে বেরিয়ে এল। এসে দেখে সর্ব্বনাশ! আজও বাগান তোলপাড়। ছোট ছোট চারা গাছগুলি মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে, গাছের ডাল-পালা চার্‌দিকে ছড়ান, যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে; কার পায়ের চাপে বাগানের মাটি পর্য্যন্ত উব্‌ড়ো খাব্‌ড়ো।

সে চেঁচিয়ে তার চাষীকে ডাক্‌ল। চাষী এসে কাণ্ড দেখে অবাক্। এমন সময় পাশের জমির চাষা উপস্থিত। সে বল্‌ল, "ভাই, আমার বাগানেরও এই দশা। আজ তিন রাত্ থেকে গ্রামে এমনি হচ্ছে। এর একটা ব্যবস্থা না কর্‌লে হবে না।" তারা জাপানের লোক, গাছ-পালা খুব ভালবাসে। তাদের কাছে এ রকম উৎপাত অসহ্য।

দুই চাষায় কথাবার্ত্তা চল্‌ছে, হঠাৎ চাষী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ওটা কি? ঐ যে নীল রংএর?" সবাই চেয়ে দেখে, দূরে যেন একটা নীল কাপড়ের পুঁটুলী পড়ে আছে। কাছে যেতে দেখ্‌তে পেল, ঘাসের উপর চাষীর ছেলে ঘুমিয়ে আছে। তাদের পায়ের শব্দে জেগে উঠে ছেলেটি বল্‌ল, "বাবা! ঘোড়া, মস্ত বড় কাল ঘোড়া, আমি দেখ্‌তে পেয়েছি। ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।" তার বাবা বল্‌ল, "আচ্ছা, এখন যাও, ঘরে গিয়ে ঘুমাও। কিন্তু এ গ্রামে কাল ঘোড়া ত কারও নেই?"

পরদিন রাত্রে সে গ্রামের সব লোক চাষার বাড়ীতে জড় হয়েছে, পাহারা দেবে ব'লে। রাত যখন বেশী হ'ল, হঠাৎ কোথা থেকে প্রকাণ্ড এক কাল ঘোড়া ছুটে এসে, বাগান মাঠ ধানের ক্ষেত তোলপাড় ক'রে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল। কোথাও একটু দাঁড়িয়ে, হয়ত কচি ঘাস ছিঁড়ে খায়, আবার ছোটে। লোকেরা সবাই মিলে দড়ি ফাঁস চাবুক নিয়ে হৈ হৈ ক'রে তার পিছনে ছুট্‌ছে, কিন্তু কেউ তাকে ধর্‌তে পারে না। ঘোড়াটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে একটা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে গেল। তারাও পিছন পিছন মন্দিরে ঢুক্‌ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মন্দিরের ভিতরে কোথাও ঘোড়া পাওয়া গেল না! হঠাৎ সেই চাষার ছেলে বলে উঠ্‌ল, "ঐ যে ঐখানে! দেখ, ছুটে ছুটে মুখ দিয়ে কেমন ফেনা বেরোচ্ছে।" বলে সে তার লণ্ঠনটা

উঁচু ক'রে দেয়ালে আঁকা একটা ছবির উপর আলো ফেল্‌ল। সবাই দেখ্‌ল, "একটা প্রকাণ্ড কাল ঘোড়ার ছবি, যেন হাঁপাচ্ছে, আর ঘোড়াটার মুখ দিয়ে সত্যি সত্যি ফেনা বেরোচ্ছে।"

সবাই বল্‌ল, "কার আঁকা ছবি? চল তার বাড়ী।" এই ব'লে তারা, সেই ছবি যে এঁকেছিল, তার বাড়ী গিয়ে তাকে বিছানা থেকে টেনে বা'র ক'রে, একেবারে মন্দিরে নিয়ে এসে বল্‌ল, "এ ছবি এক্ষুণি মুছে ফেল, এর উপর আর কিছু এঁকে দাও।"

চিত্রকর ছবির দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, জীবন্ত ঘোড়া যেন তার দিকে চেয়ে আছে, সেটাকে মুছে ফেল্‌তে তার হাত উঠ্‌ল না। সে কর্‌ল কি, ঘোড়ার পাশে একটা খুঁটি এঁকে দিয়ে ঘোড়াটা তাতে বাঁধা রয়েছে এঁকে দিল।

সেই থেকে সে গ্রামে রাত্রে ঘোড়ার উৎপাতও থেমে গেল। কিন্তু চাষার ছেলে যখনি মন্দিরে যেত, আর সেই ছবির দিকে চাইত, তার মনে হ'ত যেন কাল ঘোড়াটা রেগে তার দিকে চেয়ে আছে, আর লাথি মার্‌বার জন্য ক্ষুর উস্‌খুস্ কর্‌ছে।

শ্রীসুখলতা রাও।

স্বপ্নতরীর সমুদ্রযাত্রা

সুমাত্রা আর যবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে, অষ্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ-আমেরিকার মাঝখানে, কতকগুলি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলিকে 'সাউথ্ সি আইল্যাণ্ডস্' (South Sea Islands) বলে। বাইরের লোকে দ্বীপগুলির খবর ভাল ক'রে জানেনা; কারণ সভ্যদেশের লোক এই সব দ্বীপে খুব কমই যায়। এই সব দ্বীপের লোকেরা খুব সাঁতার কাট্‌তে পারে; এরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে নানা রকম মুক্তা আর সুন্দর সুন্দর প্রবাল তুলে আনে। ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা মধ্যে মধ্যে এই মুক্তা আর প্রবালের জন্য এই সব দ্বীপে যায়। মুক্তার বদলে তারা টুপী, সিল্কের মোজা আর নানা রকম কাপড় দেয়।

যাদের দেশ ভ্রমণের সখ খুব বেশী, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুযোগ পেলে 'সাউথ সি' দ্বীপ গুলিতে যায়। কারণ, সেখানকার দৃশ্য বড়ই সুন্দর; অনেক

রকম ফলের গাছ, ছোট ছোট পাহাড় আর ঝরণা, ছোট ছোট হ্রদ আর নানা রকমের প্রবালে দ্বীপগুলি একেবারে ভরা।

র‍্যাল্‌ফ্‌ ষ্টক্‌ (Ralph Stock) নামে এক সাহেবের অনেক দিন থেকে 'সাউথ্‌ সি' দ্বীপপুঞ্জে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বেচারা গরীব লোক। সহজে ইচ্ছা পূর্ণ করবার শক্তি তাঁর ছিল না। অনেক কষ্টে অনেক দিনের পরিশ্রম আর চেষ্টা যত্নের ফলে তিনি ড্রীম্‌শিপ্‌ (Dream Ship) অর্থাৎ স্বপ্নতরী নামে একখানা ছোট জাহাজ যোগাড় করলেন। জাহাজ বল্‌লাম বটে, কিন্তু আসলে সেটাকে একটু বড় গোছের নৌকা বল্‌লেই ঠিক হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা জুলাই তিনি ইংলণ্ড থেকে রোয়ানা হলেন। জাহাজে তাঁরা চারটি মাত্র লোক—ষ্টক্‌ সাহেব, তাঁর বোন, একজন সৈনিক কর্ম্মচারী আর ষ্টিভ্‌ বলে আর একটি সাহেব। ছোট জাহাজটিতে চড়ে এই চারজন সাড়ে তিন হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিতে চল্‌লেন। ইংলণ্ড ছেড়ে জাহাজ আটলান্টিক মহাসমুদ্র দিয়ে বরাবর দক্ষিণে যেতে লাগল। তাঁদের প্রথমে ক্যানারি দ্বীপে যাওয়ার ইচ্ছা; ক্যানারি দ্বীপ (Canary Islands) আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম তীরের কাছে। তাঁদের জাহাজ বেশ নিরাপদেই যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁরা যখন স্পেন দেশের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হটাৎ এমন ঝড় উঠ্‌ল যে, তাঁরা কিছু সময়ের জন্য তীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। সেখানে তাঁরা তালগাছ দিয়ে ঘেরা একটি সুন্দর বাড়ী দেখ্‌তে পেলেন। সেই বাড়ীর সাম্‌নে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলা

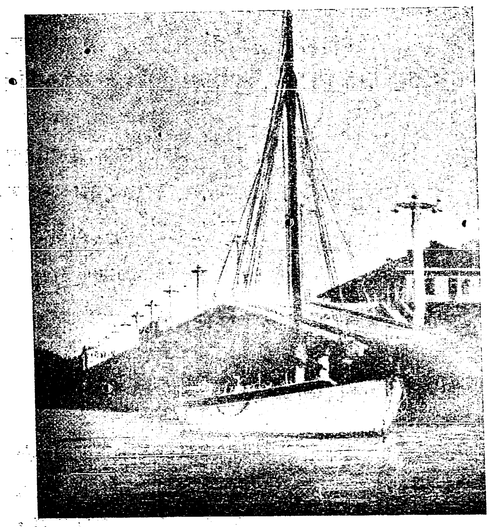

স্বপ্নতরী (Dream Ship)

করছিল। ঝড় না থামা পর্য্যন্ত তাঁরা সেখানেই কাটালেন। বাড়ীর লোকদের ব্যবহারে তাঁরা খুব খুসী হয়েছিলেন। তার পর তাঁরা আবার জাহাজে ফিরে এসে, বরাবর ক্যানারি-দ্বীপপুঞ্জের দিকে যেতে লাগলেন। জাহাজ যাতে ভুল পথে না চ'লে যায়, তাই তাঁরা পালা ক'রে পাহারা দিতেন। তবে, বাতাসের অবস্থা খুব ভাল ছিল তাই বেশী পাহারা দিবার দরকার হ'তনা। কিন্তু রান্না করার কাজ নিয়ে তাঁদের একটু মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল, কারণ, ছোট জাহাজ সমুদ্রের ঢেউয়ে ভয়ানক দোল খাচ্ছিল, আর দোল-খাওয়ার মধ্যে ষ্টোভে রান্না করার অভ্যাস তাঁদের কারোরই ছিল না। একবার ষ্টীভ্‌ সাহেবের রাঁধবার পালা এল, তখন দেখা গেল যে জাহাজের ছাতে পর্য্যন্ত খাবার জিনিষের দাগ লেগে রয়েছে। তিনি রান্না করতে গিয়ে কিরকম ক'রে হঠাৎ খাবার জিনিষ ছিট্‌কিয়ে ফেলেছিলেন, তাতেই ওরকম হয়েছিল।

যা হোক্‌, কয়েক দিন পরেই তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন যে, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের

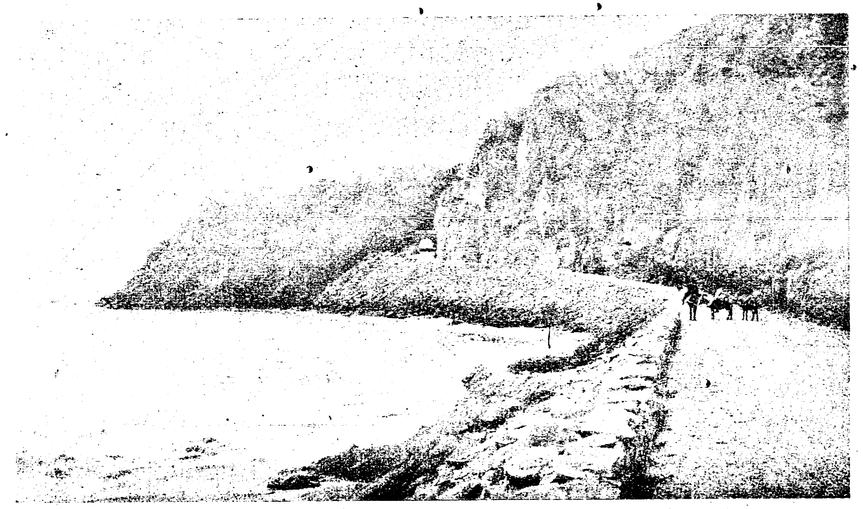

ক্যানারি দ্বীপ

তীর দেখা যাচ্ছে। তা দেখে তাঁদের উৎসাহ খুব বেড়ে গেল, কারণ তাঁরা মনে

করলেন যে, ক্যানারি দ্বীপ পর্য্যন্ত যখন ঠিকমত এসেছি তখন 'সাউথ্ সি আইল্যাণ্ড্স্' পর্য্যন্তও নিরাপদে যেতে পারব। ক্যানারি দ্বীপে তাঁরা কয়েক দিন রইলেন। এই দ্বীপে খুব বড় বড় কুকুর আছে। ইটালি দেশের একজন প্রাচীন লেখকের লেখা থেকে জানা যায়, দু হাজার বছর আগেও এই দ্বীপে খুব বড় বড় কুকুর ছিল। মরেটানিয়ার একজন রাজা, প্রায় দু হাজার বছর আগে এই দ্বীপে এসে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর দেখেছিলেন। তা ছাড়া এখানে 'ক্যানারি' ব'লে একরকম পাখী পাওয়া যায়। এই পাখীর গায়ের রং বাদামী, হল্‌দে, ছেয়ে' আর সবুজ মেশান। এরা নীল রংয়ের ডিম পাড়ে। ক্যানারি দ্বীপে অনেক খেজুর, কলা আর কমলা লেবুর গাছ আছে। আগে এই দ্বীপে 'গোয়াঞ্চ্' নামে এক প্রাচীন জাতি থাকৃত; স্পেন দেশের লোকেরা এই দ্বীপে অনেক দিন থাকার ফলে, সেই প্রাচীন 'গোয়াঞ্চ্' জাতি স্পেন দেশের লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সুতরাং এখন ক্যানারি দ্বীপের লোকদের শরীরে স্পেন দেশীয় আর গোয়াঞ্চি রক্ত আছে।

ক্যানারি দ্বীপে ষ্টক্ সাহেব আর তাঁর সঙ্গীরা দরকারী জিনিষপত্র কিছু কিছু যোগাড় ক'রে নিলেন; তার পর আটলান্টিক মহাসমুদ্র দিয়ে বরাবর পশ্চিমে রোয়ানা হলেন। সাম্‌নে ৩ হাজার মাইল জুড়ে খালি সমুদ্র। এই বিশাল সমুদ্রের উপর তাঁরা ৪জন মাত্র লোক জাহাজে ব'সে চলেছেন। রাত্রে জাহাজের পাশ দিয়ে চক্‌চকে ঢেউ নানা রকম শব্দ ক'রে ঠেলা দিয়ে চ'লে যেত। যার উপর রাত্রে পাহারার অর্থাৎ জাহাজ কোন্‌দিকে যাচ্ছে তা লক্ষ্য রাখবার ভার থাকত, সেই চক্‌চকে জলের উপর দৃষ্টি রাখ্‌তে রাখ্‌তে তার ভয়ানক ঘুম পেত। আবার যখন গভীর রাত্রে সে দেখ্‌ত যে, বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে তারা একখানা ছোট জাহাজে ভেসে চলেছে, তখন তার মনে একরকম ভয়মিশ্রিত আনন্দের ভাব আস্‌ত। ষ্টক্ সাহেব লিখেছেন, "তখন আমাদের মনে হ'ত যেন অসীম আকাশের ভিতর দিয়ে আমরা একটি পরমাণু ছুটে চলেছি।" পালা ক'রে এক একজন প্রায় চার ঘণ্টা ক'রে পাহারা দিতেন, তারপর আর একজনের পাহারা দেওয়ার পালা আসত। বাতাসের অবস্থা ভাল থাকাতে তাঁরা বেশ ভাল মতেই যেতে লাগ্‌লেন। ত্রিশ দিন পরে তাঁরা 'বার্‌বাডোস্' (Barbados) দ্বীপে এলেন। বার্‌বাডোস্ দ্বীপের লোকেরা নিগ্রো জাতীয়। এরা বেশ সভ্যভব্য। সাহেবদের এরা খুব

খাতির যত্ন করেছিল। সাহেবেরা সমস্ত দিন 'সুইজ্‌ল্‌স্' (Swizzles) পান করতেন। 'সুইজ্‌ল্‌স্' বারবাডোস্ দ্বীপের একরকম সরবৎ। লেবুর রস, জায়ফল, বরফ, নানা রকম সরবৎ আর মসলা মিশিয়ে এই সরবৎ তৈয়ারী হয়। বারবাডোস্ দ্বীপে খুব আখের চাষ হয় আর গুড় তৈরী হয়। এই দ্বীপ আমেরিকার 'পানামা' খালের কাছে। সাহেবেরা বার্‌বাডোস্ দ্বীপে কয়দিন খুব আনন্দে কাটালেন। তাঁরা দিনের বেলায় গাড়ী ক'রে দ্বীপের ভিতর বেড়াতে যেতেন আর যখন তখন সেই সরবৎ খেতেন। কয়েকদিন খুব বেড়িয়ে, ঘোড় দৌড় দেখে, সমুদ্রে স্নান ক'রে আর সরবৎ খেয়ে নিয়ে, তাঁরা আবার সেই ছোট জাহাজে চ'ড়ে পশ্চিমে 'পানামা' খালের দিকে রোয়ানা হলেন। 'পানামা' খাল উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে। 'পানামা' খালের দিকে যেতে যেতে হটাৎ তাঁরা পথ গোলমাল ক'রে ফেল্লেন। একটা আলোক-স্তম্ভ (Light house) দেখ্‌তে পেয়ে আবার পথ ঠিক ক'রে নিলেন।

রাত্রে তাঁদের জাহাজের পাশ দিয়ে অনেকগুলা জাহাজ আলো ছড়াতে ছড়াতে চ'লে গেল। দিনের বেলায় তাঁরা দেখলেন যে, কতকগুলা খুব বড় জাহাজ 'পানামা' খালের দিকে যাচ্ছে। 'পানামা' খালের পথ খুব গোলমেলে, তাই সেখান দিয়ে যেতে হ'লে একজন পথ দেখাবার লোক (pilot)কে সঙ্গে নিতে হয়। ষ্টক্ সাহেবের "ড্রীমশিপ্" যখন 'পানামা' খালের ধারে এসে পৌঁছাল, তখন তাঁরাও একজন পথ দেখাবার লোককে জাহাজের উপর নিলেন। তারপর নির্দ্দিষ্ট মাশুল দিয়ে তাঁরা খালের ভিতর জাহাজ নিয়ে গেলেন। খালের ভিতর দিয়ে যেতে হ'লে অনেকগুলা "লক্" (Lock) পার হয়ে যেতে হয়; খালের দুই ধারে দেয়াল গেঁথে, খালের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজা বসান হয়, তাকে লক্ বলে। যখন কোন জাহাজ আসে, তখন দরজা খুলে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়া হয়। ষ্টক্ সাহেবদের জাহাজ 'গাটুন্' লক্ পার হয়ে 'গাটুন্' হ্রদে গিয়ে পড়ল। 'গাটুন্' হ্রদে তাঁরা সবুজ রঙের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট দ্বীপ দেখ্‌তে পেলেন। দ্বীপের ঝোপ ঝাড় থেকে নানা রকম প্রাণীর অদ্ভুত আওয়াজ আস্‌ছিল। জলের উপর দিয়ে মধ্যে মধ্যে বক উড়ে যাচ্ছিল। এখানে এসে কি যেন গোলমাল হ'য়ে জাহাজের কল বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাঁরা পাল তুলে দিলেন, আর জাহাজ খুব আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগ্‌ল। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁরা একটা প্রকাণ্ড

'পেলিক্যান' পাখী দেখ্‌তে পেলেন। বাতাসের জোর খুব কম থাকাতে, তাঁদের জাহাজ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। হটাৎ তাঁরা একটা চক্‌চকে নূতন রং করা প্রকাণ্ড জাহাজ দেখ্‌তে পেলেন। সেই জাহাজটাকে তাঁরা ডাক দিয়ে কাছে আনলেন, আর নিজেদের জাহাজকে সেই বড় জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিলেন। তারপর বড় জাহাজ তাঁদের জাহাজকে টেনে নিয়ে, 'পেড্রো মিগুয়েল (Pedro

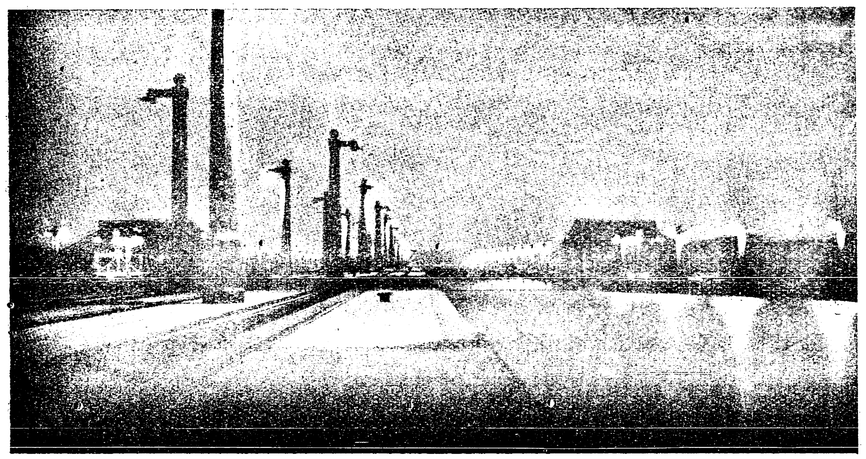

রাত্রে পেড্রোমিগুয়েল্ লকের দৃশ্য

Miguel)' লক্ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে গেল। তাঁরা সেই লকেই রাত কাটালেন। অন্ধকার রাত্রে যখন পেড্রোমিগুয়েল্ লকের চারিদিকে সমস্ত বাতি জ্বলে উঠ্‌ল, তখন এক অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য হ'ল। তাঁরা অবাক্ হ'য়ে এই আশ্চর্য্য দৃশ্য আর লকের বন্দোবস্ত আর নির্ম্মাণ-কৌশল দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)।

শ্রীসুবিমল রায়।

যুদ্ধের গল্প

এক যে ছিলেন রাজা। কি? তোমরা ও রকম পচা গল্প ঢের জান? না, জাননা; এ গল্পে যুদ্ধ আছে, সন্ধি আছে, আরও নানা কথা আছে।

সেই যে ছিলেন রাজা, তাঁহার নাম ছিল বীর রাজা। বীর রাজা এক দিন মন্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার মনটা উস্‌খুস্ করিতেছে, আর হাত নিস্‌পিস্ করিতেছে; তিনি দিগ্বিজয় করিবেন, আর প্রথমেই যুদ্ধ করিবেন তাঁহার পড়্‌শী ধীর রাজার সঙ্গে।

লোক লস্কর হাতী ঘোড়া সাজান হইল, যুদ্ধযাত্রার দিন ঠিক হইল, আর মন্দিরে মন্দিরে বীর রাজার জয়ের জন্য ও ধীর রাজার ক্ষয়ের জন্য পূজা পাঠ হইয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ রাজাকে এত্তেলা দিলেন,—সব প্রস্তুত।

বীর রাজা ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন; তিনি ঘোড়া আনিতে বলিলেন। রাজা বাজে ঘোড়ায় চড়িতেন না,—তাঁহার চড়িবার জন্য দুইটি পছন্দসই ঘোড়া ছিল; একটি ঘোড়া ভাল বাসিত নীল রং দেখিতে, ও আর একটি ভাল বাসিত সবুজ রং দেখিতে। জয় ডঙ্কা বাজিল, শাঁক বাজিল, সংস্কৃতে মন্ত্র পড়া হইল, আর রাজার ঘোড়া দুইটি সাজাইয়া আনা হইল। ঘোড়াদের গলায় ঘুঙ্গুর, মাথায় [illegible] পিঠে সোণালি জরির কাজ করা নানা চিত্রে ছক কাটা

[illegible]সী বাজিয়া উঠিতেই [illegible] সে

TORN PAGE(S).

ভয়ের কথা বলিলেন। যে ছিল কাহারদের দলের সর্দ্দার—অর্থাৎ কিনা বেহারা,* সে রাজাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,—"তাহারা মারা পড়িবে না, কারণ তাহাদিগকে মারিলে অন্য রাজা-বড়লোকদের বহিবার লোক থাকিবে না।" রাজা পাল্কীতে চড়িলেন; আবার শাঁক ও জয়ডঙ্কা বাজিল, ও ভাটেরা বীর রাজার বীর কীর্ত্তির ছড়া আওড়াইতে লাগিল।

বীর রাজার সৈন্যেরা রাতারাতি তাহাদের রাজ্যের সীমানার পাহাড় পার হইয়া ধীর রাজার রাজ্য দিয়া চলিল। কোথাও প্রতিদ্বন্দী সৈন্য নাই,—চাষারা নিরুদ্বেগে ক্ষেতে কাজ করিতেছে, রাখালেরা গান গাইতেছে। বীর রাজার সৈন্যেরা চটিয়া জগঝম্প বাজাইল; চাষারা কাজ ফেলিয়া সৈন্যদল দেখিল, রাখালেরা ছুটিয়া কাছে আসিল, গরুরা ছুটিয়া পলাইল, আর গ্রামের ছেলে মেয়ে ঝি-বৌ-এরা মজা দেখিতে লাগিল। কেহ বলিল পাল্কীতে বৌ যাইতেছে, কেহ বলিল বর বিবাহ করিতে যাইতেছে। রাজা চটিয়া ভাটকে আদেশ দিলেন যে, সে চেঁচাইয়া বলিবে—বীর রাজাই এরাজ্যের মালিক। ভাট চেঁচাইল, কিন্তু সে রাজ্যের কেহ উচ্চবাচ্য করিল না।

বেলা এক প্রহর গড়াইবার পর বীর রাজা সসৈন্যে ধীর রাজার সিংহদ্বারে গিয়া তুরী ভেরী বাজাইলেন। প্রহরীরা সসম্মানে ফটক খুলিয়া দিল, আর "আস্‌তে আজ্ঞা হউক্—আজ আমার সুপ্রভাত" ইত্যাদি বলিয়া ধীর রাজা বীর রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বীর রাজা পাল্কী থেকে নামিয়াই মহা দর্পে বলিলেন যে সে রাজ্যটা তাঁহার। ধীর রাজা বীর রাজাকে হাত ধরিয়া [illegible] লইয়া বলিলেন,—"এ বাড়ী ঘর সবই আ[illegible]হার করুন, এবং আপন[illegible] খাইস[illegible]

যে তাঁহার সৈন্যেরা একটা বড় চাবি-দেওয়া ঘরে বিশ্রাম করিতেছে, আর অস্ত্রশস্ত্র রাজগুদামে বন্ধ আছে; তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ধীর রাজার সৈন্যেরাই তাঁহাকে জয়ধ্বনি শুনাইতে পারে। বীর রাজা চটিয়া ফটকের দিকে ছুটিলেন,—কিন্তু দেখিলেন ফটক বন্ধ।

বীর রাজা চটিয়া ধীর রাজাকে বলিলেন,—"আমি এই রাজ্য জয় করিয়াছি, তুমি অধীনতা স্বীকার কর, এবং প্রথা অনুসারে তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ দাও।" ধীর রাজা জানাইলেন যে বীর রাজার মত সুপাত্রকে কন্যা দান করিতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু এখনও তাঁহার মেয়ে হয় নাই, এবং তাঁহার পক্ষে সসম্মানে ফিরিয়া যাইবার পথেও বাধা হইবেনা; কারণ ধীর রাজার দূতেরা বীর রাজার রাণীর কাছে—রাজ-খালাশি টাকা লইয়া শীঘ্রই ফিরিবে। বীর রাজা বুঝিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—তিনি বন্দী। ধীর রাজা বলিলেন,—"আমার সুপ্রভাত, আপনি এখানে পায়ের ধূলা দিয়াছেন; আপনার রাণী যে টাকা পাঠাইবেন, তাহা দিয়া অনেক টোল পাঠশালা ও চিকিৎসালয় করা যাইবে এবং তাহাতে এরাজ্যে আপনার নাম থাকিবে; আর আপনার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য ঠিক করা গিয়াছে যে আপনার রাজ্যের সীমার পাহাড়টি এরাজ্যকে দান করিলেন বলিয়া সন্ধিপত্রে লিখিয়া দিবেন।" মন্ত্রী আনিয়া বীর রাজাকে সন্ধির কাগজ দিলেন, এবং বীর রাজা যেমন করিয়া হউক দস্তখত দিলেন।

রাণী যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছিল; বীর রাজার সৈন্যেরা বিনা হাতিয়ারে ফিরিল, এবং ধীর রাজার সৈন্যেরা পাহাড় দখল লইতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রাজা পাল্কীতে চড়িলেন, কিন্তু মাথার পাগ্‌ড়ি খুঁজিয়া পাইলেন না; খালি মাথায় গেলে পথের লোকেরা তাঁহাকে পরাজিত রাজা মনে করিবে ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। ধীর রাজা বলিলেন,—"আপনি যাইবেন পাল্কীতে, কাজেই উষ্ণ তাপ নিবারণের জন্য উষ্ণীষের প্রয়োজন নাই, এবং কেহ যুদ্ধ করিতে আসিবেন বলিয়া শিরের ত্রাণের জন্য—অর্থাৎ মাথা বাঁচাইবার জন্য শিরস্ত্রাণের প্রয়োজন নাই।" বীর রাজা বুঝিলেন,—এখন অন্য টুপি মাথায় দিলে গাধার টুপি পরা হইবে। বীরে ধীরে এই রকমেই যুদ্ধ হয়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

TORN PAGE(S).

নাগপাশে বাঘ ধরা



ছবিতে দেখ, কত বড় একটা চিতাকে এক সাহেব জীয়ন্ত ধরে কাঁধে করে তাঁবুতে নিয়ে চলেছেন। এটা কিন্তু গল্প নয়, সত্যি কথা। সাহেবটি হচ্ছেন মেজর জ্যাক্ এলান্। ইনি জাগুয়ার, চিতাবাঘ, বাঘ প্রভৃতির মত সাংঘাতিক হিংস্র জন্তুগুলিকে, শুধু দড়ির ফাঁস এবং লোহার শিকলের সাহায্যে বন থেকে জীয়ন্ত ধরে আনেন। তিনি যেমন দড়ির ফাঁস ব্যবহার করেন, তাকে বলে "ল্যাসো"। এটি আমেরিকার আদিমবাসী "রেড্ ইণ্ডিয়ান্-দের" শিকারের একটি সাংঘাতিক যন্ত্র। খুব লম্বা দড়ির ডগায় একটা ফাঁস। দড়িটি গুটিয়ে হাতে করে রাখে। মহিষ, হরিণ কিংবা বুনো ঘোড়া ধর্‌বার সময়, দলবেঁধে যখন তারা ছুটে পালায়, তখন দূর থেকে রেড্ ইণ্ডিয়ানেরা পালের সেরা জন্তুটিকে লক্ষ্য করে, অব্যর্থ সন্ধানে ল্যাসোটি এমন ভাবে ছুড়ে মারে যে, তার ফাঁস্‌টি গিয়ে সেই জন্তুর গলায় আট্‌কাবেই আট্‌কাবে। তারপর টানাটানিতে ক্রমাগত ফাঁস গলায় এঁটে যায় আর জন্তুটাও কাবু হয়।

মেজর এলান্ ল্যাসো-ছোড়া বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। তিনি ল্যাসো এবং শিকলের সাহায্যে, মহা মহা হিংস্র জন্তুকেও বন থেকে জীবন্ত ধরে এনে, পৃথিবীর নানা জায়গার চিড়িয়াখানায় চালান করেন। নিতান্ত প্রাণের দায়ে না হলে কখন বন্দুক ব্যবহার করেন না। মেজর সাহেব লিখেছেন :—

"আমি যখন কেনাডায় ছিলাম, তখন ফ্রাঙ্ক নামে এক আনাড়ি কিছুদিন আমার সঙ্গী ছিল। একদিন স্থির কর্‌লাম, ফাঁদ পেতে নেক্‌ড়ে বাঘ ধর্‌তে হবে। নেকড়ে বাঘ দেখ্‌তে ছোট হলেও বেজায় হিংস্র—বিশেষতঃ যখন পেটের জ্বালায় তারা চার্‌দিকে ঘুরে বেড়ায়।

বনের ধারে, মাটিতে খুব মজবুত করে একটা খোঁটা পুঁত্‌লাম। কাছেই একটা বেশ শক্ত একহারা চারাগাছ ছিল। তার ডগায় ল্যাসো লাগিয়ে, ডগাটা জোর করে টেনে নুইয়ে এনে, সেই খোঁটার সঙ্গে বাঁধ্‌লাম। নেক্‌ড়ের খুব প্রিয় খাদ্য, যার গন্ধ পেলে সে পাগল হয়ে যায়, তেম্‌নি খাদ্য খোঁটায় বেঁধে, গাছের ডগাটির সঙ্গে এমন ভাবে একটা ফাঁস খাটিয়ে রাখ্‌লাম, যে, তার ভিতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে নেক্‌ড়েকে খাদ্য ধর্‌তে হবে আর খাদ্য ধরে টান্‌বামাত্র, চারাগাছের ডগাটি আল্‌গা হয়ে ঠিক্‌রিয়ে উপর দিকে উঠ্‌বে।

ফাঁদ পেতে আমি কাছেই লুকিয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বার পর দেখ্‌লাম, নেক্‌ড়েমশায় বন থেকে বেরিয়েছেন আর বেরোবামাত্রই খাবারের গন্ধটি তার নাকে গিয়েছে। তবু কিন্তু আস্তে আস্তে, ভারি হুঁশিয়ার হয়ে সে এগুতে লাগ্‌ল। তারপর ক্রমে যাই একটু ভরসা হয়েছে, অমনি একলাফে গিয়ে পড়েছে খাবারের উপর।

তখন ব্যাপারটা কি হলো, বুঝ্‌তেই পার। খাদ্যে টান পড়ামাত্র গাছের ডগা আল্‌গা হয়ে যাওয়ায়, এক হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে গাছ একেবারে সটান সোজা! তখন চেয়ে দেখি—নেক্‌ড়েমশায় গলায় ফাঁস পরে গাছের ডগা থেকে, ঐ শূন্যে ঝুল্‌ছেন! তখন তার কি ভীষণ টানাটানি, আর কি রাগ!

আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে, আর একটা ল্যাসো ছুঁড়ে মার্‌লাম নেক্‌ড়ের গায়ে। তারপর কয়েকটা মোচড় আর পাক দেবার পর, ল্যাসোটা তার গায়ে, হাতে, পায়ে এমন ভাবে জড়িয়ে গেল, যে, তার আর নড়্‌বার চড়্‌বার শক্তি রইল না। তখন গাছের ডগা থেকে নামিয়ে সেটাকে মাটিতে রাখ্‌লাম। তার চোখ দুটো

লাল, রাগে কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকাচ্ছে! কিন্তু হায় বেচারি এম্‌নি নাগ-পাশের, বাঁধনে পড়েছে,যে,কিছু কর্‌বার যো নাই। তখন তাকে কাঁধে ঝুলিয়ে তাঁবুতে নিয়ে চল্লাম।

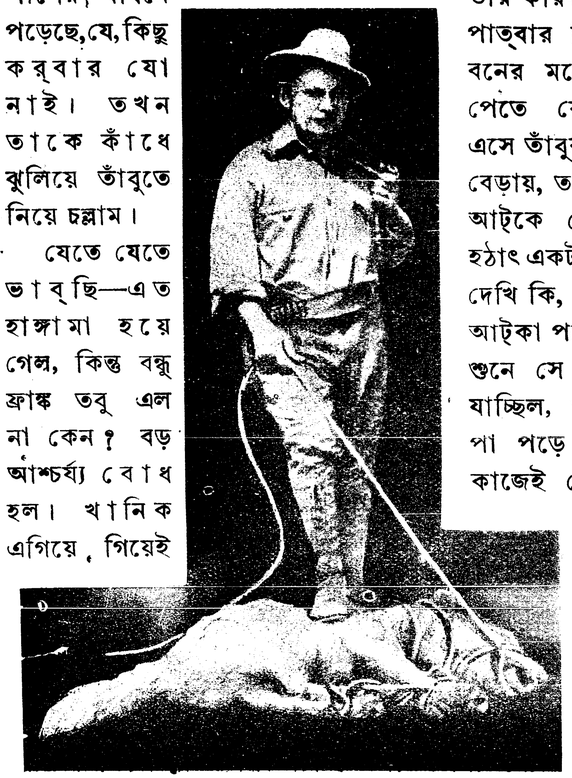

যেতে যেতে ভাব্‌ছি—এত হাঙ্গামা হয়ে গেল, কিন্তু বন্ধু ফ্রাঙ্ক তবু এল না কেন? বড় আশ্চর্য্য বোধ হল। খানিক এগিয়ে, গিয়েই তার কারণও দেখ্‌লাম। নেক্‌ড়ের ফাঁদ পাত্‌বার কিছু আগে তাঁবুর কাছেই, বনের মধ্যে আর এক রকমের ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম—ভাল্লুক টাল্লুক এসে তাঁবুর কাছে যদি পাইচারি করে বেড়ায়, তবে হঠাৎ সেই ফাঁদে তার পা আট্‌কে যেতে পারে। এমন সময় হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখি কি, ফ্রাঙ্ক বেচারি ভাল্লুকের ফাঁদে আট্‌কা পড়ে চেঁচাচ্ছে। নেক্‌ড়ের গর্জন শুনে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, আর হঠাৎ ভাল্লুকের ফাঁদে পা পড়ে বিষম আট্‌কে গিয়েছে! কাজেই বেচারি আর নেক্‌ড়ে ধরার মজাটি ভোগ কর্‌তে পারে নাই।

জাগুয়ারের মত এমন হিংস্র এবং ভীষণ জন্তু আমেরিকায় খুব কমই আছে। আমার এক বন্ধু একবার ক্যালিফর্ণিয়া সহরে জাগুয়ারের হাতে এমনি নাকাল হয়েছিলেন, যে, তিনি আমাকে খুব স্পর্দ্ধা করে বল্‌তেন—"ল্যাসো দিয়ে হয়ত সব জন্তুই জীয়ন্ত ধর্‌তে পার্‌বে কিন্তু বাদে জাগুয়ার!" বন্ধুর কথা শুনে আমারও জেদ হলো, ল্যাসো দিয়ে জাগুয়ার ধর্‌তেই হবে।

একদিন কতগুলি কুকুর ও লোকজন নিয়ে জাগুয়ার ধর্‌তে গেলাম। অনেক খুঁজে খুঁজে শেষটায় এক জায়গায়, কুকুরগুলোর মাথা নীচু করে মাটি শুঁক্‌বার রকম

দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তারা শিকারের গন্ধ পেয়েছে। একটু পরেই দেখি জাগুয়ার মশায় গুঁড়ি মেরে মেরে গাছের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। অম্‌নি সকলে চারদিক্ ঘেরাও করে কুকুর লেলিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চীৎকার আর ঢিল ছোঁড়া ত আরম্ভ হলোই, আকাশ পানে বন্দুকের কয়েকটা আওয়াজও কর্‌লাম। তারপর হঠাৎ, ঠিক আমি যা চাচ্ছিলাম তাই হলো—জাগুয়ার ভায়া তীরের মত বেগে একটা গাছে গিয়ে চড়্‌ল। আর উঁচুতে হামা দিয়ে বসে, আমাদের দিকে চেয়ে গর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল।

আর মুহূর্ত্তও দেরি কর্‌লাম না, একটা ল্যাসো নিয়ে ছুঁড়ে মার্‌লাম তার দিকে। ল্যাসোর ফাঁস্‌টি গিয়ে পড়্‌ল একেবারে জাগুয়ারের গলায়। তখন আমার হাতের

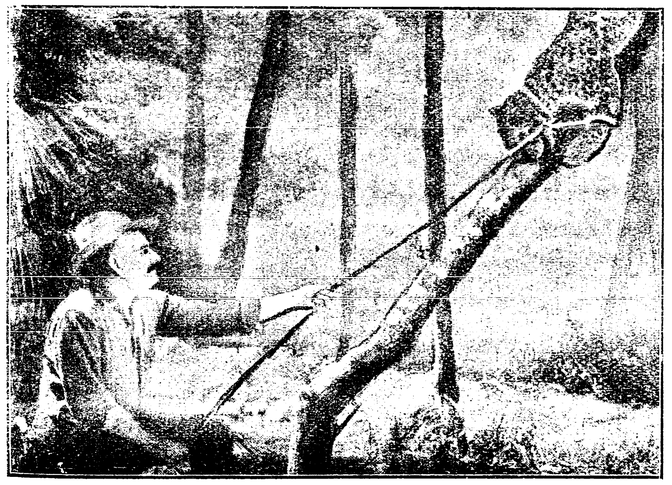

মাথাটা ধরে টেনে,খুব মজবুত করে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধলাম। তত-ক্ষণে আর একটা ল্যাসো নিয়ে জাগুয়ারটার গলায় আরও একটা ফাঁস লাগিয়ে, দড়ির মাথাটা অন্য একটা গাছে বেঁধে দিলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তৃতীয় ল্যাসোর ফাঁস্‌ও গিয়ে তার গলায় পড়্‌ল। আর সেই দড়িটা ধরে প্রাণপণে ক্রমাগত খালি টানের উপর টান।

ততক্ষণে জাগুয়ারটা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে। ফাঁস ছাড়াবার চেষ্টায় একবার এ ডালে একবার সে ডালে, ওলট্ পালট্—কত রকমই কর্‌তে লাগ্‌ল! শেষে এই

রাগই হলো তার জব্দ হবার কারণ। অবসর বুঝে দড়ি ধরে এমন হ্যাঁচ্‌কা টান মার্‌লাম, যে, সে গাছ থেকে একেবারে ধপাস্ করে এসে মাটিতে পড়্‌ল।

মাটিতে পড়েই গড়াগড়ি, লাফালাফি, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন। ভয় হলো, বুঝিবা দড়ি টড়ি ছিঁড়ে ফেলে! তখন অবসর বুঝে একটা মোটা ডাল নিয়ে, একেবারে তার মুখের হাঁর মধ্যে এড়োভাবে গুঁজে দিলাম। তখন তার রাগ গিয়ে পড়্‌ল সেই ডাল্‌টার উপর। যেন সেটাকে কাম্‌ড়িয়ে গুঁড়োই করে ফেল্‌বে! ততক্ষণে দড়িগুলো তার গায়ে বেশ করে জড়িয়ে গিয়েছে। তার উপর আবার আমি কর্‌লাম কি, চট্ করে তার লেজটা ধরে ফেলে, তার সমস্ত শরীরটাকে ঘুর্‌পাক খাইয়ে, আরও ভাল করে দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে দিলাম। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার তেজ সমান ভাবেই ছিল, কিন্তু অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে দড়ির বাঁধন পড়েছে—বেচারি কাবু না হয়ে করে কি?

যখন ভারতবর্ষে ছিলাম, তখন জীয়ন্ত চিতাবাঘ ধরেছিলাম। চিতাবাঘের শরীরে বাঘের চাইতে শক্তি কম হলেও, সে বেশী চালাক ও চট্‌পটে এবং জাগুয়ারের মত গাছে-চড়া বিদ্যায় সে ওস্তাদ। সুতরাং তার সঙ্গে কারবার করা বড় সাংঘাতিক।

যে চিতাবাঘটার কথা বল্‌তে যাচ্ছি, সেটা কিছুদিন থেকে একটা গ্রামে ভারি অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। গ্রামের গরু, ছাগল মেরে আর কিছু রাখে নাই। সেই গ্রামের মোড়ল, আমি সেখানে যাবার কিছু আগে, একদিন প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে সেই বাঘের একটা ছানাকে প্রায় বাঘিনীর মুখের কাছ থেকে কেড়ে এনেছিল। আমি সেই গ্রামে গেলে পর মোড়ল এসে বাঘ মার্‌বার জন্য আমাকে অনুরোধ কর্‌ল। আমি রাজি হলাম। একথা গ্রামে প্রচার হবামাত্র, গ্রামের সমস্ত লোক এসে আমার কাছে হাজির।

এর খানিক পরে একটা লোক মহা ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে এসে খবর দিল, যে, বাঘটা কাছেই একটা বনে গাছে চড়ে বসে আছে। একথা শুনেই আমি আর আমার বন্ধু ব্রাড্‌লি তখনই হাতী চড়ে রোয়ানা হ'লাম—সেই লোকটা আগে আগে পথ দেখিয়ে চল্‌ল। যেতে যেতে আমাদের চোখ রইল সব গাছের ডগায়—কে জানে কোন্ গাছ থেকে আবার বাঘ হঠাৎ আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে? এমন সময় সেই লোকটা হঠাৎ থেমেই সাম্‌নের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। চেয়ে দেখি, সত্যি সত্যি বাঘমশায় একটা গাছে দুটো ডালের মাঝখানে বসে আছে, আর আমাদের দেখ্‌তে পেয়েই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রাগে ভেঙ্‌চি কাট্‌ছে।

এরূপ অবস্থায় চট্‌পট্ কাজ করাই মঙ্গল। মাহুতটাকে বল্‌লাম, হাতীটাকে গাছের তলায় নিয়ে যেতে। আর যেতেই হাওদায় দাঁড়িয়ে আমার "নাগপাশ" হাতে নিলাম। এটা ছিল লোহার তার আর পাট দিয়ে পাকান শক্ত একটা দড়ি তার ডগায় তারের একটা ফাঁস দেওয়া—শত কামড়িয়েও বাঘ তার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। এই দড়িটা বাড়িয়ে হঠাৎ ফাঁসটা বাঘটার গলায় লাগিয়ে ফেল্‌লাম। তারপর হাতে দড়ি ধরে, খালি টানের উপর টান্! বাঘের সঙ্গে লেগে গেল আমার "টাগ্-অব-ওয়ার্"। খানিকক্ষণ টানাটানির পর হঠাৎ কি যে একটা ব্যাপার হলো তা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমিই জিত্‌লাম কি বাঘটাই লাফিয়ে পড়্‌ল তা বল্‌বার যো নাই, কিন্তু চেয়ে দেখি বাঘ একেবারে হাওদার উপরে এসে পড়েছে! ব্রাড্‌লি হাওদার এক পাশ দিয়ে ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছে, অন্য পাশ দিয়ে আমি আর বাঘ গড়িয়ে একেবারে মাটিতে!

মাটিতে পড়ে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আমিও লাফিয়ে উঠে দেখ্‌লাম, ফাঁসটা বাঘের গলা থেকে খুলে যায়নি, বরং আরও মজবুত হয়ে বসেছে। আমার ভাগ্য ভাল, বাঘটা এই ঘটনায় বেজায় ভয় পেয়ে কি রকম জানি বেতমত খেয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে শুদ্ধ হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের দিকে ছুট্‌ল। আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, সেই মুহূর্ত্তে একটা কিছু না কর্‌তে পার্‌লে বাঘ ফাঁকি দিবে। তখন দৌড়ের উপরেই একটা গাছের চারদিকে দড়ির মাথাটা জড়িয়ে ফেল্‌লাম। বাঘটাও হঠাৎ গলায় ভীষণ হ্যাঁচ্‌কা টান পড়ায় থম্‌কে দাঁড়াল। এদিকে আমিও দড়ির মাথা গাছের সঙ্গে খুব মজবুত করে বাঁধ্‌লাম।

এখন আর কি? এখন ত বাঘ আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। তারপর ল্যাসোর পর ল্যাসো ছুড়ে বাঘটাকে নাগপাশ-বাঁধা করে ফেল্‌লাম।

এদিকে ব্রাড্‌লির যা দুরবস্থা! বেচারি হাওদা থেকে ছিট্‌কে একটা নালায় গিয়ে পড়েছিল। নালাটায় জলের লেশমাত্র নাই, শুধু কাদা। সেই কাদায় ব্রাড্‌লি এমন এঁটে বসে গিয়েছে যে, তা'কে উদ্ধার কর্‌তে আমাদের রীতিমত নাকাল হ'তে হয়েছিল। তারপর ল্যাসো-বাঁধা জীয়ন্ত চিতাবাঘটাকে নিয়ে যখন গ্রামে ফিরে গেলাম, তখন গ্রামবাসীরা ত একেবারে অবাক্! আমার প্রশংসা তাদের মুখে আর ধরে না।

এবারে আসল বাঘ ধরার একটা ঘটনা বল্‌ছি—এটা হয়েছিল অন্য একটা গ্রামে। এ বাঘটা ছিল ভারি জোয়ান আর চমৎকার দেখ্‌তে, বড়ও ছিল খুবই। বাঘটার কথা আমি ও ব্রাড্‌লি আগেই শুনেছিলাম, আর শুনেই স্থির করেছিলাম এটাকে যেরূপে হোক্ জীয়ন্ত ধর্‌তে হবে।

গ্রামে গিয়ে লোকদের কাছে বাঘধরার প্রস্তাব কর্‌তেই, তারা মহা উৎসাহে আমাদের সাহায্য কর্‌তে এল। বনে গিয়ে একটা ভাল জায়গা দেখে সকলকে লাগিয়ে দিলাম—গাছের মোটা ডাল পুঁতে একটা খোয়াড় বানাতে। খোয়াড়ের এক পাশে, বাঘটা সহজেই ঢুকতে পারে এমন একটা দরজা রাখা হলো। এই দরজার চারদিক্ ঘুরিয়ে, একটা লোহার শিকলের ফাঁস ঠিক মালার মত করে ঝুলিয়ে দিলাম। বাইরে দরজার মুখের পাশে, ঠিক মুখোমুখি দুটো গাছে শিকলের দুটো মাথা বেশ করে বাঁধা হলো। কথা রইল, আমি ও ব্রাড্‌লি এক এক গাছে চড়ে শিকলের মাথা ধরে বসে থাক্‌ব। খোয়াড়ের ভিতরে একটা ছাগল বাঁধা থাক্‌বে এমন ভাবে, যে, ভিতরে না ঢুকে বাঘ সেটাকে ধর্‌তে পার্‌বে না। তারপর বাঘ এসে দরজার ভিতরে মাথাটি ঢুকাবামাত্র, হঠাৎ দুই দিক থেকে শিকল টেনে ধর্‌ব। ফাঁসটা এমন ভাবে সাজান যে, বাঘ যত টানাটানি কর্‌বে তত সেটা আঁট হয়ে তার গলায় বসে যাবে এবং তার গায়ে জড়িয়ে যাবে।

খোঁয়াড় তৈরি হলে, তার ভিতরে একটা ছাগল বেঁধে দিলাম। তারপর অন্ধকারে কাল ওভারকোট মুড়ি দিয়ে, আমি ও ব্রাড্‌লি দুই গাছে চড়ে ব'সে রইলাম।

ঘণ্টা দুই কেটে গেল, তবু বাঘের সাড়া শব্দ নাই। এমন সময়ে শুন্‌তে পেলাম, ছাগলটা হঠাৎ ডাক্‌তে আরম্ভ করেছে আর বাঁধনের দড়িটা টানাটানি কর্‌ছে। কাণ খাড়া করে, চোখ বড় করে খোয়াড়ের দরজার দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু বাঘ হাঁট্‌বার সময় কি তার পায়ের শব্দ হয়?

হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লাম, বাঘ একেবারে খোয়াড়ের দরজায়—চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে, আর ঢুক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে! ঠিক এক সঙ্গে আমি ও ব্রাড্‌লি শিকল ধরে টান দিলাম। শিকলের ফাঁস গলায় লাগ্‌তেই, বাঘটা এমনই ভয়ঙ্কর এক লাফ দিল যে, গাছ দুটো থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু তাতে শিকলটা আরো বেশী করে এঁটে গেল। তারপর বাঘটা খালি লাফের উপর লাফ, টানের উপর টান—কিন্তু

শিকল ছিঁড়্‌ল না, ক্রমাগত বাঁধন আঁট্‌তে লাগ্‌ল। আমরা প্রাণপণে শিকল ধরে রেখেছি কিন্তু এক একবার হাতে এমনি টান পড়্‌ছিল যে, একটা টানের চোটে ব্রাড্‌লি গাছ থেকে ছিট্‌কে গিয়ে শিকল ধরে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। আমার ত চক্ষু স্থির! এইবার বুঝি বাঘটা ব্রাড্‌লিকে ধরে ফেলে! তখন আমি আর করি কি, আমার দিক্‌টা প্রাণপণে আঁক্‌ড়ে ধরে টান্‌তে লাগ্‌লাম।



বাঘটার হুটোপাটিতে খোঁয়াড়ের খানিকটা চুরমার হয়ে পড়ে গেল। ভয় হলো বুঝিবা এইবার শিকার পালায়। কিন্তু দেখ্‌লাম নাগপাশের বাঁধন ঠিকই আছে। যা-হোক্, বাঘেরও বলের সীমা আছে। ভায়া একটু কাহিল হতেই, অমনি চট্ করে গাছ থেকে নেমে, ল্যাসোর উপর ল্যাসো ছুঁড়ে আচ্ছা ক'রে তাকে জড়িয়ে ফেল্‌লাম।

তারপর আর কি—গ্রামের লোকেরা এসে বাঘটাকে একটা কাঠের ডাণ্ডায় ঝুলিয়ে, মহা উল্লাসে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে গ্রামে নিয়ে গেল, সকলকে দেখাবে বলে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

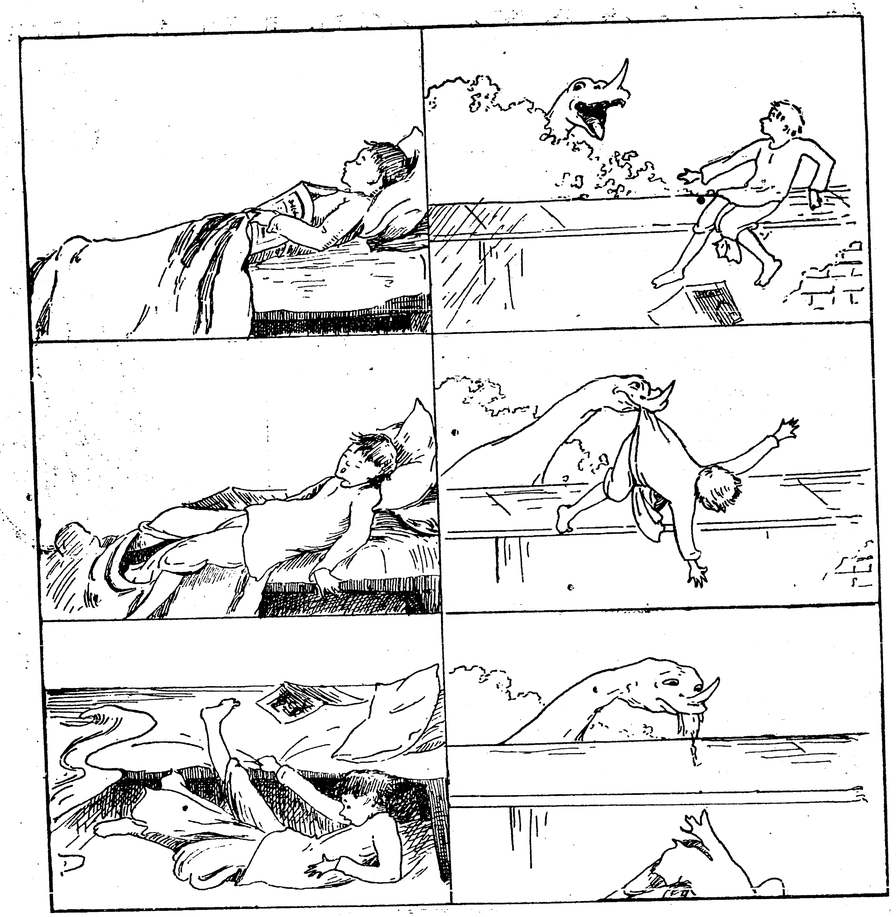

ঘুমের ঘোরে

(১) গল্প পড়ার আশে
বইখানি নিয়ে বিছানায় শুয়ে
চোখটি বুজিয়া আসে।

(২) স্বপ্ন দেখে সে হেন—
দেয়ালেতে চ'ড়ে মন দিয়ে পড়ে
'সন্দেশ' নিয়ে যেন।

হঠাৎ পিছনে তার,
গলাটা বাড়িয়ে হুবহু দাঁড়িয়ে
গল্পের জানোয়ার!

(৩) বেজায় চম্‌কে যেই
বিছানার ধারে পড়ে একেবারে,
বিকট চেহারা সেই—

(৪) লাফ দিয়ে হুশ্‌ করে
নেয় তারে তুলে, শূন্যেতে ঝুলে
মাথা বন্‌ বন্‌ ঘোরে।

(৫) ফড়্‌ ফড়্‌ ফড়্‌ ফটাং
ছিঁড়ে জামাখান হ'ল খান খান,
পড়্‌ পড়্‌ পড়্‌ সটাং।

(৬) ধাঁই ক'রে যেই মাটি
লাগাল ধাক্কা, পড়িল পাক্কা
ঘুমের মাথায় চাঁটি।

———

শ্রীসুখলতা রাও।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

গুহক চণ্ডাল

(কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্রকে ভুলক্রমে শব্দভেদী বাণে বধ করিলেন। তারপর মৃত মুনিপুত্রকে কাঁধে লইয়া যখন অন্ধমুনির নিকটে গেলেন, তখন মুনি যোগবলে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া, রাজা দশরথকে শাপ দিলেন—"তোমারও পুত্রের শোকে মৃত্যু হইবে।" মুনির শাপ শুনিয়া দশরথের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কারণ, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সন্তান না হওয়ায় মনে দারুণ দুঃখ ছিল। এখন মুনির শাপে তাঁহার সন্তান জন্মিতেই হইবে, নতুবা পুত্রশোকে তাঁহার মৃত্যু হইবে কিরূপে? এই কথা ভাবিয়া মনের আনন্দে দশরথ অন্ধমুনিকে বলিলেন—"ঠাকুর! আপনার কথা সত্য হউক, পুত্রের মুখ দেখিলে পর আমার প্রাণ যাউক, তাহাতে কোন দুঃখ নাই—আপনার শাপ আমার বরের তুল্য হইয়াছে।"

অন্ধমুনি মহা বিস্মিত হইলেন এবং যোগবলে জানিতে পারিলেন যে, দশরথ সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি অপুত্রক এবং তাঁহার ঘরে নারায়ণ চারি অংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তখন দশরথকে বলিলেন—"যাও রাজা! তোমাকে আমি বর দিলাম, নারায়ণ তোমার ঘরে চারি অংশে জন্মিবেন। কিন্তু পুত্র জন্মিবার এগার বৎসর পরে তোমার মৃত্যু হইবে। মুনিবাক্য কখন মিথ্যা হয় না। এই দেখনা, আমার ও আমার স্ত্রীর চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল এক মুনির শাপে। ত্রিজট নামে ভারি তেজস্বী এক মুনি আছেন, তাঁহার দুটি পায়ে গোদ। একদিন তিনি ভিক্ষা করিতে আমাদের বাড়ী আসিলে, বাবা তাঁহাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। তারপর তিনি বিদায় হইবার সময় বাবা আমাকে বলিলেন—মুনি ঠাকুরকে প্রণাম কর। তাঁহার গোদা পা দেখিয়া আমার মনে ঘৃণা হইল—এ পায়ের ধূলা কেমন করিয়া লইব? কিন্তু পিতার কথা না শুনিলে নয়, সুতরাং, করিলাম কি—চক্ষু দুটি বুঁজিয়া মুনির পায়ের ধূলা লইলাম। ধূলা লইবার সময় অন্তর্যামী মুনি "এবমস্তু" (এইরূপ হইয়াই থাক) বলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার স্ত্রীও মুনিকে প্রণাম করিবার সময় চক্ষু বুঁজিয়া ছিল, সুতরাং মুনি ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকেও অন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই হইতে আমরা দুইজনে অন্ধ হইয়াছি।"

রাজা দশরথকে এই কথা বলিয়া অন্ধমুনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে পুত্রশোকে মারা গেলেন।

দশরথ তিন জনকে আগুনে পোড়াইয়া, মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। মুনিহত্যা করিয়া দশরথের দুঃখ কিছুতেই আর গেল না, তিনি মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ তখন তপস্যার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, আশ্রমে ছিলেন তাঁহার পুত্র বামদেব। রাজার দুঃখের কথা শুনিয়া বামদেব বলিলেন—"মহারাজ! তুমি তিনবার রামনাম উচ্চারণ কর, তবেই তোমার মুনিহত্যার পাপ দূর হইবে।" দশরথ রাম-নামের গুণে পাপমুক্ত হইয়া, অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার সময় বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, যখন পুত্রের মুখে সমস্ত কথা শুনিলেন, তখন রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল! বামদেবকে বলিলেন—"হতভাগা! আমার পুত্র হইয়া এত বড় অন্যায় কাজ করিয়াছিস্! রাম নাম মুখে একবার উচ্চারণ করিলে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়, আর সেই রামনাম তুই রাজা দশরথকে তিনবার বলাইয়াছিস্?—যা, তুই আশ্রম হইতে দূর হইয়া গিয়া চণ্ডাল হইয়া থাক্।"

এই দারুণ শাপ শুনিয়া বামদেব পিতার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন—"বাবা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি।" ততক্ষণে বশিষ্ঠের রাগ দূর হইয়াছে, তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন—"চণ্ডাল তোমাকে হইতেই হইবে, আমার কথা মিথ্যা হইবার নয়। তবে তোমার মুক্তির কথা বলিয়া দিতেছি—যে রামের নাম তুমি রাজাকে তিনবার বলাইয়াছ, সেই রাম দশরথের ঘরে জন্মিবেন। তিনি যখন গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন, তখন তুমি তাঁহার পথ আট্‌কাইয়া তাঁহার পায়ে ধরিও। তবেই তোমার চণ্ডালজন্ম দূর হইবে।"

সেই হইতে বামদেব পিতা বশিষ্ঠের শাপে গুহকচণ্ডাল হইয়া গঙ্গার ধারে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

গাছের শিক্ষা

মিশরদেশের রাজার প্রকাণ্ড বড় বাগান, রাজা সেই বাগানটি বড় ভালবাসেন। যে দিকে তাকাবে সেই দিকে থোপা থোপা লাল, নীল, হল্‌দে সাদা ফুল। আম, লিচু, কমলা লেবু, বাতাবি লেবুর অন্ত নেই। তার উপর যখন চারিদিকের বেড়ার উপর আঙ্গুরগুলো রসে টুস্ টুস্ কর্‌তে থাকে তখন বুঝতেই পার বাগান কি সুন্দর দেখায়। বাগানের মাঝখানে খাপছাড়া ভাবে একটা প্রকাণ্ড বড় অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু এত সৌন্দর্য্য হলে কি হয়, সমস্ত বাগানটি যেন দুঃখে মরে আছে। তার কারণ, কেউ নিজকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। অশ্বত্থ গাছ চায় ফলে ভরে উঠ্‌তে আর আঙ্গুর গাছ চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

এমন সময় একদিন বিকেলে রাজা বাগানে বেড়াতে এলেন। এসে দেখেন চারিদিকেই গোলমাল; যার দিকে তাকান তারই মুখ ভার।

রাজাকে দেখেই অশ্বত্থ গাছ অত্যন্ত দুঃখ করে বলে উঠ্‌ল, "এ পৃথিবীতে বেঁচে কি লাভ? হাজার হাজার বছর আমি এমনি দাঁড়িয়ে থাকি, আমার কখনও একটি ফুলও হয় না।"

এদিকে গোলাপ গাছ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল; "আমারই বা বেঁচে কি লাভ? ফুল নিয়ে কি কর্‌ব, একদিনও আমার একটি ফল হয় না, উপরন্তু এত কাঁটা যে কেউ হাত দিলেই আঁৎকে ওঠে।"

ওদিকে আঙ্গুর গাছ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্ল, "তোমরা তবুও বেশ আছ, নিজের পায়ে ত দাঁড়াতে পার, কিন্তু আমার অবস্থা কল্পনা কর ত? নিজে উঠে ইচ্ছামত দাঁড়াতেও পারি না; কেউ যদি ধরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেয় তবে দাঁড়াই আমি।"

এসব শুনে রাজার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল; তিনি যত বোঝাতে চেষ্টা করেন, কেউ বোঝে না। রাজা বেচারা উপায় নেই ভেবে, চারিদিকে পায়চারী কর্‌তে লাগ্‌লেন। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে হঠাৎ দেখেন পাতার আড়াল থেকে একটি সুন্দর ফুট্‌ফুটে হাসিভরা মুখ উঁকি মার্‌ছে। রাজা দেখেই চিন্‌তে পার্‌লেন সেটি একটি কুন্দ ফুল। একজনের মুখে হাসি দেখে তাঁর মন একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল।

তিনি হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "সকলেই দুঃখ কর্‌ছে, সকলেই নিজেকে নিয়ে অসন্তুষ্ট কিন্তু তুমি এত সুখী কেন?"

কুন্দ ফুল বল্ল, "আপনি এত যত্ন করে, এত ভালবেসে আমাকে এখানে স্থান দিয়েছেন, আমি যদি সর্ব্বদা সুখী থাকি তা'হলে আপনিও সুখী হবেন, তাই আমি রাত দিনই হাসি।" রাজা মনে মনে ভাব্‌লেন, "আশ্চর্য্য! এইটুকু ফুলের কত সুন্দর বুদ্ধি আর বিবেচনা! সকলে যদি এর মত বুঝ্‌তে পার্‌ত, তবে আমি কত সুখী হ'তাম।"

এই ভেবে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ফুলটিকে তুলে, বুকে গুঁজে নিয়ে রাজবাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। তখন আর সকলের বড়ই লজ্জা হ'ল, তারা ভাব্‌ল, "হায় রে, এতটুকু সামান্য কুন্দফুল, তার কিনা এত যত্ন আর এত আদর! আমরাও যদি খুঁৎখুঁৎ না ক'রে নিজের নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক্‌তে পার্‌তাম আর হাসিমুখে রাজার সঙ্গে কথা কইতাম, তাহ'লে রাজা আমাদেরও আজ কত আদর যত্ন আর খাতির কর্‌তেন।" সেই থেকে তাদের স্বভাব এমন শুধ্‌রে গেল যে, তারা আর কখনও নিজেদের অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাক্‌ত না।

শ্রীমাধুরীলতা চৌধুরী।

গোপালের পড়া

দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই গোপাল অত্যন্ত ভালমানুষের মতন মুখ করিয়া দু-একখানা পড়ার বই হাতে লইয়া তিন তলায় চলিল। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে গোপ্‌লা, এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস্?" গোপাল বলিল, "তিন তলায় পড়্‌তে যাচ্ছি।"

মামা—"পড়্‌বি ত তিন তলায় কেন? এখানে বসে পড়্ না।"

গোপাল—"এখানে লোকজন যাওয়া আসা করে, ভোলা গোলমাল করে, পড়্‌বার সুবিধা হয় না।"

মামা—"আচ্ছা, যা মন দিয়ে পড়্‌গে।"

গোপাল চলিয়া গেল, মামাও মনে মনে একটু খুসী হইয়া বলিলেন, "যাক্ ছেলেটার পড়াশুনায় মন আছে।"

এমন সময় ভোলাবাবুর প্রবেশ—

বয়স তিন কি চার; সকলের খুব আদুরে। সে আসিয়াই বলিল, "দাদা কই গেল?" মামা বলিলেন, "দাদা এখন তিন তলায় পড়াশুনা কর্‌ছে, তুমি এইখানে বসে খেলা কর।"

ভোলা তৎক্ষণাৎ মেজের উপর বসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, "দাদা কেন পড়াশুনা কর্‌ছে? পড়াশুনা কর্‌লে কি হয়? কি করে পড়াশুনা করে?" ইত্যাদি। মামার তখন কাগজ পড়িবার ইচ্ছা, তিনি প্রশ্নের চোটে অস্থির হইয়া শেষটায় বলিলেন, "আচ্ছা ভোলাবাবু, তুমি এখন ভোজিয়ার সঙ্গে খেলা কর গিয়ে, বিকেলে তোমায় লজঞ্চুস এনে দেব।" ভোলা চলিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে ভোলারামের পুনঃ প্রবেশ। সে আসিয়াই বলিল, "মামা, আমিও পড়াশুনা কর্‌ব।" মামা বলিলেন, "বেশ ত, আর একটু বড় হও, তোমায় রংচঙে পড়ার বই কিনে এনে দেব।"

ভোলা—"না, সে রকম পড়াশুনা নয়, দাদা যে রকম পড়াশুনা করে সেই রকম।"

মামা—"সে আবার কি রে?"

ভোলা—"হ্যাঁ, সেই যে পাত্‌লা পাত্‌লা রঙীন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে, আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়, সেই রকম।"

দাদার পড়াশুনার বর্ণনা শুনিয়া মামার চক্ষুস্থির হইয়া গেল! তিনি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তিন তলায় উঠিলেন, চুপি চুপি ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাঁর ধনুর্দ্ধর ভাগ্নেটি জানালার সাম্‌নে বসিয়া একমনে ঘুড়ি বানাইতেছে। বইখানা ঠিক দরজার কাছে তক্তপোষের উপরে পড়িয়া আছে। মামা অতি সাবধানে বই দুখানা দখল করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

খানিক পরেই গোপালচন্দ্রের ডাক পড়িল। গোপাল আসিতেই মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ছুটীর আর ক'দিন বাকি আছে?"

গোপাল বলিল, "আঠার দিন।"

মামা—"বেশ পড়াশুনা করেছিস্ ত? না কেবল ফাঁকি দিচ্ছিস্?"

গোপাল বলিল, "না, এইত এতক্ষণ পড়্‌ছিলাম।"

মামা—"কি বই পড়্‌ছিলি?"

গোপাল—"সংস্কৃত।"

মামা—"সংস্কৃত পড়্‌তে বুঝি আজকাল বই লাগে না? আর অনেকগুলো পাত্‌লা কাগজ, আঠা আর কাঠি নিয়ে নানা রকম কারিকুরি করার দরকার হয়?"

গোপালের ত চক্ষু স্থির! মামা বলে কি? সে একেবারে হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া মামার দিকে তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন, "বই কোথায়?"

গোপাল বলিল, "তিন তলায়।"

মামা বই বাহির করিয়া বলিলেন, "এগুলো কি?" তারপর তাহার কাণে ধরিয়া ঘরের এক কোণে বসাইয়া দিলেন।

গোপালের ঘুড়ি লাটাই সুতা ইত্যাদি সরঞ্জাম আঠার দিনের জন্য মামার জিম্মায় আলমারীতে বন্ধ রহিল।

আবর্জ্জনায় ফলে সোণা

নানা অভাবে প'ড়ে মানুষ আজকাল আবর্জ্জনা আর ফেলে-দেওয়া জিনিষ থেকে এত রকম কাজের জিনিষ তৈয়ারী কর্‌তে শিখেছে, যে, শুন্‌লে আশ্চর্য্য মনে হবে। কি ক'রে আবর্জ্জনাকে কাজে লাগান যায়, তাই নিয়েই কত শত পণ্ডিত লোক নানা রকম পরীক্ষা কর্‌ছেন। রাস্তার আস্তাকুড় পর্য্যন্ত ঘেঁটে দেখা হচ্ছে, তার থেকে কোন কাজের জিনিষ পাওয়া যায় কিনা।

জার্ম্মেনীর এক বই-ওয়ালার তালিকায় প্রায় ১০০ বইএর নাম আছে, যা'তে কেবল রাস্তার আস্তাকুড়ের জিনিষকে কাজে লাগাবার উপায় সম্বন্ধে লেখা হয়েছে!

ভাঙা কাঁচের, লোহার, টিনের, পিতলের, তামার, হাড়ের, শিঙের, কাঠের, পাথরের, চীনে মাটির জিনিষ, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ, রেশম, পশম আর চামড়ার জিনিষ, পচা, কাটা, ফাটা, ছেঁড়া, গুঁড়ো, ভাঙা ফেলে দেওয়া জিনিষ থেকে নানারকম দামী আর কাজের জিনিষ তৈয়ারী ক'রে, মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন কর্‌ছে।

ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় থেকে, পৃথিবীর চারিদিকে আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার কর্‌বার একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে;—তার ফলে, যে জিনিষ কিছুদিন আগেও অপদার্থ ব'লে ফেলে দেওয়া হতো আজকাল তার দাম অনেক। ড্রেনের আবর্জ্জনা, কারখানার ময়লা, রাস্তার আস্তাকুড়ের জিনিষ, সবই এখন কাজে লেগে যাচ্ছে।



পুরানো ঘোড়ার নাল থেকে বন্দুকের নাল। | বাদামের বীচি থেকে রান্নার তেল। | পুরানো ট্রাম ও রেলের টিকিট থেকে নূতন বোর্ড। | ছেঁড়া ন্যাকড়া থেকে ভাল কাগজ।



পুরানো হাড় থেকে জমির সার। | পচা আলু থেকে শ্বেতসার ও সেলুলয়েড। | পুরানো টিন থেকে নূতন টিন ও ঝালাই মশলা। | ভাঙা কাচ থেকে শিরিষ কাগজ ও শাণের চাকা।

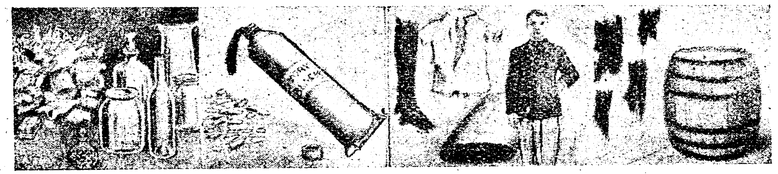

ভাঙা শিশি বোতল থেকে নূতন শিশি বোতল। | হাতীর দাঁতের টুকরা থেকে কালো রং। | ছেঁড়া পশমী কাপড় থেকে নূতন পশমী কাপড়। | ছেঁড়া তেলা ন্যাকড়া থেকে তেল।



ড্রেনের গ্যাস্ থেকে বাতি জ্বালবার গ্যাস্। | করাতের গুঁড়ো থেকে বাতি জ্বালবার গ্যাস্। | সাবানের ফেনা থেকে তেল। | শিং আর চামড়ার টুকরা থেকে শিরিষ।

কয়েকটি ছবি দিলাম, তার থেকেই কিছু কিছু বুঝবে যে, কত বাজে জিনিষ আমাদের ব্যবহারে আসে। এ ছাড়াও আরো কত জিনিষ আছে যা' আবর্জ্জনা ব'লেও মানুষের কাজে লাগে। ছবিতে যা' দেওয়া হয়েছে তা' ছাড়াও কোন কোন জিনিষের অন্য ব্যবহারও আছে। যেমন করাতের গুঁড়ো;—তা থেকে চিনি আর সুরাসারও (Alcohol) তৈয়ারী হয়।

শ্রীসুবিনয় রায়

সময়ের মাপ কাঠি

মানুষ যখন পৃথিবীতে নূতন এসেছিল, তারা সূর্য্য দেখে, সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত্রি ব'লে তাদের বেলা ঠিক করত। রাত্রে চাঁদ, তারা দেখে কিছু কিছু সময়ের আন্দাজ মানুষ পেত। তখন তাদের জীবনযাত্রা সাদাসিধা ছিল, তাই সময়ের এই মোটা হিসাবে কাজ চলে যেত।

কিন্তু মানুষের কাজ যত বেড়ে চল্‌ল, নানা দিকে নানা রকম হিসাব রাখ্‌বার

বাতি-ঘড়ি | বালি-ঘড়ি | গেরোদেওয়া দড়ি ঘড়ি

তার দরকার হ'ল, তখন সে সময়ের আরও সুক্ষ্ম হিসাব কর্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

প্রথমে তৈরী হ'ল "সূর্য্য-ঘড়ি"। খোলা যায়গায়, একটা খোঁটা পোঁতা তার চার্‌দিকে মাটিতে গোলমত দাগ কাটা, সেই গোল দাগ আবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা। রোদের সময়ে খোঁটার ছায়া কখন কোন্ দাগে থাকে, তাই দেখে সময়ের হিসাব হ'ত। কিন্তু রাত্রে বা মেঘ্‌লা দিনে এ ঘড়ি কোনই কাজে আস্‌ত না। সময় রাখ্‌বার আর এক উপায় হ'চ্ছে জল-ঘড়ি। একটা পাত্রে জল ভরা থাক্‌ত, সেই পাত্রের নীচে ছোট্ট একটি ফুটা। সেই ফুটা দিয়ে পাত্রের জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে নীচে আর একটা পাত্রে পড়্‌ত। উপরের পাত্রের বা নীচের পাত্রের গায়ে দাগ কাটা থাক্‌ত। কয় দাগ জল খালি হ'ল বা কয় দাগ ভরল, তাই দেখে সময় ঠিক করা হ'ত। বালির ঘড়িও ছিল। ছবিতে

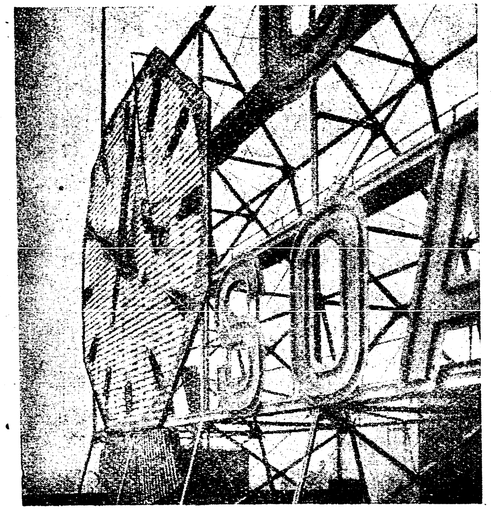

সব চেয়ে বড় ঘড়ি
ঘড়ির সাম্‌নে একটি লোক ঝুল্‌ছে; তার সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখ।

দেখ, একটা ডমরুর মত কাচের পাত্র, তার মাঝখানটা খুব সরু। সরু যায়গাটার ছিদ্র খুব ছোট। উপরের খোপে এতটা আন্দাজ বালি দেওয়া হয় যে, সমস্তটা বালি ফুটো দিয়ে নীচে পড়ে যেতে, একটা নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা সময় লাগে।

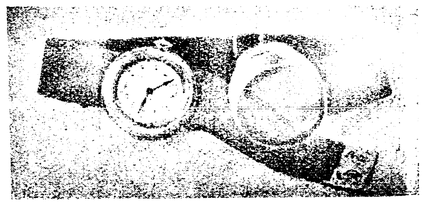

সব চেয়ে ছোট ঘড়ি
পাশের আংটিটার সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখ

আরও নানা উপায়ে সময় দেখা হ'ত। একটা মোমবাতি, তার গায়ে কাল সাদা

ডোরা কাটা। মোমবাতি জ্বাল্‌লে, প্রত্যেক সাদা বা কাল ভাগ পুড়ে যেতে যে নির্দ্দিষ্ট সময় লাগে, তা থেকেই সময়ের হিসাব পাওয়া যায়। গেরো দেওয়া দড়িটাও এক গেরো থেকে আরেক গেরো পর্য্যন্ত পুড়ে যেতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় লাগে। কোন সূক্ষ্ম হিসাব এ সব ঘড়িতে হয় না, বেলার হিসাব ত হয়ই না।

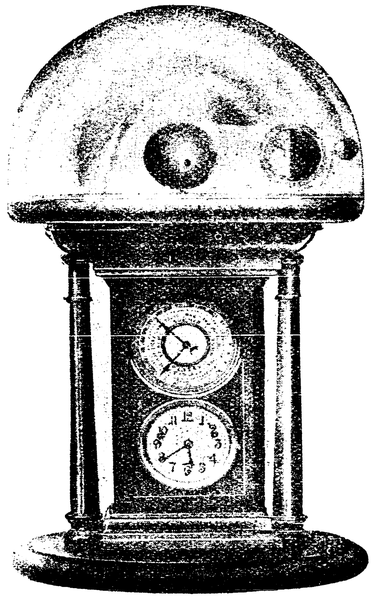

আশ্চর্য্য ঘড়ি
সময় দেখা ছাড়া এই ঘড়িতে তিথি নক্ষত্রের হিসাব পাওয়া যায়

ঠিক কোন্ সময়ে কি ক'রে ঘড়ি তৈরী হ'ল তা বলা যায় না।

এখন ঘড়ির কল কব্জা সব কলে তৈরী হয়, তাই বেশ সস্তায় ভাল ঘড়ি আমরা পাই। কিন্তু আগে যখন সমস্তই হাতে তৈরী কর্‌তে হ'ত, তখন খুব বড়লোক ছাড়া কেউ ঘড়ি ব্যবহার কর্‌তে পার্‌ত না। সে ঘড়িও আবার এমন ধ্যাব্‌ড়া ছিল যে, পকেটে ঢোকাই মুস্কিল। একটা ঘড়ির ভিতরের কাণ্ড কারখানা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। প্রায় পাঁচ ছয়শ ছোট বড় দাঁত কাটা চাকা, স্ক্রু, স্প্রিং, আরও কত কি। কোন কোন ঘড়ির কল-কব্জা এত ছোট যে, তার এক একটা চুম্বক দিয়ে আট্‌কে তুলে; চোখে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস্ (আতস কাচ) লাগিয়ে তবে বসাতে হয়।

আজকাল ইলেক্‌ট্রিসিটিকে ঘড়ির কাজে লাগান হয়েছে। একটা ঘড়ি থাকে সেটা ঠিক নির্ভুল মত চলে; সেই ঘড়িতে দম দেওয়া হয়, আর অমনি তার সঙ্গে, ইলেক্‌ট্রিক্ যোগ আছে এমনি আর হয়ত একশটা ঘড়ি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক চলে। এই কাণ্ড কারখানার পিছনে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি। ঘড়ি যে চলে, সেই ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তারপর সে যে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড ঠিক রেখে চলে, তা আরও অদ্ভুত। সূর্য্যের চার্‌দিকে একবার ঘুরে আস্‌তে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন লাগে। তার মানে, পৃথিবীর একবার ঘুরে আস্‌তে যতটা সময় লাগে তাকে ৩৬৫ ভাগে ভাগ

ক'রে তাকে ২৪ ভাগ ক'রে, তাকে ৬০ ভাগ করে তবে আমরা একটি মিনিট পাই। কত হিসাব ক'রে লোকে ঘড়ির একটি মিনিট তৈরী করেছে ভেবে দেখ। আমরা ঘড়িতে দেখ্‌লাম টিক্ টিক্ ক'রে একটি মিনিট বেজে গেল; কখনও কি ভেবে দেখি যে এই এক মিনিটে, পৃথিবী শূন্যের ভিতর দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এক হাজার মাইল পার হ'য়ে গেল?

শ্রীসুখলতা রাও

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) খোঁপা (২) বুড়ো আঙ্গুল (৩) 'কা'

(৪) চোরাই মাল শিবপুর পাঠাইবে, দেরী হইলে সমূহ বিপদ। খুব সাবধানে চলিবে।

নূতন ধাঁধা

গতবারে যেমন গুপ্ত চিঠি দেওয়া হইয়াছিল, এবারেও তেমনি আর একটি গুপ্ত চিঠি দেওয়া হইল। এই চিঠি পড়িবার সঙ্কেত অবশ্য গতবারের মতন নয়, কিন্তু খুব সহজ। ব্যাপারটা এই—একটি ছেলে তাহার এক বন্ধুকে কোনও একটা সংবাদ দিয়া পত্র লিখিতেছে; কিন্তু সংবাদটি বাড়ীর লোকে জানিতে পারিলে হয়ত বাধা দিতে পারে, তাই এইরূপ সাঙ্কেতিক চিঠি লেখা হইয়াছে:—

যদি কলিকাতায় যাও, ভাল দিন দেখিয়া যাত্রা করিও। লোকমুখে শুনিতে পাই, তোমার ইচ্ছা বিশু কলিকাতায় থাকে, এবং পড়ে।

আজ শুনিলাম, গত রাত্রে নাকি হরিশ গোসাঁইদের নূতন দালান বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। নিশ্চয় জানিবার জন্য উপস্থিত হইবামাত্র, গোসাঁইজি "হইবে সর্ব্বনাশ" বলিয়া গান করিলেন; তারপর খুব খানিক কাঁদিয়া, "ভাল মন্দ যাহা হইবার হইবেই" এই কথা বলিয়া সকলকে স্বয়ং সান্ত্বনা দিলেন। "গোবিন্দ চরণে আজি দাস বিকাইল" এই গানের সঙ্গে এক দল লোক মৃদঙ্গ লইয়া কীর্ত্তন ধরিল। উপস্থিত লোকদের মুখে শুনিলাম, গোসাঁইজির নাকি খুব লোকসান হইয়াছে। ভিড় কমিতে দেরী হইবে মনে হইল—সুতরাং একটু দেখিয়াই শীঘ্র চলিয়া আসিলাম। আসিতে আসিতে ভাবিলাম, পারিলে দুপুরে গিয়া ভাল করিয়া দেখিব।

যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন, আগামীবারে তাঁহাদের নাম প্রকাশ হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

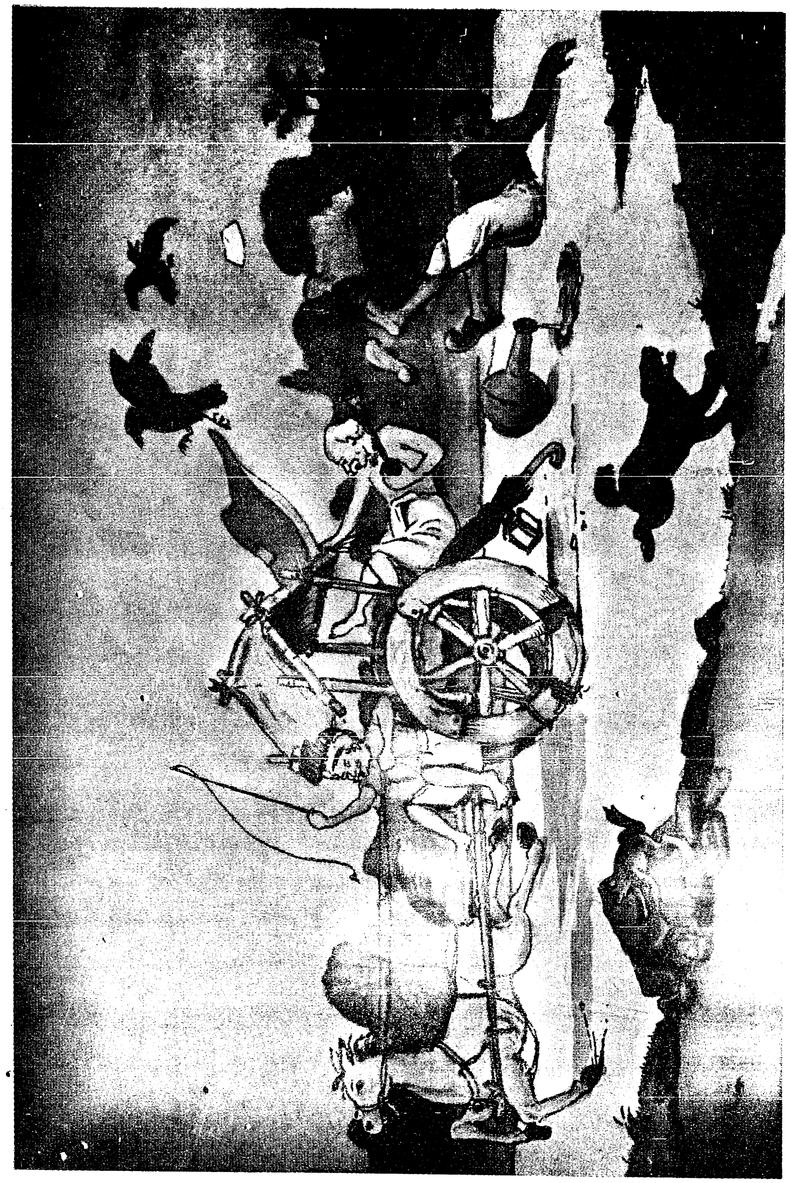

"একাগাড়ী খুব ছুটেছে"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সচিত্র

একাদশ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩০ | ৪র্থ সংখ্যা

চাঁদের বাতি

(ইংরাজি হইতে গৃহীত)

দখিন হাওয়া বাঁধন হারা
বইছে আপন মনে,
মাঠের পরে নদীর ধারে
গহন বিজন বনে।
কেউ রাখেনা খবর তাহার
কেউ করেনা মানা,
কোথায় যে যায় কিসের পিছু
নেই কো কারো জানা।
একটি কেবল প্রহরী তার
দেখ্‌ছে খেলা যত,
রাত জেগে ঐ নীল আকাশে
একটি চোখের মত।
ছড়িয়ে আলো দিক্‌ বিদিকে
পূর্ণিমা-চাঁদ জ্বলে;

COLOURED DOCUMENT.

দখিন হাওয়া বেজায় রেগে
ধম্‌কে তারে বলে,
"যাইনা আমি যেথায় খুসী
তুই কেন র'স চেয়ে?
পাহারা দিস আমায়, বলি
কাহার হুকুম পেয়ে?
শুনিস না যে, ক'স না কথা?
দেমাক দেখি ভারি;
জানিস নাকি এক ফুঁএতে
নিভিয়ে দিতে পারি?"
সোঁ সোঁ সোঁ চাঁদের পানে
বাতাস ছোটে বেগে,
ঝড় উঠিয়ে নেয় ছুটিয়ে
রাজ্যি জোড়া মেঘে।
ঢাক্‌ল সে মেঘ জ্যোৎস্না আলো
আঁধার হ'ল রাতি।
বাতাস ভাবে "কেমন মজা,
নিভ্‌ল চাঁদের বাতি।"
যেই সে নামে মাটির পরে
বুক ফুলিয়ে জাঁকে,
পূর্ণিমা-চাঁদ হাস্‌ছে দেখে
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

শ্রীসুখলতা রাও।

সিংলীর ভাগ্য

(চীনদেশী উপকথা)

সিংলীর মত ভাল ছেলে তাদের গ্রামে আর কেউ ছিল না। যেমন তার মিষ্টি নরম স্বভাব, তেমনি তার মুখে হাসিটি যেন সব সময়ই লেগে রয়েছে। গ্রামের সকলে সিংলীকে খুব ভালবাস্‌ত। সিংলী যখন ছোট ছিল তখনই তার বাবা মারা গেলেন। সংসারে সিংলীর রইল শুধু বিধবা মা। মাকে সে খুবই ভালবাস্‌ত, ভক্তি কর্‌ত। বাবার মৃত্যুর পর থেকে সিংলী মায়ের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিল। এমন ছেলেকে তার মাও কতখানি ভালবাস্‌তেন তা বুঝ্‌তেই পার। তার উপর তিনি যখন দেখ্‌তেন, সকলের মুখে তাঁর ছেলের প্রশংসা আর ধরেনা, তখন তাঁর আহ্লাদের আর সীমাই থাক্‌ত না।

যেদিন সিংলীর আঠার বৎসর পূর্ণ হলো, সেদিন মা তাকে ডেকে বল্‌লেন—"বাবা সিংলী! তোমার সেবা-যত্নে, মিষ্ট ব্যবহারে আমি বড় খুসী হয়েছি। আজ তোমার জন্মদিনে তোমাকেও খুসী কর্‌ব ভেবেছি। তুমি জান, যে, চিন দেশে মা বাবাই ছেলের বিয়ে ঠিক করেন, ছেলের সঙ্গে তার পরামর্শ করেন না। কিন্তু বাবা! তোমাকে আজ একটি বিশেষ পুরস্কার দিব—কোন মেয়েকে যদি তোমার পছন্দ হয়, তবে বল, তার সঙ্গেই আমি তোমার বিয়ে দিব। এক বৎসর পর, তোমার ঠিক উনিশ বৎসর পূর্ণ হলে, তোমাদের বিয়ে হবে।"

মায়ের কথা শুনে সিংলীর আনন্দের সীমাই রইল না। সে মনে মনে তাদের এক প্রতিবেশীর মেয়েকে ভালবাস্‌ত। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই লক্ষ্মী। আজ ভরসা পেয়ে মায়ের কাছে তার মনের কথা খুলে বল্‌ল। শুনে তার মা খুবই খুসী হলেন, তিনিও সেই মেয়েটিকে খুব পছন্দ কর্‌তেন। যথাসময়ে বিয়ের সব কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেল। সিংলীর উনশ বছর পূর্ণ হলেই বিয়ে হবে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এগার মাস কেটে গেল। একদিন সিংলী কোন কাজে অন্য গ্রামে গিয়েছিল। কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরে আস্‌বে, এমন সময় সে দেখ্‌ল—এক বুড়ো গণৎকার, তার চারদিকে মেলাই লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, আর নানারকম ফরমাস্ কর্‌ছে। হঠাৎ মুখ তুলে সিংলীকে দেখেই, গণৎকার ইসারা করে তাকে ডাক্‌ল।

সিংলী কাছে গেলে পর, তার মুখের দিকে চেয়েই গণৎকার ভারি গম্ভীর হয়ে গেল! আর মনে হলো যেন, সিংলীকে দেখে তার মনে বড় দুঃখ হয়েছে। গণৎকার কোন কথা বল্‌ল না, মুখ ভার করে শুধু দাড়িতে হাত বুলাতে লাগ্‌ল। তা দেখে সিংলী বল্‌ল—"মহাশয়! চুপ করে রইলেন যে? কি দেখ্‌লেন বলুন, আমি একটুও ভয় পাবনা।"

গণৎকার বল্‌লেন—"বাবা! তোমাকে এই দুঃসংবাদটি জানাতে আমার মন মান্‌ছে না—তোমার মুখে মৃত্যুর চিহ্ন দেখ্‌ছি!" সিংলী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"এই কথা! তা মৃত্যুত আপনার, আমার সকলেরই একদিন হবে?"

বৃদ্ধ আরো গম্ভীর হলেন, আর এক টুক্‌রো হল্‌দে কাগজ সিংলীর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"বাবা! এটা হাসি ঠাট্টার বিষয় নয়! এই কাগজে যে সংখ্যাটি লেখা আছে, সেটি পূর্ণ হবামাত্র যমরাজা তোমার আত্মাটি নিয়ে যাবেন, আর তখনি তোমার মৃত্যু হবে!"

সিংলী কম্পিত হস্তে গণৎকারের হাত থেকে কাগজখানি নিয়ে পড়্‌ল। হায়! তার চক্ষু যেন কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। কাগজে উনিশের সংখ্যা লেখা! তার উনিশ বৎসর পূর্ণ হলেই মৃত্যু!! সিংলী দুঃখে আর্ত্তনাদ করে বলে উঠ্‌ল—"মহাশয়, এটা যে আমার বিয়ের দিন! আপনার গণনায় ভুল হয়নি ত?" গণৎকার বল্‌লেন—"বিন্দুমাত্রও না। বিধাতাপুরুষ তোমার ভাগ্যে যা লিখেছেন, কারও শক্তি নাই যে তার অন্যথা করে।" এই বলে বৃদ্ধ গণৎকার চলে গেলেন।

সিংলী বাড়ী ফিরে গেলে পর, তার মুখ দেখেই তার মা বুঝ্‌তে পার্‌লেন, যে, একটা কিছু দুর্ঘটনা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই সিংলী কিছু বল্‌তে চাইল না, শুধু মাথা নীচু করে বসে রইল। অনেক সাধ্যসাধনার পর সিংলী যখন মাকে সব কথা খুলে বল্‌ল, তখন তাঁর মনে কি যে দারুণ যাতনা হলো তা বুঝাবার সাধ্য নাই। দুই দিন যাবৎ তিনি অন্ন জল গ্রহণ কর্‌লেন না, বিছানায় পড়ে মনের দুঃখে খালি ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিংলীর মৃত্যুর কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়্‌ল। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলে এসে উপস্থিত, সকলেই এই দুর্ঘটনার কথা শুনে খুব দুঃখ কর্‌ল। তার মধ্যে এক থুড়থুড়ে বুড়ী ছিল, সে যাবার সময় সিংলীর মাকে বলে গেল—"তা হবে না বাছা,—এ-ত তোমারই দোষ? দেশের আইন কানুন অমান্য করে

কি-না ছেলেকে বল্‌লে তার বৌ পছন্দ করে নিতে—এতটা অবিচার দেবতা সইবেন কেন?"

বুড়ীর কথা অবশ্যি সিংলীর মা ততটা গ্রাহ্য করলেন না, কিন্তু তবু ভাব্‌লেন—"সত্যি সত্যি যদি আমার দোষে ছেলের এই বিপদ হয়ে থাকে, তবে ত এর প্রতিকারের চেষ্টা দেখা উচিত।" এই ভেবে ছেলেকে ডেকে বল্‌লেন—"এখনই সেই গ্রামে গিয়ে গণৎকারকে খুঁজে বা'র কর, আর তাঁকে জিজ্ঞাসা কর—তোমার এই বিপদ দূর হবার কোন উপায় আছে কি না।"

সিংলী গণৎকারকে খুঁজে বা'র করে সব কথা বল্‌ল। শুনে তিনি বল্‌লেন—"বাছা, তোমার বিপদ দূর হবার একটিমাত্র উপায় আছে। কাল খুব ভোরে উঠে, ঐ যে দূরে পাহাড় দেখ্‌তে পাচ্ছ, তার উপরে উঠ্‌বে। সঙ্গে করে খুব ভাল রান্না করা খানিকটা হরিণের মাংস আর খুব ঠাণ্ডা সরবৎ নিয়ে যাবে। পাহাড়ের উপরে উঠে দেখ্‌তে পাবে—দুজন বৃদ্ধ বসে দাবা বড়ে খেল্‌ছেন। আস্তে আস্তে খাবারের পাত্র তাঁদের কাছে রেখে, চুপ করে বসে থেকো। কিন্তু সাবধান! তাঁদের খেলায় কোন রকম বাধা দিও না। খেলা শেষ হয়ে গেলে, ধীরে ধীরে তোমার বক্তব্য তাঁদের কাছে বলো। তা শুনে তাঁরা যদি কিছু করেন, ভালই। নতুবা তোমার আর কোন উপায় নাই!"

পরদিন খুব ভোরে সিংলী, গণৎকারের উপদেশমত মাংস আর সরবৎ নিয়ে, সেই পাহাড়ের দিকে রোয়ানা হল। সেটা ছিল তার উনিশ বছর পূর্ণ হবার ঠিক আগের দিন। সেই সর্ব্বনেশে পাহাড়ের ডগায় উঠা কি সহজ কথা! সিংলীর গা ঘেমে গেল, পায়ে খিল ধরে গেল। তার মনে হলো, বুঝিবা ডগায় আর পৌঁছাতেই পার্‌ল না। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা পাথর পার হয়েই দেখ্‌ল, যে, পাহাড়ের ডগায় এসে পড়েছে। আর দেখ্‌ল, ঠিক গণৎকারের কথামত, ডগার সমান জমিটাতে বসে খুব বৃদ্ধ দুইজন লোক দাবা বড়ে খেল্‌ছেন।

আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে গিয়ে, সিংলী, মাংস আর সরবতের পাত্র বৃদ্ধ দুইটির পাশে রেখে, চুপ করে বসে খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দুটি বৃদ্ধেরই ধপ্‌ধপে শাদা চুল দাড়ি। একজনের মুখখানি ভারি মিষ্টি, হাসিখুসী। কিন্তু অন্যজনের মুখে ভ্রূকুটি লেগেই রয়েছে। দেখ্‌লেই মনে হয়, লোকটি নিতান্তই বদ্‌রাগী। ছেলেবেলা থেকেই সিংলী দাবা বড়ের ভারি ভক্ত, খেলাটা জান্‌তও সে চমৎকার।

সে যেন তন্ময় হয়ে খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বৃদ্ধদুটিও খেলায় এম্‌নি মেতে গিয়েছিলেন, যে, সিংলীর দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লেন না।

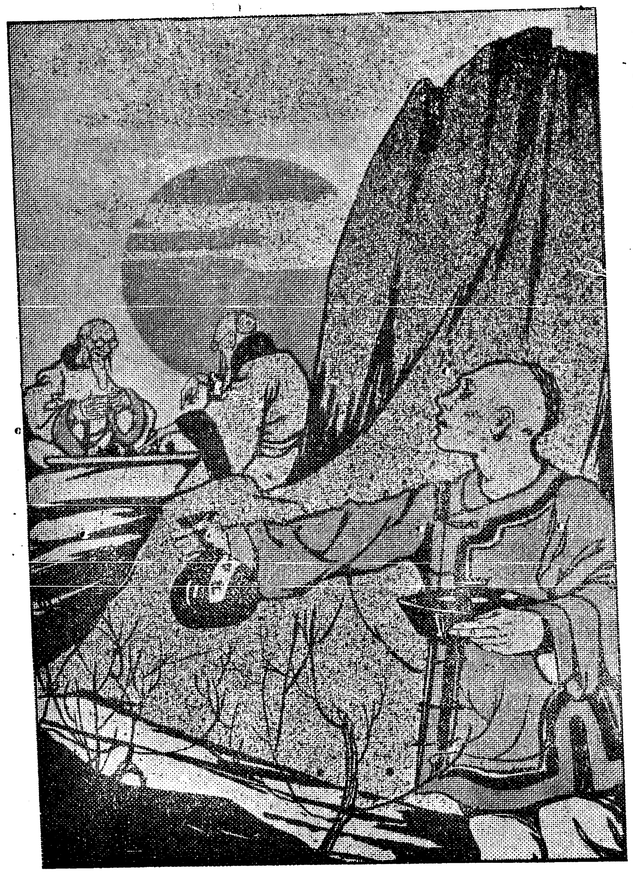

খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সিংলী প্রত্যেকটি চাল খুব মন দিয়ে দেখ্‌ছে। এমন সময় বদ্‌রাগী বৃদ্ধটি তাঁর মন্ত্রীটাকে একঘর চেলেই, হাস্‌তে হাস্‌তে সঙ্গীটিকে বল্‌লেন—"আর তিন চালেই আপনি মাৎ।"

ভালমানুষ বৃদ্ধটি তখন হেসে বল্‌লেন—"হাঁ ঠিকই বলেছেন, মাৎ যে হব সেটা আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি।" এমন সময় সিংলী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"না, না! আপনি কিছুতেই মাৎ হবেন না। আপনার ঐ বড়েটা ঠেলে দিন্, তাহলেই মাৎ বন্ধ—খেলা সমান সমান যাবে।"

দুটি খেলোয়াড়ই অবাক্ হয়ে প্রথম চাইলেন সিংলীর দিকে, তার পর চাইলেন দাবার ঘরের দিকে। ভালমানুষ বৃদ্ধটি বল্‌লেন—"তাইত হে ছোক্‌রা! তুমি ত

দেখ্‌ছি সত্যি কথাই বলেছ। কিন্তু বড়ের চাল্‌টা আমাকে ব'লে দিয়ে ত ভাল করনি?"

বদ্‌রাগী বৃদ্ধটি বল্‌লেন—"তাতে আর কি, বরং ব'লে সে ভালই করেছে। আপনাকে খালি হারিয়ে হারিয়ে আমার বিরক্ত ধরে গিয়েছিল।—আরে, এ কি? মাংস আর সরবৎ? বাঃ, বেশ, বেশ! ঠিক সময়টিতেই এনে হাজির করেছ বাবা! আমার ক্ষিধেও পেয়েছিল খুব। আচ্ছা, এযাত্রা তাহলে তোমাকে ক্ষমা কর্‌লাম। কিন্তু ভবিষ্যতে পরের বিষয় নিয়ে আর কখন ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌তে যেও না।" এই বলে, বদ্‌রাগী বৃদ্ধ বড় বড় গ্রাসে মাংস সব শেষ কর্‌তে লাগ্‌লেন। মাঝে মাঝে সরবৎটাও এক এক টান চল্‌তে লাগ্‌ল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুই বৃদ্ধ সিংলীর দিকে চাইলেন। তাঁরা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, যে, সিংলীর কিছু বল্‌বার আছে। সিংলীও তখন ভরসা পেয়ে তার সব কথা তাঁদের কাছে বল্‌ল। কি করে গণৎকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর গণৎকার যে বলেছে, কালই তার মৃত্যু হবে, অথচ সেই দিনই একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা—এ সব কোন কথাই সে বল্‌তে বাকি রাখ্‌ল না।

তখন একজন বৃদ্ধ প্রকাণ্ড একটা খাতা বা'র করে বল্‌লেন—"তোমার নাম কি বাছা?" সিংলী তার নিজের নাম এবং গ্রামের নাম বল্‌ল। তখন দুটি বৃদ্ধই এক সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন—"ঠিক, ঠিক। গণৎকার সত্যি কথাই বলেছে—এই খাতায় কালই তোমার মৃত্যু লেখা আছে। তোমার উনিশ বছরের জন্মদিন মৃত্যুতেই শেষ হবে। কিন্তু গণৎকার তোমাকে এসব কথা বলে ভাল করেনি। বিধাতাপুরুষ কার ভাগ্যে কি লিখেছেন, সেটা মানুষকে বলা উচিত নয়। আচ্ছা, গণৎকার যে তোমাকে কাগজখানা দিয়েছে, সেটা দেখাও ত?" সিংলী কাগজ খানি বা'র করে দিল।

তখন, সিংলী যাঁকে "বড়ের চাল" বলে দিয়েছিল, সেই ভালমানুষ বৃদ্ধটি বল্‌লেন—"ওহে ছোক্‌রা! তোমার সাহস দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। তোমার মনটি খুব ভাল, আর তুমি ভারি সরল। তুমি আজ যা করেছ, অন্য কেউ তা কর্‌তে সাহস পাবে না। জান আমরা কে? আমি হচ্ছি বিধাতাপুরুষ আর উনি হচ্ছেন যমরাজা। যাহোক্, আজ যে তুমি আমার মাৎ বাঁচিয়ে দিয়েছ, তার পুরস্কার-স্বরূপ, আমি তোমাকে তোমার অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে রাজি আছি।"

তখন যমরাজাও খুব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"যদিও তোমার জন্যই আমি আজ বিধাতাপুরুষকে মাৎ কর্‌তে পারলাম না, তবু, ক্ষিধের সময় চমৎকার খাদ্য দিয়ে যে তুমি আমাকে খুসী করেছ, তার দরুণ, আমিও তোমাকে সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

সিংলী আহ্লাদে আটখানা হয়ে, দুটি দেবতার সাম্‌নে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়্‌ল। তখন বিধাতাপুরুষ সিংলীর সেই কাগজখানা মাটিতে ছড়িয়ে, তাকে বল্‌লেন—"কাগজে উনিশ লেখা আছে ত?—অর্থাৎ উনিশ বৎসর বয়সে তোমার মৃত্যু হবে। এই দেখ, উনিশের "এক" কেটে ৯ বসিয়ে দিলাম। এখন যাও, গিয়ে ৯৯ বৎসর সুখে বাস কর। আর মনে রেখো, বয়সে যাঁরা বড়, গুরুজন, তাঁদের চিরকাল শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌বে এবং সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার কর্‌বে।"

সিংলী এই মূল্যবান্ কাগজখানি পরম যত্নে বুকের পকেটে রেখে, দেবতাদুটিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখ্‌ল, যে, তাঁরা দুজনেই অন্তর্হিত হয়েছেন।

যাহোক্, বুকভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে সিংলী তখনই পাহাড় থেকে নেমে, মহা আনন্দে মায়ের কাছে ফিরে গেল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ডাকাতের শিক্ষা

(সত্য ঘটনা)

নস্থু মিঞা ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোক। সে ছিল প্রসিদ্ধ ডাকাত; তার চেহারাখানা যেমন বিশাল গায়েও জোর ছিল তেমনি; লোকে বল্‌ত, যে, তার ওজন নাকি ৯ মন। নস্থুর ডাকাতি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একদিন সে এক বামণকে খবর পাঠাল, যে, সে অমুক দিন রাত্রে তার বাড়ীতে ডাকাতি করতে যাবে। এখন, এরকম খবর পেলে, সাধারণতঃ লোকে ঘরদোর সব ফেলে, ছেলে বৌ নিয়ে পালিয়ে যায়; আবার কেউ কেউ কিছু গহনা কাপড়ও সঙ্গে নিয়ে যায়। কারণ, জানা কথাই যে, ডাকাতেরা লুটপাট্ করে সব নিয়ে যাবে। বামণ কর্‌ল কি, তার স্ত্রী আর ছেলেপিলেকে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে একা বাড়ীতে রইল। সে

বার্‌বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্তর ভিতর বাড়ীতে সরিয়ে রেখে, নিজে বার্‌বাড়ী থেকে ভিতরবাড়ী যাবার একটা সরু গলির মাথায়, দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রইল। নস্থু মিঞা তার দল নিয়ে ডাকাতী করতে এসে, বারবাড়ী একেবারে খালি দেখে বল্‌ল, "দেখ্‌লে, বামণটা ভয় পেয়েছে, সব জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে। চল্, একবার ভেতর বাড়ীতে যাওয়া যাক্।" বলে সে আগে আগে সরু গলিটা দিয়ে ভিতরবাড়ীর দিকে চল্‌ল। যেতে যেতে, যেই না সে সেই দেওয়ালটার কাছে এসেছে, অম্‌নি বামণ একটা প্রকাণ্ড মোটা চেলাকাঠ দিয়ে খুব জোরে ধাঁই করে একেবারে তার মাথায় মেরেছে এক ঘা! বেচারা মারের চোটে তখনই মাথা ঘুরে বেহুসের মত হয়ে বসে পড়েছে আর ততক্ষণে সঙ্গের লোকেরাও বামণকে ধরে ফেলেছে। এত লাগা সত্ত্বেও, নস্থু মিঞা তার সঙ্গীদের বল্‌তে লাগ্‌ল, "আরে, রাখ্ রাখ্, এখন ওকে কিছু করিস্ না।" তারপর একটু সুস্থ হয়ে সে বামণকে বল্‌ল, "সাবাস্ বামণ! আজকে তোরই জিৎ, আমি হার মান্‌লাম। যা আজ আর তোর বাড়ীতে ডাকাতী কর্‌ব না। তবে ইচ্ছা রইল, আর একদিন এসে ডাকাতী করা যাবে। আস্‌বার আগে আবার সময় মত খবর দেব এখন।"

ওসব অঞ্চলে বর্ষাকালে পথ ঘাট সব জলে ডুবে যায়; মাঠ আর নদী এক হয়ে কোন্‌টা মাঠ আর কোন্‌টা নদী বোঝা যায় না; জল থৈ থৈ করে। এইরকম জলভরা প্রকাণ্ড মাঠকে "হাওর" বলে। বর্ষাকালে নস্থু রাত্রে এইসব হাওরের ধারে লুকিয়ে থাক্‌ত আর সে পথে যত নৌকা যেত, তাদের আট্‌কিয়ে লুটপাট্ করে হাওরে ডুবিয়ে দিত। এইরকম করে সে যে কত লোক মেরেছে আর কত নৌকা ডুবিয়েছে তার অন্ত নাই। তার মা তাকে কত বল্‌তেন, কত বোঝাতেন, কত মিনতি করে বারণ কর্‌তেন, তবু নস্থু ডাকাতির লোভ ছাড়্‌তে পারেনি।

একদিন নস্থুর মা জান্‌তে পার্‌লেন, যে, নস্থুর দল অমুক হাওরে লুকিয়ে আছে। শুনেই তিনি এক মতলব আঁট্‌লেন। বড় একটা পিনীস্ নৌকা সুন্দর করে সাজিয়ে তিনি মাঝিদের বল্‌লেন, সেই হাওরের পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে। গভীর রাত্রে সীমাশূন্য হাওরে, ধীরে ধীরে পিনীস্ চলেছে। এমন সময়ে নস্থুর মা শুন্‌লেন, কে যে পিছন থেকে তাঁদের মাঝিকে ডেকে বল্‌ছে, "আরে ভাই যাও কই? একটু আগুন দিয়ে যাও।" তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লেন, যে, একটা নৌকা তাঁদের পিছন নিয়েছে। তাঁর বুঝ্‌তে আর বাকি রইল না, যে, সেটা কার নৌকা।

তিনি মাঝিদের জোরে নৌকা চালাতে বল্‌লেন। মাঝিরাও তাড়াতাড়ি নৌকা বেয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। তাই দেখে পিছনের নৌকার লোকেরা আবার ডাক দিতে লাগ্‌ল। তবু পিনীস্ থামে না দেখে, তারা রেগে গাল দিতে লাগ্‌ল আর তর্ তর্ করে নৌকা চালিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের ধরে ফেল্‌ল। নসু হল দলের সর্দ্দার, ডাকাতী কর্‌তে যাবার সময় সে-ই থাক্‌ত সব চেয়ে আগে। নসুর মা নৌকার ভিতরে চুপ করে বসে আছেন আর ভাব্‌ছেন, যে, এইবার নসু এলেই হয়। এমন সময় ঝুপ্ করে একটা শব্দ হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাঁদের নৌকার সাম্‌নের দিক্‌টা অনেকখানি নীচু হয়ে গেল। নসুর মা বুঝ্‌লেন, যে, এইবার ঠিক নসু এসেছে।



তিনি একেবারে নৌকার সাম্‌নে এগিয়ে এসে, মুখ বাড়িয়ে বল্‌লেন "কে রে? নসা নাকি?" হঠাৎ মায়ের গলা শুনে আর চোখের সাম্‌নে মাকে দেখে, নসু একেবারে হতভম্ভ! কি যে কর্‌বে বুঝ্‌তে না পেরে, হাতের লাঠি টাঠি সব ফেলে দিয়ে "তোওবা তোওবা" করে সেইখানেই বসে পড়্‌ল। তখন নসুর মা বল্‌লেন, "ওরে! ভাগ্যিস্ আমি জেগে ছিলাম; তা না হ'লে ত তুই আজ আমাকেই মেরেছিলি!" তখন

নসুর চৈতন্য হলো—সে মাকে বল্‌ল, "মা, এমন কাজ আর কখন কর্‌ব না।" নসুর মা বল্‌লেন, "তবে আয়, আমার পায়ে হাত দে। আমার পা ছুঁয়ে তুই প্রতিজ্ঞা কর্, যে, আর কখন এ কাজ কর্‌বি না।" নসু মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, সেদিন থেকে তার ডাকাতী ব্যবসা একেবারে জন্মের মত ছেড়ে দিল।

শ্রীলীলা রায়।

বন্ধুর দান

বেনেগ্রাম ছোট একটি গ্রাম। কিন্তু ছোট হইলেও গ্রামে কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন লোকের বাস আছে। তখন রেল হয় নাই, সেইজন্য নৌকা করিয়া দূর দেশে যাওয়াআসা চল ছিল। বেনে গ্রামের কাছেই নদী থাকায় ব্যবসায়েরও সুবিধা ছিল। ধনেশ্বর বণিক গ্রামের মধ্যে একজন বড় লোক। তাঁহার প্রকাণ্ড দোতলা পাকা বাড়ী, বাগান পুকুরে ঘেরা। সেই বাগানের বেড়া ঘেঁষিয়া ছোট একটি একতলা বাড়ী, সেখানি রামলোচন নামে এক গরীব কায়স্থের।

এই একতলা বাড়ীর পিছনে খানিকটা পোড়ো জমি। তারই উপর দেখা যায়, ঝোপ জঙ্গল ও বাঁশ ঝাড়ের মাঝখানে, একটি ঢিপির মাথায় একটা ভাঙ্গা মন্দির। এই পোড়ো জমিটুকু নাকি বহুকাল আগে রামলোচনের পূর্ব্বপুরুষেরাই ভোগ করিতেন। প্রবাদ আছে, সে মন্দিরে এক সময়ে খুব ঘটা করিয়া পূজা হইত, এবং এখনও নাকি দেবমূর্ত্তির বেদীর নীচে, কিম্বা মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে, কিম্বা আঙ্গিনার তুলশীতলায় কোন এক যায়গায় অনেক ধন-রত্ন লুকান আছে। সঙ্গে এও প্রবাদ আছে, যে, মন্দিরের কাছের বাঁশ ঝাড়ে ভূতের বাসা, কেহ তুলশী কাছে গেলে ভূত তাহার ঘাড়ে চাপে। তাহা না হইলে অনেক আগেই দরজা ধন-রত্নের খোঁজ করিত। যাহা হউক, গ্রামের লোকে সে সব কথা প্রাচে খুঁড়িতে গিয়াছিল। কেবল ঠাকুরমা দিদিমারা মাঝে মাঝে ছোট ছেলেমে বেশী খুঁড়িতে সেই ধনের কথা ও ভূতের কথা গল্প করিতেন। ধার পাত্র নহে।

ধনেশ্বরের প্রকাণ্ড বাড়ীতে থাকিতেন কেবল তিনি নিজে, তাঁহ কথা সে ভুলিয়া দাসীরা। তাঁহাদের একটিও ছেলে কি মেয়ে ছিল না। পাশের রের আবর্জ্জনা

বাড়ীতে থাকিতেন রামলোচন, তাঁহার স্ত্রী ও বুড়ী ঝি চণ্ডী, তাঁহাদেরও ছেলে মেয়ে ছিল না।

একদিন ভোর বেলা গ্রামের লোকে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিল, দোতলা বাড়ীতে ও একতলা বাড়ীতে, দুই বাড়ীতে যেন রেশারেশি করিয়া শাঁখ বাজিতেছে। ধনেশ্বরের অনেক কাল পরে একটি ছেলে হইয়াছে, তাই এত শাঁখের ধুম। বণিক্-বাড়ীর দাসী একতলা বাড়ীর বেড়া ফাঁক করিয়া ডাকিল, "কি লা চণ্ডী, তোরাও দেখি শাঁখ বাজাস্? আমাদের ঘরে রাজপুত্তুর এয়েচেন, তোদের ঘরে কে এয়েচে লা?" চণ্ডী ঝি একগাল হাসিয়া বলিল, "আমাদেরও রাজপুত্তুর এয়েচেন।"

ধনেশ্বর তাঁহার ছেলের নাম রাখিলেন "কমলাচরণ।" তাঁহার ইচ্ছা সে লক্ষ্মীরই সেবা করিবে। তিনি গণক ডাকিয়া ছেলের কোষ্ঠি করাইলেন। কোষ্ঠিতে লেখা ছিল, সে পরের ধন ভোগ করিবে। রামলোচন তাঁহার ছেলের বড় বড় চোখ দুটি দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন "পদ্মলোচন।" সকলে কমলাচরণকে ক্রমে 'চরণ' ও পদ্মলোচন কে 'লোচন' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। চরণ দোতলার উপরে সাত দাসীর কোলে পিঠে মানুষ হইতে লাগিল। লোচন গরীবের ঘরে, মায়ের ও চণ্ডী দাসীর আদরে মানুষ হইতে লাগিল। কিন্তু কেমন করিয়া জানি একদিন চরণ আর লোচনে ভারি ভাব হইয়া গেল; যদিও তাহাদের জাতিতে মেলেনা, যদিও একজন গরীবের ছেলে আর একজন ধনীর ছেলে।

ইহার মধ্যে হঠাৎ রামলোচন স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তখনও লোচন খুবই ছেলে মানুষ। তাহার মা অতি কষ্টে বাসন পত্র বাঁধা দিয়া, বিক্রী করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। চরণ ও লোচন দুটিতে এক সঙ্গে পাঠশালে যায়। চরণের যে তত মন নাই। কিন্তু লোচন জানে সে লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইলে, তবে মায়ের দুঃখ ঘুচিবে, তাই সে মন দিয়া পড়ে শুনে।

কাছে লোচন মন্দিরের লুকান ধনের কথা শুনিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বসিয়া লোচন দেখিত, দূরে কাল ঢিপির উপর অন্ধকার মন্দির আর র বন। চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিত, "ঐ মন্দিরে না জানি কত ন আছে। আহা! সে সমস্ত যদি আমি পেতাম, তবে আর কষ্ট থাকৃত না। ও জমি ত আমাদেরি ছিল, ও ধনও তবে হার ইচ্ছা হইত একবার গিয়া খুঁজিয়া দেখে, যদিবা কপাল গুণে

সে ধন পায়। কিন্তু বাঁশের বনের দিকে চাহিয়া তাহার আর সাহসে কুলাইত না। তারপর মনে মনে বলিত, "যখন বড় হব' তখন খুব সাহস হবে আর ভূতের ভয় থাক্‌বে না, তখন আমি ঐ মন্দিরে গিয়ে খুঁজ্‌ব।" সে চণ্ডীকে বলিত, "চণ্ডি! জানিস্, আমি যখন বড় হব, ঐ মন্দির থেকে অনেক মোহর এনে, তোকে আর মাকে দেব।" চণ্ডী ভয় পাইয়া বলিত, "খবরদার খোকাবাবু! ওখানে যেতে নেই, ওখানে ভূত আছে।"

এমনি করিয়া বছর যায়। লোচনের পড়া শেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের যে দুঃখ সেই দুঃখই আছে। লোচনের বয়স এখন ষোল সতের হইবে। চরণের সঙ্গে এখনও তার ভাব, তবে, এখন তাহাকে কাজের চেষ্টায় ঘুরিতে হয়, বাড়ী বাড়ী গিয়া দু একটি ছেলেকে পড়াইতে হয়, তাই বন্ধুর সঙ্গে তাহার বড় দেখা হয় না। চরণ বড় লোকের ছেলে, তাহার অনেক নূতন সঙ্গী জুটিয়াছে, সে লোচনের কথা প্রায় মনেই আনে না।

লোচন কিন্তু মন্দিরের কথা ভোলে নাই। একদিন দুপুর বেলা, সে ছোট একখানা শাবল হাতে করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিল। পোড়ো জমি, উঁচুনীচু খানাখন্দ পার হইয়া যাইতেছে; মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া দেখে কেহ আসিতেছে কিনা, মাঝে মাঝে এপাশে ওপাশে গাছের দিকে চায়। যদিও ভূতের ভয় করিবেনা মনে করিয়াছে, তবুও গাটা যেন ছম্ ছম্ করিতেছে। শেষে যখন মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িল, তখন উৎসাহেতে ভূত টুত সব ভুলিয়া গেল।

অনেক পুরান মন্দির, ছাত পড়িয়া গিয়াছে, একদিকের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে; সেই দিকেই বাঁশ বন। একটা বড় বাঁশের ঝাড় একেবারে উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই বাঁশ ঝাড়ের নীচে তুলশী মঞ্চ। মন্দিরের দেওয়ালের ও তুলশী মঞ্চের গাঁথুনী ছোট ছোট ইটের। উঠানে রাশীকৃত ইটপাট্‌কেল, ভাঙ্গা দরজা কড়ি বর্গা, বড় বড় পাথরও। লোচন আগে সেই তুলশী মঞ্চের নীচে খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু মাত্র আধ হাতের বেশী খুঁড়িতে পারিল না। কাজেই সেদিন বাড়ী ফিরিতে হইল। কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নহে। এমনি করিয়া প্রতিদিন সে মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিল। ভূতের কথা সে ভুলিয়া গেল। তুলশী মঞ্চের নীচে কিছু পাওয়া গেল না। তখন সে মন্দিরের আবর্জ্জনা

TORN PAGE(S).

সরাইয়া ঠাকুরের ভাঙ্গা বেদী বাহির করিল। সেখানে কোনও মূর্ত্তি নাই। বেদী খানা পাথরের তৈয়ারী। একখানি একখানি করিয়া পাথর ছেনি দিয়া কাটিয়া, শাবল দিয়া খুঁড়িয়া, অনেক কষ্টে সে সেগুলিকে সরাইল। পাথরের নীচে ধূলা মাটিতে শাবলের ঘা মারিতেই ঠন্ করিয়া শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি দুই হাতে মাটি



সরাইয়া, লোচন দেখিল, দেড় হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া একটা লোহার কবাট। কবাটের গায়ে একটা আংটা লাগান। লোচন প্রাণপণে সেই আংটা ধরিয়া টানিল, কিন্তু কবাট খুলিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কবাটের পাশে মাটিতে দুই পা জোরে বসাইয়া, দুই হাতে গায়ের জোরে টানিল; তাহার হাতের শির ফুলিয়া উঠিল, মুখ লাল হইয়া গেল, তবু লোহার কবাট নড়িল না। তখন সে হতাশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এত কষ্ট করিয়াও কিছু ফল হইল না। তখন তাহার মনে হইল, একজনে না পারিলে, দুইজনে পারা যাইবে। কিন্তু কাহাকে বিশ্বাস করিয়া সে সাহায্য করিতে ডাকিবে? চণ্ডী দাসী? চণ্ডী দাসী ত বুড়ী, তার গায়ে জোর কোথায়? তা ছাড়া, চণ্ডী একথা শুনিলে নিজেত আসিবেই না, তাহাকেও আসিতে

দিবে না, ভূতের ভয়ে। তখন তাহার মনে হইল, "বন্ধুকে বল্‌লে কেমন হয়?" ঠিক কথা। চরণই উপযুক্ত লোক। সে তাহার বন্ধু, তাহাকে বিশ্বাস করা যায়। তা ছাড়া, যদি ধন পায়ই, লোচন গরীব মানুষ, কোথায় সে এত ধন রাখিবে? সে বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া ধন লইবে, তাহার বদলে বন্ধু তাহাকে সাহায্য করিবে এবং ধন নিরাপদে রাখিবার ভার লইবে। এই ঠিক।

লোচন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল। কিন্তু সেদিন তাহার এত পরিশ্রম হইয়াছিল, যে, সেদিন আর সে চরণের সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না।

পরদিন লোচন চরণকে একলা ডাকিয়া নিয়া বলিল, "ভাই তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে। একটা কাজে তুমি আমাকে সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে? কিন্তু আর কেউ যেন জান্‌তে না পায়।" চরণ বলিল, "কি তোমার এমন গোপনীয় কাজ, শুনি? যদি তাতে আমার কোনরকম ক্ষতি না হয়, তবে সাহায্য কর্‌তে পারি।" লোচন বলিল, "তোমার ক্ষতিত নেইই, বরং লাভ। তুমি যদি কিছু না ও কর, তবু এসব কথা আর কাউকে ব'ল না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বল্‌ছি। ঐ যে ভাঙ্গা মন্দির আছে না, যেখানে ধন লুকান আছে, ব'লে লোকে বলে, সেখানে আমি গিয়েছিলাম।" "সত্যি? তারপর? ভূত দেখ্‌লে?" "না না, ভূত কি, ভূতের কথা আমার মনেও হয়নি, আমি ঐ ধন খুঁড়্‌তেই গিয়েছিলাম।" "পাগল আর কি।" "শোনই না কেন আমার কথা। তুলশী-তলায় আগে খুঁড়্‌লাম, সেখানে কিছু পেলাম না। তারপর বেদীর নীচে খুঁড়্‌তেই হঠাৎ ঠন্ ক'রে একটা আওয়াজ হ'ল—" "তারপর?" "তারপর তাড়াতাড়ি মাটি-গুলো সরিয়ে দেখি কি, একটা লোহার কবাট।" "লোহার কবাট? তারপর?" "তারপরে আর কি? অনেক চেষ্টা করেও কবাটটা খুল্‌তে পার্‌লাম না, তাই তোমার কাছে এসেছি। যদি কিছু পাই ত তোমার অর্দ্ধেক, আমার অর্দ্ধেক। তবে কি জান্‌লে, আমি গরীব মানুষ, কোথায় সে সব রাখ্‌ব? তোমাকেই তার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। কেমন, রাজি আছ ত?" "রাজি।"

(ক্রমশঃ)

শনির দৃষ্টি

(কৃত্তিবাসী রামায়ণের গল্প)

রাজা দশরথ কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা এই তিন রাণীর মধ্যে কৈকেয়ীকে সকলের চাইতে বেশী ভালবাসিতেন। তিনি রাতদিন কৈকেয়ীর নিকটে অন্তঃপুরে পড়িয়া থাকিতেন, রাজ্যের কাজ একটুও দেখিতেন না। এইভাবে সুখে মত্ত হইয়া তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে অযোধ্যানগরে দারুণ অনাবৃষ্টি হইল। চারিদিকে কেবলই হাহাকার, প্রজাগণের দুঃখের সীমা নাই। কিন্তু দশরথ ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, তিনি অন্তঃপুরে আমোদে মত্ত।

এই সময়ে একদিন নারদমুনি আসিয়া উপস্থিত। রাজা দশরথ তাঁহাকে পরম যত্নে পূজা করিয়া বসাইলেন। নারদ বলিলেন—"মহারাজ! রোহিণী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, সেজন্য তোমার রাজ্যে বারি বর্ষণ হয় না। তুমিত বেশ সুখে অন্তঃপুরে দিন কাটাইতেছ, কিন্তু অযোধ্যা যে ছারখার হইয়া গেল, তাহার সংবাদ রাখ কি? এই বেলা সাবধান হও।" এই বলিয়া মহর্ষি নারদ চলিয়া গেলেন।

রাজা দশরথের চৈতন্য হইল, তিনি তখনই রথে চড়িয়া রাজ্যের অবস্থা দেখিতে যাত্রা করিলেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম যে দিকেই গেলেন—দেখিলেন, নদনদী, দীঘি পুষ্করিণী সকলই শুষ্ক, কোথাও বিন্দুমাত্র জলের চিহ্ন নাই। ক্রমে সন্ধ্যার সময় রাজা বনের ধারে এক গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিলেন। সেই গাছে শুক শারী দুটি পক্ষী থাকিত। শেষ রাত্রে পক্ষী দুটির ঘুম ভাঙ্গিলে, শারী শুককে বলিল—"সূর্য্যবংশ-রাজ্যে কখনও ত দুঃখ পাই নাই? কিন্তু এখন একি হইল! গাছে ফল নাই, পেটে খাদ্য নাই, তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তবু এক ফোঁটা জল পাইতেছি না! রাজা প্রজার দুঃখ দেখেন না, তিনি বেশ আরামে অন্তঃপুরে পড়িয়া আছেন। এই পাপী রাজার রাজ্যে থাকিলে মৃত্যু নিশ্চিত। চল, সমুদ্রের তীরে চলিয়া যাই—অন্ততঃ জল খাইয়া তৃষ্ণা দূর হইবে।"

গাছের নীচে বসিয়া রাজা দশরথ শারীর কথা সকলই শুনিতে পাইলেন। এবং বুঝিতে পারিলেন, যে, দেবর্ষি নারদ অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন। তখন

ভাবিলেন—"দেবরাজ ইন্দ্র বড়ই চালাক, মুখে একরকম বলেন কিন্তু কাজে করেন অন্য রকম। আমার ঠাকুরদাদা রঘু ইন্দ্রকে বাঁধিয়া অযোধ্যায় আনিয়া খাটাইয়াছিলেন। এখন আমিও যদি ইন্দ্রকে বাঁধিয়া অযোধ্যায় আনিতে পারি, তবেই আমার "দশরথ" নাম সার্থক হয়।"

এদিকে ভোর হইলে শুক, গাছের তলায় রাজা দশরথকে দেখিয়া, ভয়ে অস্থির হইল। শারীকে বলিল—"শারি! সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্—ঐ দেখ্ রাজা দশরথ গাছের তলায় বসিয়া আছেন, তোর কথা সকলই তিনি শুনিয়াছেন, আর এখনি শব্দভেদী বাণে আমাদিগকে বধ করিবেন!" এই বলিয়াই শুক ঠোঁটে তাহার ডিম লইয়া শারীর সহিত আকাশে উড়িল। পক্ষী পলাইতেছে দেখিয়া, রাজা দশরথ ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা পলাইও না। ভয় নাই, বাসায় ফিরিয়া আইস। আমি এখনই তোমাদের কষ্ট দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।"

রাজা দশরথ তখনই রথে চড়িয়া ইন্দ্রের পুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং "যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি" বলিয়া ইন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন। অন্য দেবতারা বলিলেন—"মহারাজ! হঠাৎ আপনার এরূপ রাগের কারণ কি? ইন্দ্র ত আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না।" দশরথ বলিলেন—"আমার রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টির দরুণ, অযোধ্যা নগর ছারখার হইয়া গেল, প্রজাদিগের দুঃখের সীমা নাই। ইন্দ্র যদি এখনই অযোধ্যায় বর্ষণ না করেন, তবে অমরাবতী কাড়িয়া লইব।"

এ কথায় দেবতারা মহা ব্যস্ত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন—"শীঘ্র গিয়া দশরথকে খুসী করুন, নতুবা একবার শব্দভেদী বাণ মারিয়া বসিলে আর কাহারও রক্ষা থাকিবে না।" দেবগণের কথায় ইন্দ্র তাড়াতাড়ি গিয়া দশরথকে আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন। দশরথ বলিলেন—"দেবরাজ! আমার পিতামহ রাজা রঘুকে আপনি কথা দিয়াছিলেন, যে, অযোধ্যার শস্য ক্ষেত্রের যাহাতে কোন দিন কোন অনিষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা আপনি করিবেন। তবে কেন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইল?" ইন্দ্র বলিলেন—"মহারাজ! ইহাতে আমার কোন দোষ নাই। অযোধ্যাবংশের নক্ষত্র রোহিণী, সেই নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই অযোধ্যায় বর্ষণ বন্ধ। রোহিণী নক্ষত্র হইতে যদি শনির দৃষ্টি ছাড়াইতে পার, তবেই তোমার রাজ্যে সুবৃষ্টি হইবে।"

রাজা দশরথ তখনই রথ চালাইয়া শনির নিকট চলিলেন। শনির বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে ডাকিলে, যখন তিনি বাহির হইয়া দশরথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন শনির দৃষ্টিতে দশরথের রথের বাঁধন দড়ি এবং ঘোড়ার লাগাম প্রভৃতি পুড়িয়া গেল। আর তখনই আটটি ঘোড়াশুদ্ধ রথখানি দশরথকে লইয়া, ঘুরপাক খাইতে খাইতে পড়িয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বনাশ হইল! আর বুঝি দশরথের রক্ষা পাইবার উপায় নাই! মুহূর্ত্তমধ্যে রথশুদ্ধ পৃথিবীতে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবেন!

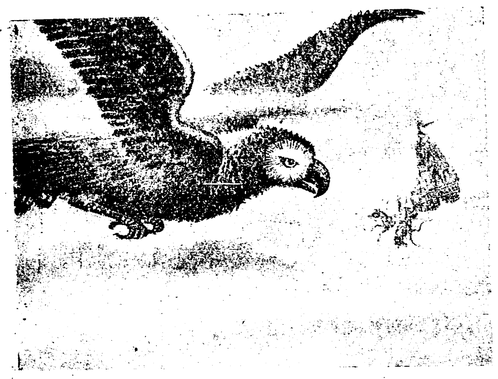

এই সময়ে জটায়ু পক্ষী আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। রথশুদ্ধ ঘুরপাক খাইতে খাইতে দশরথ পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া, পক্ষী ভাবিল—"রাজা দশরথ পুণ্যবান্ লোক। আমার সাক্ষাতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া প্রাণ হারাইবেন—ইহা কখনই হইতে পারে না। আমি তাঁহাকে যদি এই বিপদ হইতে উদ্ধার করি, তবে আমার খুব নাম হইবে।" এই ভাবিয়া জটায়ু তাহার বিশাল দুটি পাখার উপরে দশরথের রথখানি ধরিল।

দশরথের রথ স্থির হইলে, তিনি আবার ঘোড়ার রাশ ও রথের দড়ি টড়ি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলেন। রথ আবার শনির বাড়ীর দিকে চালাইবেন, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়িল—"তাই ত! কে দয়া করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইল? তাহাকে ত দেখিতে পাইলাম না?" এই ভাবিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার রক্ষা-কর্ত্তা বিশাল-দেহ একটি পক্ষী! তখন পক্ষীকে অতি আদর যত্নের সহিত রথে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইতেছিলাম, এমন সময় কে তুমি দয়া করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইলে?"

পক্ষী বলিল—"আমার নাম "জটায়ু," আমার দাদার নাম "সম্পাতি"—আমরা পক্ষিরাজ গরুড়ের পুত্র। আমি আকাশে বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম,

তুমি পড়িয়া যাইতেছ—তাই পাখা পাতিয়া রথশুদ্ধ তোমাকে ধরিয়াছি।" ইহা শুনিয়া দশরথ জটায়ুকে কত যে আদর করিলেন তাহা আর কি বলিব! সেইদিন হইতে জটায়ু পক্ষী দশরথের প্রাণের বন্ধু হইল।

ইহার পর দশরথ রথ চালাইয়া আবার শনির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া শনি বলিলেন—"দশরথ! তুমি আবার আসিয়াছ? যাহা হউক, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি পুণ্যবান্ এবং আমার বংশের লোক। আমি সূর্য্যের পুত্র, তুমিও সূর্য্যবংশের রাজা। তবু বলিতেছি, তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইওনা। কারণ, আমি রাগিয়া যাহার দিকে চাই, সে-ই ভস্ম হয়। এই আমি চক্ষু দুটি বুঁজিলাম, এখন আমার পিছনে আসিয়া বল, তুমি কি চাও। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, যাহা চাহিবে তাহাই দিব।"

তখন দশরথ শনির পিছনে গিয়া করযোড়ে বলিলেন—"ঠাকুর! আপনার দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে পড়িয়াছে, তাই অযোধ্যায় বৃষ্টি হইতেছে না। দেশ ছারখার হইয়া গেল। প্রজাদের দুঃখের সীমা নাই।"

শনি বলিলেন—"আচ্ছা, আমি রোহিণীকে ছাড়িয়া দিলাম। তুমি দেশে চলিয়া যাও, আজ হইতে তোমার রাজ্যে সুবৃষ্টি হইবে।"

———

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

স্বপ্নতরীর সমুদ্র যাত্রা

ষ্টক্ সাহেব আর তাঁর সঙ্গীরা 'পেড্রোমিগুয়েল্' লকে বেশ আনন্দে রাত কাটালেন। লকের একজন লোক গভীর রাত্রে তাঁদের মোটর গাড়ীতে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে গেল। চাঁদের আলোয় পথের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে, তাঁরা অনেক দূর চলে গেলেন। তাঁরা 'পানামা সহর' পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন; সেখানে কিছুক্ষণ থেকে, আবার 'পেড্রোমিগুয়েল্' লকে তাঁদের সেই ছোট জাহাজটিতে ফিরে এলেন।

তারপর স্বপ্নতরী লক্ থেকে বেরিয়ে, পানামা খাল দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়্‌ল। তারপর ষ্টক্ সাহেবেরা পশ্চিমে গ্যাল্‌প্যাগস্ দ্বীপপুঞ্জের দিকে যেতে লাগ্‌লেন। পথে টাওয়ার দ্বীপ (Tower Island) দেখা

যাবার কথা। জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌বার ভার প্রধানতঃ ষ্টীভ্ সাহেবের উপর; তিনি বল্লেন, "কাল আমরা টাওয়ার দ্বীপ দেখ্‌তে পাব।" সকাল হতেই সকলে খুব উৎসাহের সঙ্গে জাহাজের ডেকে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাব্‌লেন, 'এখন নিশ্চয়ই টাওয়ার দ্বীপ দেখা যাবে।' কিন্তু দ্বীপ কোথায়? চারিদিকে বিশাল সমুদ্র, তাতে দ্বীপের কোনও নমুনা দেখা গেল না। তাতে ষ্টীভ্ সাহেব বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়্‌লেন। ষ্টক্ সাহেব আর তাঁর বোনও খুব অবাক্ হয়ে গেলেন। যা হোক্, তাঁরা জাহাজ চালিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। সমস্ত দিন কেটে গেল, তবুও দ্বীপ দেখা গেল না। তখন তাঁদের খুব ভাবনা হ'ল। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা ঠিক কর্‌লেন, যে, হয় জাহাজের ঘড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে, কিম্বা তাঁদের সঙ্গে যে মানচিত্র (Map) ছিল তাতে কোন রকম ভুল আছে, কিম্বা দ্বীপটি হটাৎ জলের নীচে ডুবে গিয়েছে, বা অন্য কোন রকমে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

এইভাবে তাঁরা নানা রকম তর্ক আর জল্পনা কর্‌ছেন, রাতও ক্রমেই ঘনিয়ে আস্‌ছে, এমন সময় ষ্টক্ সাহেবের বোন্ বলে উঠ্‌লেন, 'ঐ দূরে তীর দেখা যাচ্ছে।' সকলে দেখ্‌লেন, যে, তাঁরা গ্যাল্‌প্যাগস্ দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছেন। তখন তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁরা কিছু সুইজ্‌ল্ (বার্‌বাডোস্ দ্বীপের সরবৎ) সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন; সকলে সেই সরবৎ কিছু কিছু খেয়ে নিলেন। ষ্টীভ্ সাহেব জাহাজ চালাতে লাগ্‌লেন; অন্যেরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। গভীর রাত্রে হটাৎ ষ্টক্ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখ্‌লেন, ষ্টীভ্ সাহেব আস্তে আস্তে তাঁর হাত টিপ্‌ছেন। ষ্টক্ সাহেব জাগ্‌তেই ষ্টীভ্ সাহেব বল্লেন, 'একটা কিম্ভূত কিমাকার জিনিস দেখা যাচ্ছে, একবার এসে দেখে যাও।' তাঁরা দুজনে গিয়ে দেখেন, যে, একটি বিশাল কুয়াসার স্তূপ জাহাজের সাম্‌নে, খাড়া পাহাড়ের মত, দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন বাতাস একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছিল, আর জাহাজও থেমে রয়েছিল। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় কুয়াসার স্তূপটিকে বড়ই বিশ্রী দেখাচ্ছিল আর সাহেবদের মনে একটু একটু ভয়ও হচ্ছিল। স্বপ্নতরীর যাত্রীরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেই কুয়াসার স্তূপের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছেন, যে, তার ভিতর দিয়ে কিছু দেখা যায় কি না। এমন সময় কুকুরের ডাকের মত একটা অস্পষ্ট আওয়াজ তাঁদের কাণে এল। তাঁরা বুঝ্‌লেন কাছেই কোথাও ডাঙ্গা আছে। এমন সময় তাঁদের সাম্‌নের কুয়াসার স্তূপ হটাৎ ফাঁক হয়ে গেল; তাঁরা দেখ্‌লেন, প্রায়

১০০ হাত দূরে, কালীর মত গাঢ় কালরংয়ের সারি সারি পাহাড় রয়েছে। ষ্টক্ সাহেবদের জাহাজ একটা বেখাপ্পা স্রোতের টানে প'ড়ে, পাহাড়ের দিকে ভেসে যেতে লাগ্‌ল। তাঁরা কিছুতেই জাহাজ সাম্‌লাতে পার্‌লেন না। যাহোক্, অনেক পরিশ্রম ক'রে আর অনেক কৌশল খাটিয়ে, তাঁরা জাহাজটাকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চালিয়ে নিয়ে গেলেন। জাহাজের কোন অনিষ্ট হ'ল না। এদিকে রাত ও ফুরিয়ে এসেছে, আস্তে আস্তে সূর্য্য উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে। সে দিনের সূর্য্য উঠা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! এরকম অদ্ভুত সূর্য্যোদয় তাঁরা কখনও দেখেন নি। ভোরের সূর্য্যের লাল আলো সমুদ্রের জলের উপর পড়াতে, সমস্ত জল গোলাপী রঙে ভ'রে গিয়েছে। গোলাপী জলের উপর সারি সারি কাল রঙের পাহাড়ের চূড়ো মাথা তুলে রয়েছে। কাছে, দূরে, চারিদিকেই নানা আকারের পাহাড়ের চূড়ো। কোন কোনটা মাত্র ১০০ ফিট উঁচু; আবার এক একটা বড় চূড়ো প্রায় ২০০০ ফিট উঁচু।

আশে পাশে সীল (seal) নামক জন্তু, জলের উপর মাথা তুলে, তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল, আর ঠিক কুকুরের ডাকের মত আওয়াজ ক'রে পালিয়ে যাচ্ছিল্। জাহাজের উপরে 'পেলিক্যান্' পাখী উড়ছিল আর থেকে থেকে ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ তুলে নিচ্ছিল। লাল আর হল্‌দে রঙের ছোট ছোট পাখী, তারা কখন জাহাজের ডেকের চারধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, আর কখন বা নিশ্চিন্ত মনে জাহাজের ক্যাবিনে গিয়ে বস্‌ছিল। জলের নীচে কচ্ছপ, হাঙ্গর, শুশুক, আর অক্টোপাস্ বা 'ডেভিল ফিস্' নামক বীভৎস আটপেয়ে জলজন্তু দেখা যাচ্ছিল।

ষ্টক্ সাহেবেরা বুঝ্‌লেন, যে, তাঁরা গ্যালপ্যাগস্ দ্বীপেরই এক অংশে এসে পড়েছেন। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় থাকাতে, যায়গাটা গোলক ধাঁধার মত বোধ হচ্ছিল। তাঁরা কোথাও কোন মানুষ দেখ্‌তে পেলেন না। তাঁরা জানতেন, যে, গ্যাল্‌প্যাগস্ দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বভাগকে 'স্যান্ কৃষ্টোবাল' বলে, আর সেখানে গেলে নিশ্চয় মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। তাই তাঁরা বরাবর পূর্ব্বদিকে জাহাজ চালিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। যখন তাঁরা দূর থেকে 'স্যান্ কৃষ্টোবাল' দ্বীপ আর সেখানকার ছোট ছোট বাড়ী ঘর দেখ্‌তে পেলেন, তখন তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না।

ষ্টক্ সাহেবদের জাহাজ 'স্যান্ কৃষ্টোবাল' দ্বীপে থাম্‌তেই সেখানকার শাসনকর্ত্তা একজন পুলিশ কর্ম্মচারী, আর একটি অত্যন্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁদের অভ্যর্থনা কর্‌তে

এগিয়ে এলেন। তাঁরা সকলেই ইউরোপিয়ান, তাঁরা ষ্টক্ সাহেবদের খুব যত্ন ক'রে রাখ্‌লেন। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁর জীবনের অনেক আশ্চর্য্য কথা বল্লেন। তিনি মাত্র ১৭বছর বয়সে সমুদ্র যাত্রা আরম্ভ করেন। অনেক যায়গা ঘুরে, তিনি শেষে গ্যাল্‌প্যাগস্ দ্বীপে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে, বাঁশের তৈয়ারী একখানা কুটীরে আছেন। এইরকম সাদাসিধা জীবনই তাঁর ভাল লাগে; তিনি সভ্য জগতে ফিরে যেতে চান না। তিনি ষ্টক্ সাহেবদের ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

স্যান্ কৃষ্টোবাল দ্বীপে ষ্টক্ সাহেবেরা সেদিন খুব আনন্দে কাটালেন। তাঁরা দ্বীপের ভিতর ছোট ছোট আগ্নেয়গিরি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন; তবে তখন সে গুলো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, আগুন মোটেই দেখা যেত না। দ্বীপের আশে পাশে ছোট ছোট প্রবালের দ্বীপ আর প্রবালের পাহাড়। স্যান্ কৃষ্টোবালের শাসনকর্ত্তার বাড়ী একখানা ছোট পাহাড়ের উপর; তার চারপাশে পিয়ন (Peon) দের খড়ের তৈয়ারী বাড়ী। এখানকার পিয়নেরা বড় কুঁড়ে।

স্যান্ কৃষ্টোবাল দ্বীপ থেকে ষ্টক্ সাহেবেরা আবার পশ্চিমে 'সাউথ্ সি' দ্বীপ পুঞ্জের দিকে রোয়ানা হলেন। তাঁদের জাহাজ নুকুইবা দ্বীপ ছেড়ে, প্রথমে মার্‌কুয়েসাস্ (Marquesos) দ্বীপপুঞ্জের কাছে এল। মারকুয়েসাস্ দ্বীপে পৌঁছিয়ে ষ্টক্ সাহেবেরা অনেক বুনো ছাগল ধ'রে ছিলেন। এই দ্বীপের লোকেরা একটু জঙ্গ্‌লী ধরনের হ'লেও বেশ অমায়িক। তারা একদিন ষ্টক্ সাহেবদের জাহাজে এসে, তাদের দেশের নাচ দেখাল। তাদের দেশের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনা তারা নাচেতে প্রকাশ করে।

মারকুয়েসাস্ দ্বীপপুঞ্জ 'সাউথ্ সি' দ্বীপপুঞ্জেরই এক অংশ। এখান থেকেই 'সাউথ্ সি' দ্বীপপুঞ্জ আরম্ভ হয়েছে। এই সব যায়গায় প্রবাল আর মুক্তা যথেষ্ট পাওয়া যায়। একদিন ষ্টক্ সাহেবেরা মুক্তার খোঁজে, জাহাজে উঠে, টাহুয়াটা দ্বীপের দিকে রোয়ানা হ'লেন। তাঁদের সঙ্গে প্যাস্‌ক্যাল্ (Pascal) নামে পমোটু দ্বীপের একজন লোক গিয়েছিল; তার শরীর অতি প্রকাণ্ড। সে নাকি খুব চমৎকার রান্না কর্‌তে পার্‌ত। টাহুয়াটা দ্বীপে গিয়ে সেখানকার দৃশ্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বড় বড় ঝরণা, আর প্রবালের স্তূপ সেখানে যথেষ্ট দেখা যায়। দ্বীপের তীরে বড় বড় গহ্বরের ভিতর সমুদ্রের জল ঢুকে, আবার ছিট্‌কিয়ে বেরিয়ে আসে; তাতে সেখানকার বাতাস জলের কণায় ভ'রে যায় আর তাতে নকল রামধনুর সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সেখানকার জল থেকে আর মুক্তা তোলা হ'ল না। প্যাস্‌ক্যাল্ ঘাড় নেড়ে বলে উঠ্‌ল, "উহুঁ, এখানে বড় হাঙ্গর, মুক্তা তোলা সম্ভব হবে না।"

ষ্টক্ সাহেব প্যাস্‌ক্যাল্‌কে বিদায় দিয়ে, 'সাউথ্ সি' দ্বীপপুঞ্জের আর এক অংশে রোয়ানা হলেন। ক্রমে তাঁরা পমোটু দ্বীপে এসে পৌঁছালেন। পমোটু একটি প্রবাল দ্বীপ। এর চারপাশে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ আছে। এখানকার লোকেরা সাঁতার কাট্‌তে আর জল থেকে মুক্তা তুল্‌তে বড়ই ওস্তাদ। এরা অনেকক্ষণ জলের নীচে থাক্‌তে পারে।

পমোটুর লোকেরা ছেলেবেলা থেকেই জলের ধারে থাকে আর সাঁতার কাটে। এরা প্রবাল দ্বীপের ঢালু তীর দিয়ে হেঁটে জলের নীচে নেমে যায়। সেখান থেকে মুক্তা, শামুক, ঝিনুক কুড়িয়ে, একখানা থলিতে ভ'রে আবার উঠে আসে।



টাহিটির প্রবাল দ্বীপের দৃশ্য।

পমোটু দ্বীপের খুব কাছেই পাপিটি আর টাহিটি দ্বীপ। এই সব যায়গায় ইউরোপ আমেরিকা আর চীন দেশ থেকে ব্যবসাদারেরা মুক্তা সংগ্রহ কর্‌তে আসে। তারা পমোটু দ্বীপের লোকদের নানারকম পোষাক উপহার দেয়, আর পমোটুর লোকেরা জলের তলা থেকে মুক্তা তুলে এনে তাদের দেয়।

ষ্টক্ সাহেবেরা পাপিটি দ্বীপ দেখে, পামার ষ্টোন দ্বীপের দিকে যাত্রা কর্‌লেন। পথে মুরিয়া দ্বীপ দেখ্‌তে পেলেন। প্রবাদ আছে, এই দ্বীপে আগে একরকম বেঁটে মানুষ থাক্‌ত; তাদের 'গিরগিটি মানুষ' (Lizard men) বলে। তারপর তাঁরা পামার ষ্টোন দ্বীপে এলেন। এ দ্বীপেও বিস্তর প্রবাল পাওয়া যায়। তারপর তাঁরা টঙ্গা দ্বীপে গেলেন। টঙ্গা দ্বীপই 'সাউথ্ সি' দ্বীপপুঞ্জের শেষ দ্বীপ। এখান থেকে তাঁরা অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যান।

শ্রীসুবিমল রায়।

বর্ষার খালে

ভারি মজা, হি-হি হো-হো! বর্ষা জলের খাল্‌টিতে।
ঘরে যেতেই গোব্‌রা জেলে মাছ ধরে' তার জাল্‌টিতে,
বস্‌লাম চড়ে দলে বলে দড়ি খুলে শাল্‌তিতে।
গোব্‌রার বোন্ কৈলেশী সে লাগ্‌লো কসে গাল্ দিতে;
সুরু কর্‌লাম সারি গান, লাগ্‌লো সবাই তাল্ দিতে।
ছুট্‌লো ডোঙ্গা এড়িয়ে ডাঙ্গা, উড়িয়ে চাদর পাল্ দিতে;
কে গণে ছাই যাচ্চে কোথায়,—আমি ছিলাম্ হাল্‌টিতে।
উল্টে ডোঙ্গা ঢাক্‌লো মাথা,—যেন ঘরের চাল্‌টিতে।
সাঁৎরে উঠে গেলাম্ ছুটে ধানের ক্ষেতের আল্‌টিতে।
শিক্ষা দিতে এলেন গুরু বেতের সরু ডাল্‌টিতে,—
বাঁচিয়ে নিলাম্ ভিজে প্রাণ যে-যা'র পিঠের ঢাল্‌টিতে;
খিল্-খিল্ খিল্! বেজায় মজা এই বর্ষার কালটিতে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মানুষ মুখো

বানরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মত তা দেখ্‌লেই বোঝা যায়; বিশেষতঃ ওরাং ওটাং শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বুদ্ধিমান্ বাঁদরদের চাল চলন আর মুখের ভাব দেখ্‌লে, মানুষের মত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কোন কোন বানর আছে তাদের মাথার লোমগুলি দেখ্‌লে ঠিক টেরিকাটা মানুষের মাথার মত মনে হয়, যেন কেউ চিরুণি দিয়ে চুল ফিরিয়ে সিঁথে কেটে দিয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় একটা বানরের ছবি দেখ, এর যে রকম গোঁফের বাহার, খুব কম মানুষেরই সে রকম আছে। এর বাড়ী আমেরিকায়। ছোট্ট আধ হাত উঁচু বানরটী, কিন্তু ওই গোঁফের জন্যে তার মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব দেখা যায়। এদের রং কালো, হাতে লম্বা লম্বা নখ থাকে, তাই দিয়ে কাঠবিড়ালীর মত গাছে খাম্‌চিয়ে ওঠে। এই জাতীয় বাঁনরের নাম টামারিন্। এদের সকলের এ রকম গোঁফ থাকে না; গুঁফো বাঁনরদের

এম্পারার টামারিন্ অর্থাৎ সম্রাট্ টামারিন্ বলে। তা সম্রাটের মত চেহারাই বটে।



গোঁফওয়ালা বানর

সম্রাটের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কলা। গুঁফো বাঁদর দেখ্‌লে, এইবার দাড়িওয়ালা বাঁদর দেখ। এর নাম হচ্ছে কালো সাকী। এরও বাড়ী আমেরিকায়। সে দেশের লোকেরা এই বাঁদরকে সয়তান্ বাঁদর বলে।



দাড়িওয়ালা বানর

এরকম অন্যায় নাম দেবার কোনই কারণ পাওয়া যায় না, কারণ এদের মেজাজ যেমন ঠাণ্ডা স্বভাব ও তেমনই নিরীহ। দাড়ির বহর যতই হোক্ না কেন আসলে এরা ভীতুর এক শেষ। মানুষের কোন অনিষ্ট করা দূরে থাক্, কাছে কোথাও মানুষ আছে জান্‌তে পার্‌লে, এরা তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালায়। এদের কোনরকমে পোষ মানান যায় না; ধরে আন্‌লে অতি অল্প দিনের মধ্যে মরে যায়। তার পরের ছবিটী আর এক জাতের সাকী বাঁদরের ছবি। এর গায়ের রং খুব হাল্কা তাই একে সাদা সাকী বলা হয়। এর চেহারা



যেন আরো উদ্ভট্ গোছের। দাড়িও অন্য রকমের। এই রকমের গালপাট্টা

দেওয়া চেহারা আর বিকট ধেব্‌রান মুখ দেখে, বুঝ্‌বার যো নাই যে, বেচারার স্বভাবটী মোটেও তার চেহারার মত নয়।



বুড়ো ধাড়ী সিন্ধু ঘোটক্‌দের চেহারাও অনেক সময় খুব মাতব্বর গোছের মানুষের মত মনে হয়। গোঁফ্, দাড়ি, মাথায় টাক্, সবই বেশ মানিয়ে যায়, কেবল হাতীর মত ওই প্রকাণ্ড দাঁত দুটোতেই সব মাটি করে দেয়।

এইবারে শেষ ছবিখানা দেখ। এটা যে মানুষের ছবি নয় তা হঠাৎ দেখ্‌লে বুঝ্‌বার যো নাই। এটা কিসের ছবি জান? সমুদ্রের নীচে অনেক অদ্ভুদ রকমের মাছ দেখ্‌তে পাওয়া যায়; তার কোন কোনটার মুখ দেখ্‌তে অনেকটা মানুষের মত। এইরকম একটা মাছকে মানুষের পোষাক পরিয়ে তার ফটো তুলে দেখান হয়েছে।

"উহ্যনাম পণ্ডিত"

"বুমরাং"

এই পৃথিবীতে যারা সভ্যজাতি বলে পরিচিত, তাদের সভ্যতার মোটামুটি পরিচয় হচ্ছে এই যে, তারা চাষবাস করতে জানে, আগুনের এবং নানারকম ধাতুর ব্যবহার জানে, নানারকম জিনিসকে নিজের কাজে লাগাতে জানে, পাকা ঘরদালান গড়তে জানে, আর মনটাকে নানারকম জ্ঞানের সন্ধানে নিযুক্ত করতে জানে। এসব যারা জানেনা তাদের আমরা বলি অসভ্যজাত। এই হিসাবে, পৃথিবীর সব চাইতে অসভ্য জাতিদের নাম কর্‌তে হ'লে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বর্ব্বর জাতির কথা উল্লেখ করতে হয়। তারা কাপড় বানাতে জানে না, ধাতুর ব্যবহার ত দূরের কথা, সামান্য মেটে বাসন পর্য্যন্ত তৈরী করতে জানে না, চাষবাসের কোনও খবরই

রাখে না; কাঁচা মাংস আর বুনো গাছের ফল বা শিকড় খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য লতাপাতার ছাউনি ছাড়া আর কোনও রকম ঘরবাড়ীর খবর তারা রাখেনা; এক থেকে দশ পর্য্যন্ত গুণ্‌তে বল্‌লে মাথায় তাদের গোল বেধে যায়।

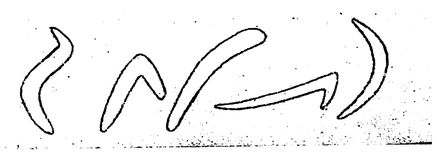

নানা আকারের বুমরাং

এমন যে অসভ্য জাত, তারাও কিন্তু একটি বিদ্যায় এমন ওস্তাদ যে, সে বিদ্যা পৃথিবীর অতিবড় সভ্য জাতিরাও আজ পর্য্যন্ত শিখে উঠ্‌তে পারেনি। সে বিদ্যাটি হচ্ছে বুমরাং অস্ত্রের ব্যবহার। অস্ত্র বল্‌লাম বটে, কিন্তু তা বলে খুব একটা জটিল বা মারাত্মক কিছু মনে করে বস না। বুমরাং জিনিসটি হচ্ছে এক টুক্‌রা বাঁকান কাঠ মাত্র। সেই কাঠের একপিঠ সমান আর একপিঠ

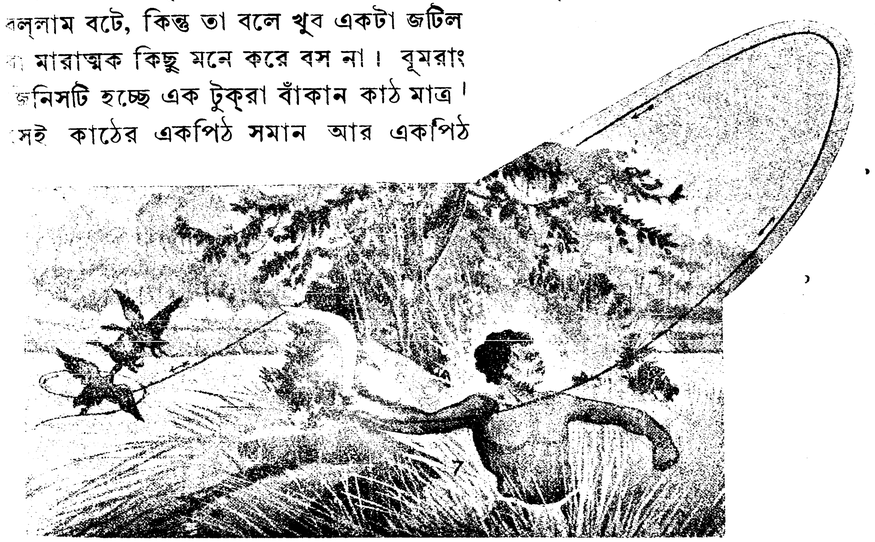

গোল মত উঁচু করা, অনেকটা হকি খেলার লাঠির মত। যে পিঠটাকে সমান বল্‌লাম তাও একেবারে সমান নয়। ভাল করে দেখ্‌লে দেখা যায়, সেটাও কেমন একটু ঢেউ খেলান মতন, কোথাও সামান্য উঁচু কোথাও সামান্য নীচু। বুমরাঙের চেহারা নানা রকম হয়।

এখন বূমরাঙের ব্যবহারের কথা বলি। এই অস্ত্রের সাহায্যে সে দেশী লোকেরা তাদের প্রতিদিনের শিকার সংগ্রহ করে। লড়াইএর সময়েও এই অস্ত্রই তাদের

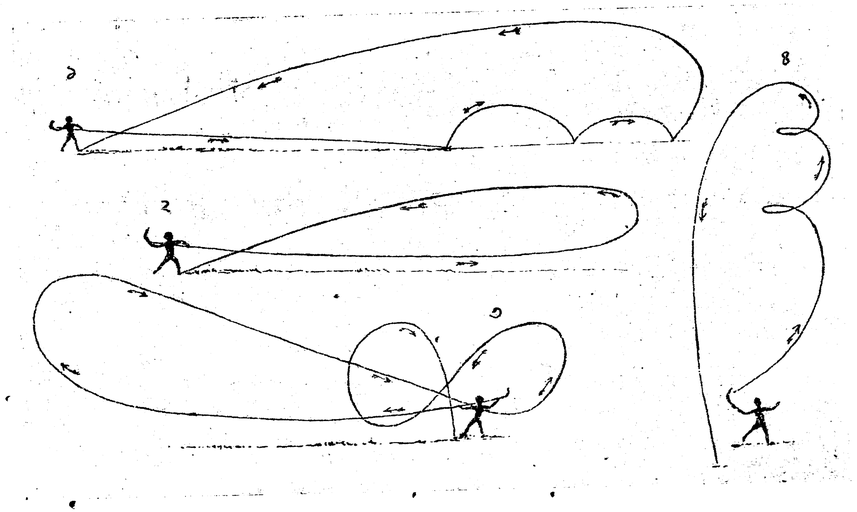

বূমরাং ছোঁড়ার কয়েকটি কায়দা

প্রধান সম্বল। ওস্তাদ লোকেরা যখন এই অস্ত্র ছুঁড়ে মারে, তখন অস্ত্রের চালচলন এমন অদ্ভুত রকমের হয় যে, চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস কর কঠিন। অস্ত্র ছুঁড়ে মারলে তা কখনও সোজাসুজি স.মনের দিকে ছুটে যায় না। খানিকদূর গিয়েই নানারকম উল্টোবাজি খেতে থাকে, গোঁৎ খেতে খেতে আকাশে উঠে যায়, আবার অনেক সময়ে সোঁ করে ওস্তাদের কাছেই পাল্‌টে ফিরে আসে। প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে শত্রু বা শিকার লুকিয়ে আছে, ওস্তাদ শিকারী গাছের আরেক দিকে থেকেই এমন কায়দায় বূমরাং ছুঁড়ল যে, সে অস্ত্র গাছ এড়িয়ে প্রকাণ্ড চক্র দিয়ে ঘুরে শত্রু বা শিকারের গায়ে গিয়ে পড়্‌ল। ছবিতে দেখ কেমন করে ওস্তাদ শিকারী হাঁস শিকার কর্‌ছে। ওস্তাদ দাঁড়িয়েছে কিন্তু হাঁসের দিকে পিছন ফিরে,

আর অস্ত্র ছুঁড়ছে সাম্‌নের দিকে। সেই অস্ত্র কেমন করে গাছ ঘুরে যাচ্ছে, তা একটি কালরেখা দিয়ে দেখান হয়েছে।

যুদ্ধের জন্য, শিকারের জন্য, বা তামাসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বূমরাং তৈরী হয়। যুদ্ধে যে সব অস্ত্রের ব্যবহার হয়, সে গুলি ছুঁড়ে মারলে আর ফিরে আসে না। শিকারের বূমরাংগুলি এমন ভাবে তৈরী যে, দৈবাৎ যদি শিকার ফস্‌কে যায় তা'হলে অস্ত্র আপনি শিকারীর কাছে ফিরে আসে। তামাসার বূমরাংগুলি এমন ভাবে বানায় যে, ছুঁড়লে পর খুব সুন্দর বা খুব অদ্ভুত ভাবে নানারকম কায়দা খেলিয়ে, অস্ত্র আপনার ও ওস্তাদের বাহাদুরী দেখায়। শেষ ছবিটিতে কয়েক রকম বূমরাং ছোঁড়ার কায়দা দেখান হয়েছে। প্রথম ছবিটি দেখ, একজন অসভ্য তার বূমরাংটাকে মাটির উপর ছুঁড়ে মেরেছে, তাতে বূমরাংটা ব্যাঙের মত প্রকাণ্ড দুই লাফ দিয়ে, তারপর পিছন ভাবে মোচড় দিয়ে, একেবারে আকাশে চক্কর দিতে দিতে আবার যেখানকার অস্ত্র সেই খানেই ফিরে এসেছে। দ্বিতীয়টির চলন ভঙ্গী সব চাইতে সোজা। যখন খুব তাড়াতাড়ি টুপ্‌টু ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি শিকার মারা দরকার হয়, তখন এই রকম ভাবে অস্ত্র ছোঁড়া হয়। তৃতীয়টী কতকটা দ্বিতীয়েরই মত, কিন্তু তার রকমারী অনেক বেশী, যেন জিলিপীর প্যাঁচ। চতুর্থটী দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে, কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

আশ্চর্য্য এই যে, এই সব অস্ত্র কেন যে ঐ রকম ভাবে চলে, তার সঠিক হিসাব আর নিয়ম কানুন বার কর্‌তে গিয়ে, মহা মহা পণ্ডিতেরাও অনেক সময় হার মেনে যান; অথচ পৃথিবীর অসভ্যতম জাতির কারিকরেরা, সারা বছর ধরে এইসব অস্ত্র নিখুঁৎভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় তৈরী কর্‌ছে, আর অসভ্য ওস্তাদেরা তার অব্যর্থ ব্যবহার দেখিয়ে সভ্য মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে। কেমন করে তাদের মগজে এমন বিদ্যা প্রবেশ কর্‌ল, কোথা এমন অস্ত্রের সন্ধান পেয়ে এমন করে শিখ্‌ল, তার উত্তর কেউ জানে না।

"উহ্যনাম পণ্ডিত"

খুঁত্‌খুঁতে হাঁস

প্রকাণ্ড বিলের কালো জলে শত শত রাজহাঁস থাকে। তারা সারাদিন মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়ায় আর খায় দায়। একটি শাদা হাঁসের কিন্তু দিনরাতই খুঁত্‌খুঁতি লেগে আছে;—কেন তার চেহারা আরো সুন্দর হয় না;—কেন তার গায়ে নানা রকম রং হয় না;—কেন তার পালক কোঁকড়ান হয় না—ইত্যাদি।

শেষটায় সে একদিন সত্যি সত্যিই মনের দুঃখে বিলের জল ছেড়ে উড়ে চ'লে গেল। অনেক দূর গিয়ে একগ্রামে একটা ছোট বাড়ীর ছাতে গিয়ে বস্‌ল। হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল, সাম্নের বাড়ীতে লেখা রয়েছে, "পালক ধোয়া হয়, রঙান হয়, কোঁকড়ান হয়;—দর সস্তা;—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।" খুঁত্‌খুঁতে রাজহাঁস অম্নি সেই বাড়ীর দরজা দিয়ে ঢুকে গেল।

প্রথমেই এক চশমাপরা বুড়োর সঙ্গে তার দেখা। সে বুড়োকে বল্‌ল, "মশাই! আমার পালক সুন্দর ক'রে নানা রঙে রঙ্গিয়ে দিতে পারেন? ডানার পালকগুলি একটু কোঁকড়ান হ'লে ভাল হয়।" বুড়ো বল্‌ল, "পার্‌ব না কেন? এক টাকা লাগ্‌বে।" হাঁস বিলের ধারে একদিন একটি টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিল;—তাই সে বুড়োকে বল্‌ল, "হাঁ, দেবো।"

বুড়ো তখনই অনেক শিশিভরা রং এনে তার গা, সুন্দর ক'রে রঙ্গিয়ে দিল। লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ, বেগুনি, গোলাপী, সোনালী, রূপালী,—কোন রংই বাদ গেল না। ডানার পালকগুলি সুন্দর ক'রে কোঁকড়ান হ'লো। হাঁসের তো ভারি ফূর্ত্তি! সে বুড়োকে টাকাটি দিয়েই উড়ে নিজের দেশের দিকে রওয়ানা হ'লো। কিন্তু, তার মনের আনন্দ আর বেশীক্ষণ রইল না। রঙ্গিন হাঁস দেখে সকলেই ভাব্‌ল, "বাঃ কি সুন্দর পাখী! এমন আশ্চর্য্য সুন্দর পালক আর কোন পাখীর নাই! এটাকে মার্‌তে পার্‌লে হয়।" যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দলে দলে লোক পন্ পন্ করে হাঁসের পিছনে ছুট্‌ল;—কারো হাতে গুলেল, কারো হাতে তীর ধনুক, কারো হাতে বন্দুক, কেউ পাথর, কেউ ইঁটপাট্‌কেল নিয়েই ছুটেছে। চারিদিকে সাঁই সাঁই, ফুট্‌ফাট্, দুম্‌দাম্ শুনে ভয়ে হাঁসের প্রাণ উড়ে গেল! বেচারা প্রাণপণে উড়ে উঁচুতে উঠ্‌ল; কিন্তু লোকেরা আর তার পেছন ছাড়ে না। বন্দুকের গুলি তখনও দুম্‌দাম্ শব্দে তার আশে পাশে ফাট্‌ছে। হাঁস বেচারা ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে

পড়্‌তে লাগ্‌ল;—আর বোধ হয় সে উড়্‌তে পার্‌বে না! তার মাথা ঘুরে গেল, চোখ অন্ধকার হয়ে এল। বেচারা প্রায় পড় পড়!——

এমন সময়, কোথা থেকে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নাম্‌ল আর হাঁসের গায়ের সব রং ধুয়ে একেবারে ধপ্‌ধপে শাদা রং বেরিয়ে পড়্‌ল। বুড়ো রংওয়ালা সব কাঁচা রং দিয়েছিল। যখন সকলে দেখ্‌ল যে হাঁস একেবারে শাদা, তখন তারা বল্‌ল, "আরে ছ্যাঃ! এ যে রংকরা হাঁস! চল্ চল্, ঘরে ফিরে চল্।"——

তারাও ঘরে ফিরে গেল, হাঁসও বেঁচে গেল। সে দিন থেকে সে বেচারা আর কখনও খুঁত্‌খুঁত করেনি।

শ্রীসুবিনয় রায়।

ধাঁধার উত্তর

চিঠির প্রথম কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, তারপর ২টি কথা বাদ দিয়া তৃতীয় কথাটী পড়। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক তৃতীয় কথা পড়িয়া গেলে ধাঁধার উত্তর পাওয়া যাইবে:—

যদি ভাল যাত্রা শুনিতে ইচ্ছা থাকে আজ রাত্রে গোঁসাইদের বাড়ীতে নিশ্চয় উপস্থিত হইবে। গান খুব ভাল হইবার কথা। স্বয়ং গোবিন্দ দাস গানের দল লইয়া উপস্থিত। শুনিলাম খুব জুড় হইবে সুতরাং শীঘ্র আসিতে পারিলে ভাল।

ধাঁধার উত্তর দাতারা নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। কয়েকজনের উত্তর ঠিক হইয়াছে কিন্তু এত অস্পষ্ট নাম লিখিয়াছেন যে পড়িতে পারা গেল না।

যাঁহাদের আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর নির্ভুল হইয়াছে:—

শিবকুমার সেন, রণেন্দ্রনাথ ঘোষ, উমাশশী দেবী, শঙ্খচূড় ঘোষ, সুশীলকুমার বসু, দুর্গাদাস মুখার্জ্জী; অশোককুমার রায়, কমলা বসু, যতীশকুমার বসু, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, এম, আবদুররকিব "ভিটু ও ঢাকু", বিমলেন্দু রায়, প্রভা দেবী, অমলেন্দু দাস, ভূপেন্দ্রনাথ সেন, শিশিরকুমার দত্ত, দাশরথি চক্রবর্ত্তী, অসিতকুমার বসুমল্লিক, কমলকুমারী দেবী, ধীরেন্দ্রনাথ বল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজলীভূষণ মুখোপাধ্যায়, "গীতাপ্রীতি ভট্টাচার্য্য," সুকুমার দত্ত, অনিলা বসু, সুধাংশুকুমার সরকার, চণ্ডীচরণ চৌধুরী, আলাটী স্কুলের থার্ড সেকেণ্ড ক্লাশের ছাত্রবৃন্দ, শিশির, ইন্দিরাময়ী ঘোষ, হিরণ্ময় ঘোষ, সুকুমার চক্রবর্ত্তী, নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, "খোকা ও মনু," প্রদ্যোৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয়কৃষ্ণ আচার্য্য, ছেতারা আখ্‌তার খাতুন, দিলীপ, প্রমথনাথ নন্দী, দিলীপকুমার নন্দী, অর্ণবকুমার বসু, পারুলরাণী রায়, "গৌরী ও মায়া," ললিতকুমার

ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘটক, সৌরেন্দ্রমোহন রায়, সিদ্ধেশ্বর সরকার, "জ্যোতি, অজিত ও প্রতিমা," সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ভায়া, অশোকরঞ্জন ঘোষ, শিশিরকুমার সরকার, প্রতিভাসুন্দরী বসু, সুষমা সেন, মনীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুখেন্দু ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ ভট্ট, বীরেন্দ্রকুমার বসু, শিশিরকুমার মিত্র, জ্যোতিপ্রভা রায়, অনিলবিহারী রায়, শান্তিসুধা দাস, মানসী সরোজবালা দাসগুপ্ত, হীরেন্দ্রকুমার সেন, সুশীলকুমার নিয়োগী, মাধুরী ঘোষ, ব্যোমকেশগণ অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উষারাণী মিত্র, সুশীলরঞ্জন মোতায়েদ, নিবেদিতা চৌধুরী, রামময় ভণ্ডুল, নগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

---

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম

যাঁহাদের ৪টি ধাঁধার উত্তরই নির্ভুল হইয়াছে ঃ—

হরিমোহন নন্দী, সাবিত্রী সান্যাল, 'শিশির,' ছেতারা আখ্‌তার খাতুন, নগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুধাংশুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজবালা দাসগুপ্তা, অনিলা বসু, অরিন্দমকুমার পাল, প্রতুল গুপ্ত, শিবকুমার সেন, বিমলচন্দ্র দত্ত, পবিত্রকুমার নন্দী, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, লীলাবতী দেবী, উষাপ্রভা দেবী, "রবি ও লীলা", প্রতিমা সেন, কালীচরণ চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, যতীশকুমার বসু, আশালতা দত্ত, অশোককুমার সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, (১) সত্যব্রত ঘোষ, (২) সত্যব্রত ঘোষ, নির্ম্মলকুমার ঘোষ, অশোককুমার রায়, "ছোট্‌কুও লাঠিম," অনিলচন্দ্র রায়, বিজরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জ্যোতিকণা সেনগুপ্তা, রবীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, সরোজিনী দাস, রেণুকা সেন, মাধুরী ঘোষ, প্রতিমা দেবী, জ্যোতিপ্রভা রায়, সুখেন্দু ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকুমার বসু, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী নাগ, সুষমা সেন, সুবিনয় ভট্টাচার্য্য, প্রমোদকুমার বিশ্বাস, হেমলতা দাস।

যাঁহাদের তিনটি ধাঁধার উত্তর নির্ভুল হইয়াছে ঃ—

বিজনবিহরী রায়, সুধাংশুকুমার বসু, আলটী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ, নীরজাকান্ত চৌধুরী ও অমিয়লহর বালা দাসগুপ্তা, শৈলেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, ধীরেন্দ্রনাথ বাউল, ব্যোমকেশগণ চৌধুরী, প্রভা দেবী, শান্তিচরণ পাল, মন্টু ব্যানার্জ্জী, ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা বসু, সুশীলচন্দ্র দাসগুপ্ত ও বিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত, গৌরী ও মায়া, অজিতকুমার বানার্জ্জী, উষা মিত্র, নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মেম্বার্স অফ্‌ দি ষ্টুডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী, অনিমেষচন্দ্র রায়চৌধুরী, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাশশী, জ্যোতিপ্রসাদ বসু, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নলিনেশচন্দ্র মৌলিক, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, স্নেহলতা দেবী, সুধারাণী ও রাজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ মজুমদার, দিলীপকুমার নন্দী, কনককান্তি রায়, সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিভাবতি গুপ্ত, সুকুমার মিত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।



জলের তলায় ছবি আঁকা



একাদশ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৩০ ৫ম সংখ্যা

মনের কথা

বরষার কথা নয়, শুধুই ঝগড়া ঝাঁটি
দাপটে লুটান তরু, কাঁদিয়া ভিজান মাটি!
বন পথ তোল পাড়, ভেঙেপড়া নদী-পাড়,
উড়ান ঝড়ের তোড়ে অযুত পাতার গাঁতি',
ছিঁড়িয়া ফুঁলের রাশি, আলোর মুছিয়া হাসি
রাতদিন নাহি গণি' আপন গরবে মাতি।
সে যে কত কাল কার, তরু আর লতিকার
ফুলের মালিকা গাঁথা মিলন-বাঁধন কাটি,
বরষার কথা নয়, শুধু রাগ আর ভয়;
পথেরে অপথ করা, নাবুঝের কান্নাকাটি!

বরষা মনের কথা ছায়ায় ছড়ায়ে দিল,
নিদাঘের দুখতাপ আঁচলেতে আবরিল;
সোহাগে চোখের জলে, ফুলের মরম তলে
দরদীর মত এসে সব ব্যথা মুছে নিল!

TORN PAGE(S).

COLOURED DOCUMENT.

দিল ফিরে ভালবাসা, এলো নিয়ে সেই আশা
ফলেরে কামনা করি মনে যে লুকায়ে ছিল।
বাঁচিয়া সবুজ ঘাসে ধরার বুকের বাসে
চির সবুজের কথা অমরতা প্রচারিল!
বরষা ভরসা বাণী দিল দিকে দিকে আনি
ভালবাসা সব বড়, ভাল করে বুঝাইল।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ছোট ছেলে মেয়ে

ছোট একটি ছেলে!
কাজ শুধু তার হুটোপুটি,
নয়ত বেজায় ছুটোছুটি,
চায় না কিছুই ত্রিভুবনে, খেল্‌তে কেবল পেলে।
দেখ নি তায়? তোমাদেরই ঘরের সে যে ছেলে।
ছোট একটি মেয়ে!
দেয়ালটিতে ঠেসান দিয়ে,
খেল্‌ছে বসে পুতুল নিয়ে,
এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলে মুখটি আছে ছেয়ে।
তোমাদেরই ঘরের সে যে ছোট একটি মেয়ে।
ছোট একটি ছেলে!
বুকে তাহার সাহস অসীম,
কখন সে রাম, কখন সে ভীম!
ভাবে মনে গায়ের জোরে ফেল্‌বে পাহাড় ঠেলে!
চেন না তায়? তোমাদেরই ঘরের মেয়ে ছেলে।
ছোট একটি মেয়ে!

দাদার সাথে খুনসুটিতে,
দিদির সাথে আড়ি দিতে
মজবুত সে! একটু কথায় জল পড়ে চোখ বেয়ে
দেখ্‌ছনা ঐ তোমাদেরই ঘরের ছোট মেয়ে?
ছোট একটি ছেলে!
লেখাপড়ায় ভারি যে মন!
খেলাধূলোয় কম কিছু নন্!
কাজের বেলায় ছুটে আসে দুষ্টুমি সব ফেলে।
তোমাদেরই ঘরে ঘরে ঐ সে ছোট ছেলে!
ছোট একটি মেয়ে!
হোক্‌না ফর্সা, হোক্‌না কালো,
তাতেই সে যে ঘরের আলো!
মায়ের কাজের সাথী, থাকে মায়ের মুখে চেয়ে।
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ঐ যে ছোট মেয়ে!

শ্রীসুনীতি দেবী।

বন্ধুর দান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন দুপুরে লোচন আর চরণ দুজনে মন্দিরে গেল। চরণ বলিল, "লোহার দরজা মরচে প'ড়ে আট্‌কে রয়েছে। এক কাজ করা যাক্, আগে দরজাটার চার দিকে শাবল দিয়ে আল্‌গা ক'রে নিয়ে, তারপর দুজনে মিলে আংটা ধরে টানা যাক্।" লোচন—"আংটাটাও ত মরচে ধরা, যদি ভেঙ্গে যায়?" "যায় যদি ত আর কি করা যাবে? তখন দরজাটাকেই শাবল দিয়ে খুঁড়ে তুল্‌তে হবে।" তখন তাহারা আস্তে আস্তে দরজার চারিদিকে শাবল দিয়া ঘা মারিতে লাগিল। দরজাটা যখন একটু আল্‌গা মনে হইল, তখন দুজনে মিলিয়া আংটা ধরিয়া খুব জোরে টান

দিল। অমনি খটাং করিয়া লোহার দরজা উঠিয়া আসিল। দরজার ভিতর দিয়া দেখা গেল, নীচে ছোট্ট একটি কুঠুরি, দুইজন মানুষ কোনও মতে ঢুকিতে পারে। লোচন দরজার ফোকরে দুইপা ঝুলাইয়া দিয়া কুঠুরির ভিতর নামিয়া পড়িল, পিছন পিছন চরণও নামিল। প্রথমে অন্ধকারে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল বিশ্রী একটা গুমোট গন্ধে তাহাদের যেন দম আট্‌কাইয়া আসিতে লাগিল। তারপর ক্রমে ভিতরের অন্ধকার তাহাদের চোখে সহ্য হইয়া আসিলে, তাহারা দেখিতে পাইল, কুঠুরির দেওয়ালের গায়ে ষোলটি পিতলের ঘড়া সাজান। ঘড়ার ভিতরে হাত দিয়া দেখিল মোহর!! চরণ লোচনের দিকে চাহিল, লোচন চরণের দিকে চাহিল, কেহ কিছু বলিল না। দুই জনেই আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল; ভিতরে যেন তাহারা নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিল না। বাহিরে আসিয়া লোচন বলিল, "এখন এত মোহর বাড়ী নেব কেমন করে?" চরণ বলিল, "দিনের বেলা নেওয়া যাবে না। তাহ'লে অন্য লোকে দেখে ফেল্‌বে। ও একটা ঘড়া আমরা দুজনে মিলে তুল্‌তে পারব কি না সন্দেহ। রাত্রে নিতে হবে। বেশী দিন আবার ফেলে রাখাও নিরাপদ নয়।" "তবে চল আজ রাত্রেই আরম্ভ করি।" "রোস, আমি আগে রাখ্‌বার যায়গা ঠিক করি। তাছাড়া, পরশুদিন অমাবস্যা গিয়েছে, আজ রাত্রে অন্ধকার হবে। জ্যোৎস্না রাত না হ'লে হবে না।" "তাইত, তাহ'লে কিছুদিন সবুর কর্‌তে হয়। সাত আট দিন পরে হ'তে পারে। এস তবে এখন যাওয়া যাক্।" দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিল।

এতদিন রোদে রোদে এত পরিশ্রম করার ফলে' লোচনের জ্বর আসিল। বিকালে চরণ আসিয়া দেখিল বন্ধু শয্যাগত। সে মুখে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার বিশেষ দুঃখ হয় নাই। মোহর দেখিয়া অবধি তাহার যেন মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। সে কেবল ভাবিতেছে, "আটটা ঘড়া আমার, আটটা লোচনের। যদি ষোলটাই আমার হ'ত তবে কেমন হ'ত?" ক্রমেই এই দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে পাইয়া বসিল। তাই সে লোচনের জ্বর হইয়াছে দেখিয়া, মনে মনে বলিল "এইবার সুযোগ।" কিন্তু তখনও অন্ধকার রাত, কিছুদিন দেরী করিতে হইবে। তার পরের দিন—দুপুরে চণ্ডী দেখিল, চরণ কতকগুলি বাঁশের চোঙা হাতে করিয়া খোড়ো জমির দিকে যাইতেছে। চণ্ডী তাহাকে ডাকিয়া বলিল,

"দাদাবাবু, লোচনের যে বড্ড অসুখ, একবার তাকে দেখে যাবেনা?" "এই যাব।" বলিয়া চরণ চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় চরণ লোচনকে চুপি চুপি বলিল, "জান ভাই, সেইদিন থেকে নাকি মন্দিরের কাছে বাঁশ ঝাড়ের ভিতর কি রকম বিকট শব্দ শোনা যায়। আমরা টাকার সন্ধান পেয়েছি ব'লে বোধ হয় ভূতগুলো রেগেছে। কাল রাত্রে যখন জোরে বাতাস বইছিল, আমাদের দোতলা থেকে 'হূ হূ' শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা ঠিক মন্দিরের দিক্ থেকে আস্‌ছিল।" লোচন বলিল, "আর ত মাত্র ৫।৭ দিন আছে, এর মধ্যে আমি ভাল হয়ে উঠ্‌লে হয়।"

জ্যোৎস্না রাত আসিয়া পড়িল, কিন্তু লোচনের জ্বর সারিল না। চরণ সুযোগ বুঝিয়া একরাত্রে, সেই মোহরের সন্ধানে মন্দিরে চলিল। তাহার যে ভূতের ভয় ছিল না তাহা নহে, তবু টাকার লোভে সে অন্য কথা ভুলিতে চেষ্টা করিল। মন্দিরের কবাট এখন আল্‌গা, কাজেই সেটাকে সে একটু চেষ্টা করিয়াই খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে অন্ধকার। সে ত বাতি আনে নাই! কিন্তু এত কষ্ট করিয়া আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইবে? তাই সে চোখমুখ বুজিয়া অন্ধকারেই নামিয়া পড়িল।

হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে যেমনি একটা ঘড়ার গায়ে হাত ঠেকিল, অমনি ধুড়ুস্ করিয়া কিসের একটা শব্দ হইল। ভয়ে, চরণের সমস্ত শরীরের লোম যেন দাঁড়াইয়া উঠিল। উপর দিকে চাহিয়া দেখে, দরজার ফাঁক দিয়া যেখানে জ্যোৎস্না-ভরা চারকোণা আকাশ চক্ চক্ করিতেছিল, সেখানটা একেবারে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, দরজাটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে!! নামিবার সময়ে তাড়াতাড়িতে সে ভাল করিয়া দেখে নাই, চারপাশের ছড়ান পাথরগুলা এমনভাবে ছিল যে, দরজাটা খুলিলে, উঠাইয়া মাটিতে না পড়িয়া, পাথরের গাদার গায়ে ঠেকিয়া খাড়া হইয়াছিল। ঝড়েও বোধ হয় ইটপাট্‌কেল একটু নাড়াচাড়া হইয়া থাকিবে, কেমন করিয়া জানি একটা পাথর গড়াইয়া দরজার উপরে পড়িয়া যায়, তাহাতেই দরজাটা বন্ধ হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত চরণের যেন বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে দুই হাত উঁচু করিয়া পাগলের মত দরজায় ঘুষি মারিতে লাগিল। উপর হইতে টানিয়া খোলা সহজ; নীচ হইতে খোলা সহজ নহে, বিশেষতঃ দরজাটা

ভাল করিয়া হাতে পাওয়া যায় না। ঘুষি মারিতে মারিতে তাহার হাতের মুঠা কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। যখন হয়রান হইয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, তখন তাহার গা বহিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে; সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "হায় রে, আমার লোভের এই শাস্তি। এই অন্ধকার মাটির নীচে আমাকে মর্‌তে হবে। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও ত কেউ এখানে শুন্‌তে পাবে না, আমি নিজেই যে সে পথ বন্ধ করেছি। লোচনেরও অসুখ, সেও আস্‌তে পার্‌বে না।" ক্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল।

পরের দিন বণিক-বাড়ীতে হুলুস্থুল কান্নাকাটি, চরণকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামের চারিদিকে লোক ছুটিতেছে, পুকুরে পুকুরে জাল ফেলা হইয়াছে। মন্দিরের কথা কেহ ভাবে নাই, ভাবিবার কথাও নয়। এদিকে লোচন জ্বর বিকারে বিছানায় পড়িয়া। বিকালবেলা আকাশ অন্ধকার করিয়া ঝড় আসিল। এক একবার বাতাস ঝাপ্‌টা দেয়, আর কোঠাঘরগুলি পর্য্যন্ত যেন নড়িয়া উঠে। লোচন বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছে। মাঝে মাঝে যখন একটু জ্ঞান হয়, চারিদিক্‌ চাহিয়া দেখে। একবার দেখিল দরজার কাছে চণ্ডী দাসী ঘুমাইয়া আছে। আবার শুনিল বাতাস হাঁকিতেছে, 'হু হু' করিয়া বাঁশ ঝাড়ের ভুতটা কাঁদিতেছে। তাই ত, আজ না তাহাদের মন্দিরে যাইবার কথা ছিল? এমন দিনে কি আর যাওয়া যায়? আরও কিছুদিন দেরী করিতে হইবে। আবার দেখিল, যেন চরণ সেই ঝড়ে বৃষ্টিতে মন্দিরের উঠানে একটা পাথরে হোঁচট্‌ খাইয়া পড়িয়া গেল, ভুতটা যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিল। লোচন স্পষ্ট শুনিল, চরণ তাহার নাম ধরিয়া "লোচন, লোচন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। যতবার তাহার ঘুম আসে, ততবার সেই চীৎকার শুনিতে পায় "লোচন, লোচন, লোচন"। শেষে আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া দরজা দিয়া ছুট্‌ দিল। চণ্ডী দাসী পিছনে পিছনে ছুটিল, "কোথা যাও, কোথা যাও, পাগল হ'লে নাকি? ও মা গো, দেখ এসে লোচনের কি হ'ল?"

কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই, লোচন সোজা মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। বাঁশ ঝাড়ের কাছে আসিতে, শাদা রঙের কি যেন একটা সড়সড় করিয়া গাছের উপর হইতে নামিল। লোচন মচ্‌মচ্‌ করিয়া বাঁশের খোলাটা মাড়াইয়া চলিয়া গেল। মন্দিরের উঠানে পৌঁছিয়া সে একবার থামিল, একবার

চারিদিকে চাহিল, তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'চরণ!' কেউ কোথাও নাই, কেবল বাঁশ ঝাড়ে 'হু হু' করিয়া কে যেন গোঙাইতেছে। আবার আরও জোরে ডাকিল 'চর—ণ'। এবার যেন তাহার মনে হইল মাটির ভিতর হইতে কে কি বলিল। সে ছুটিয়া গিয়া দরজার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাকিল, অমনি স্পষ্ট শুনিল ভিতরে কে যেন কাঁদিতেছে। অমনি দুই হাতে দরজা ধরিয়া টানিতে লাগিল। কতদিন ভুগিয়া তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তবু সে দরজা খুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষটায় দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে ও অজ্ঞানের মত মাটিতে পড়িয়া গেল। জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিল, চণ্ডী দাসী তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছে, তাহার হাতে একটা তেলের বাতি। তাহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া চণ্ডী যেন বাঁচিল। সে আস্তে আস্তে লোচনকে জাগাইয়া বলিল, "শিগ্‌গীর বাড়ী চল, আমি ধ'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি। শিগ্‌গীর চল।" লোচন খানিক হতভম্বের মত বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল আর বলিল, "বাতিটা দাও দেখি।" বলিয়া, চণ্ডীর হাত হইতে বাতি কাড়িয়া লইয়া সে কুঠুরির ভিতর নামিয়া পড়িল। চরণ তখন অসাড় অচেতনের মত পড়িয়া আছে, মাঝে মাঝে তাহার মুখ দিয়া 'গোঁ গোঁ' শব্দ বাহির হইতেছে। চণ্ডী উপর হইতে "ও লোচন, ও লোচন' করিয়া ডাকিতেছে, ভয়ে তাহার গলার স্বর বাহির হয় না। লোচন তাহাকে বলিল, "চুপ কর, এখন যা বলি তাই কর, আমি একে তুলে ধর্‌ছি, তুমি টেনে নাও।" লোচন ছিল লম্বা, চরণ ছিল ছোট খাট। লোচন চরণকে উঁচু করিয়া ধরিল, চণ্ডী তাহাকে কোনও মতে টানিয়া উপরে তুলিল।

মানুষের মনের বলই আসল বল। তা না হইলে সেই ঝড়ের রাতে দুর্ব্বল শরীর নিয়া লোচন কি করিয়া এতদূর চরণকে বহিয়া আনিল? চণ্ডী বাতি হাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল বটে, কিন্তু লোচন সেদিন যে সাহস দেখাইয়াছে, তেমন সাহস অল্প ছেলেই দেখাইতে পারে।

লোচন ও চরণের সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে কিছুদিন লাগিল। সুস্থ হইয়া তাহারা সমস্ত লুকান ধন ঘরে আনিল। চরণ বলিল, "ভাই লোচন! আমি যেমন তোমাকে ঠকিয়ে লোভ ক'রে নিজে সব নিতে গিয়েছিলাম, তেমনি শাস্তি আমার হয়েছে। এ টাকার ভাগ আমি নেব না, সমস্তই তোমার।" লোচন তাহাকে বলিল,

"তাহবে না, তোমাকে নিতেই হবে। আমার ভাগও তোমার কাছে রাখ্‌তে হবে। গরীবের বাড়ীতে কোথায় এত টাকা রাখা যায়? কিন্তু কি ভাগ্যিস্, যতদিন আমরা বিছানায় পড়েছিলাম, ততদিন আর কেউ এর সন্ধান পায়নি।" তখন চরণ বলিল, "পারে কি করে? ভূতের ভয়ে কি কেউ সে দিকে যায়? মনে নেই, তোমার যখন জ্বর হয়েছিল আমি এসে তোমাকে বলেছিলাম যে, আমরা কুঠুরির দরজা খুলেছি ব'লে ভূতেরা রেগেছে, বাঁশ ঝাড়ে তারা 'হু হু' করে চেঁচায় শোনা যায়?" "ঠিক ঠিক, আমিও সেদিন ঝড়ের সময়ে শুনেছি 'হু—হু' শব্দ হচ্ছিল।" "সে ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। এমন অবশ্য এতে আমাদের কাজ দিল, কিন্তু তখন করেছিলাম তোমাকেই ভয় দেখাবার জন্য। মন্দ যারা তারা সবাইকে মন্দ মনে করে। আমার নিজের মনে যখন মতলব এল, দুজনে যাবার আগেই একলা গিয়ে ঘড়াগুলো নিয়ে আস্‌ব, তখন মনে হ'ল তুমিও ত এই মতলব কর্‌তে পার। তখন জ্বর তোমার বেশী ছিলনা। আমি কর্‌লাম কি, দু তিনটা বড় বড় বাঁশের চোঙ্গা কেটে এমন ক'রে বাঁধলাম যে, তার ভিতর দিয়ে জোরে বাতাস গেলে বিকট আওয়াজ হয়। সেগুলোকে মন্দিরের বাঁশ ঝাড়ে ঝুলিয়ে দিলাম। একে বাঁশ ঝাড়েই নানারকম শব্দ হয়, তাতে এই চোঙ্গাগুলো থাকাতে অদ্ভুত শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। গ্রামের লোকেরা পর্য্যন্ত সে শব্দ শুনে ভয় পেয়েছে। ভাই, আমি কত



লোচন চরণকে কাঁধে বহিতেছে

দুষ্টু দেখ্‌লেই ত; আমি এ টাকা কিছুতেই নিতে পার্‌ব না।" লোচন সে সব কথা শুনিল না, সে বলিল, "আচ্ছা, বন্ধুর উপহার বলেও অন্ততঃ নাও।"

শ্রীসুখলতা রাও।

উতঙ্ক-মেঘ

(মহাভারত)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজা হইলেন। যুদ্ধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ হস্তিনায় ছিলেন; যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হইলে, তিনি সকলের নিকট বিদায় হইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে ক্রমে তাঁহার রথ মরুধন্ব প্রদেশে উপস্তিত হইল।

মরুধন্ব প্রদেশে মহর্ষি উতঙ্ক তপস্যা করিতেন, তাঁহার আশ্রম ছিল মরুভূমিতে। মহর্ষি উতঙ্কের সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল। তিনি মহর্ষিকে পূজা অর্চ্চনা করিলে পর, উতঙ্ক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুরুপাণ্ডবদিগের মঙ্গল ত? তুমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের মধ্যে প্রণয় স্থাপন করিয়া ফিরিতেছ?" কৃষ্ণ বলিলেন—"আমি কুরুপাণ্ডবের মিলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৌরবগণ কিছুতেই আমার কথা শুনিল না, তাহারা যুদ্ধই করিল। আর যুদ্ধে কুরুকুল একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে কেবল যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাঁচজন মাত্র বাঁচিয়া আছেন।"

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া মহর্ষি উতঙ্কের দারুণ রাগ হইল। তিনি বলিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি ইচ্ছা করিলে বলপূর্ব্বক কৌরবদিগকে বারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি কর নাই, কাজেই, কুরুকুল ধ্বংসের জন্য তুমিই দায়ী—অতএব, আমি তোমাকে শাপ দিব।"

তখন কৃষ্ণ বলিলেন—"মুনিঠাকুর! আমাকে শাপ দিবেন না, আপনি ক্রোধ দূর করুন। বুদ্ধি কিংবা বল দ্বারা কেহ কোন দিন অদৃষ্টকে ছাড়াইতে পারে না। আপনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু তপস্যার বল দ্বারা আমাকে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। বিশেষতঃ, আমাকে শাপ দিলে আপনার আজীবন তপস্যার ফল নষ্ট হইবে। সুতরাং আপনি রাগ দূর করিয়া শান্ত হউন।"

কৃষ্ণের কথায় মহর্ষি উতঙ্কের ক্রোধ দূর হইল। তিনি যোগবলে বুঝিতে

পারিলেন, যে, দুরাত্মা কৌরবগণ তাহাদের কুবুদ্ধির দোষেই বিনষ্ট হইয়াছে। তখন বলিলেন—"বাসুদেব! তুমি জগতের মালিক, আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তোমাকে শাপ দিবার একটুও ইচ্ছা নাই।"

কৃষ্ণ বলিলেন—"মুনিঠাকুর! আমিও আপনার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন আমার নিকট বর প্রার্থনা করুন।" কিন্তু মহর্ষি কিছুতেই বর লইতে রাজি হইলেন না। কৃষ্ণও সহজে ছাড়িলেন না, বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শেষে মহর্ষি বলিলেন—"বাসুদেব! নিতান্তই যদি আমাকে বর দিতে চাও, তবে এই বর দাও—যেন আমি ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে অনায়াসে জল পাইতে পারি।" কৃষ্ণ বলিলেন—"বেশ, তাহাই হইবে। আপনার জলের আবশ্যক হইলেই আমাকে স্মরণ করিবেন।" এই বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকার পথে রথ চালাইয়া দিলেন।



চণ্ডাল ও উতঙ্ক মুনি

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, মহর্ষি উতঙ্ক একদিন মরুভূমিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া তৃষ্ণায় খুব কাতর হইলেন। কোথাও জলের সন্ধান না পাইয়া, শেষে হটাৎ বরের কথা মনে পড়িয়া গেল, আর অমনি কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। এই সময়ে হটাৎ দেখিতে পাইলেন, একজন ভীষণ আকার চণ্ডাল, তাহার পিঠে তূণ, হাতে ধনুক, সঙ্গে অনেকগুলি কুকুর—সেই চণ্ডাল তাঁহার দিকেই আসিতেছে। চণ্ডালের হাতে একটি জলপাত্র। সেও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাই সেই পাত্র হইতে জল পান করিতে করিতে তাঁহার নিকটে

আসিয়া উপস্থিত হইল। মহর্ষিকেও পিপাসার্ত্ত দেখিয়া চণ্ডালের দয়া হইল; সে তাহার পাত্রটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"ঠাকুর! আপনিও দেখিতেছি তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছেন। আমার এই পাত্রের জল পান করুন।"

নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইলেও, চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে মহর্ষি উতঙ্ক কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি ঘৃণার সহিত চণ্ডালের দান অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু চণ্ডাল বারবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। শেষে মহর্ষি যখন রাগিয়া উঠিলেন, তখন হঠাৎ চণ্ডাল কুকুরগুলির সহিত অন্তর্হিত হইল। তখন মহর্ষি বুঝিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়াছেন ভাবিয়া, বড়ই লজ্জিত হইলেন।

চণ্ডাল অন্তর্হিত হইবার একটু পরেই, শঙ্খ, চক্র গদাধারী কৃষ্ণ উতঙ্কের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তখন মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন—"ঠাকুর! তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট জল প্রদান করা তোমার উচিত হয় নাই।" মহর্ষির দুঃখ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—"মুনিঠাকুর! মানুষকে প্রকাশ্যভাবে অমৃত দেওয়া উচিত নয়। সেই আমি চণ্ডালরূপী ইন্দ্রকে দিয়া আপনার নিকট অমৃত পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু আপনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি আপনার হিতকারী, তাই দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলাম আপনাকে অমৃত দিতে। ইন্দ্র প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষকে অমৃত দিয়া অমর করা উচিত নয়। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধে শেষে তিনি বলিয়াছিলেন—'যদি মহর্ষি উতঙ্ককে অমৃত দান করা তোমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমাকে রাজি হইতেই হইবে। কিন্তু আমি চণ্ডালের রূপ ধরিয়া উতঙ্ককে অমৃত দিতে যাইব। তিনি যদি চণ্ডালের দেওয়া অমৃত পান করিতে সম্মত হন, ভালই, নতুবা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনিই ঠকিবেন।'

দেবরাজ আমার সঙ্গে এইরূপ সর্ত্ত করিয়া, আপনার নিকট চণ্ডালবেশে অমৃতের পাত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে অবহেলা করিয়া নিতান্তই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। যাহা হউক, এখন আপনাকে আমি আবার বর দিতেছি, যে, আপনি জল পাইবার ইচ্ছা করিলেই, এই মরুভূমিতে সুমিষ্ট বারি বর্ষণ হইবে। আর পৃথিবীতে সেই মেঘের নাম হইবে "উতঙ্ক-মেঘ।"

এখন পর্য্যন্ত নাকি "উতঙ্ক-মেঘ" সেই মরুভূমিতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

চিনির কথা

পাতে যখন নুন খাই, বড় জোর এক চামচ খাই—কিন্তু, যখন দুধে কিম্বা চায়ে, কিম্বা অন্য কিছুতে চিনি খাই, তখন আর এক চামচে কুলায় না—কেউ খায় দু'চামচ, কেউ খায় তিন চামচ,—কেউ হয়ত তারও বেশী খায়। তা'ছাড়া সন্দেশ, মিঠাই, মণ্ডা, খাজা, গজা, লজঞ্চুষ, সরবৎ, কুল্‌পি বরফ,—আরো কত কিছুতে যে চিনি খাই তার ঠিক নেই।

আমাদের গরীব দেশে হয়তো ঢের লোকে কোন দিনই চিনি খেতে পায় না; অন্যান্য দেশেও সে রকম লক্ষ লক্ষ লোক আছে; কিন্তু, যারা প্রতিদিনই দুধে, চায়ে, সরবতে, মণ্ডা, মিঠাই, মিষ্টিতে, চিনি খেয়ে থাকে, তাদের সংখ্যাও বড় কম হবে না। পৃথিবীতে এই রকমের কত কোটি কোটি লোক আছে তার হিসাব কে রাখে? একবার ভেবে দেখতো, এইসব লোকের চিনির খোরাক জোটান কি বিরাট ব্যাপার!

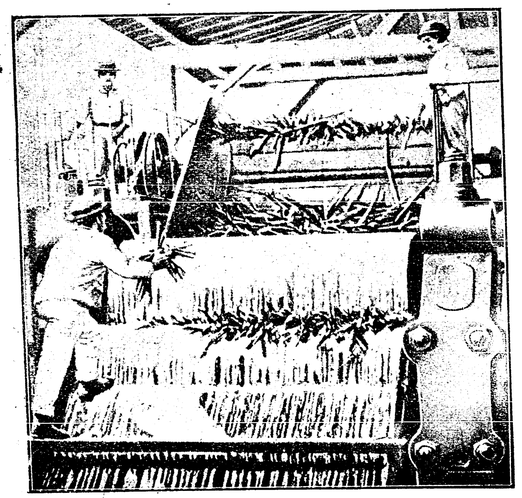

আখ-মাড়া কল

প্রত্যেকে যদি গড়ে এক ছটাক চিনিও প্রতিদিন খায় তা' হ'লে ৬৪০ জন লোকে এক মণ চিনি একদিনে খাবে। এক হাজার লোকে মোটামুটি ১৷৷০ মণ চিনি খাবে প্রতিদিন। তা হলে, পৃথিবীর কোটি কোটি চিনি-খোর প্রতিদিন কত লক্ষ মণ চিনি খাবে একবার ভেবে দেখ তো?

আখ আর বিট-পালং হ'লো চিনির প্রধান উপাদান। জামাইকা, কিউবা বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে আখের চাষ হয়। জাভা-দ্বীপে বিট-পালংএর চাষ খুব প্রচুর পরিমাণে হ'য়ে থাকে। তা' ছাড়া ইউরোপের কোন কোন দেশেও (ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী প্রভৃতি) বিট-পালংএর

চাষ হয়। ভারতবর্ষে, ইজিপ্টে আর আফ্রিকার কোন কোন দেশেও আখের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হয়।

আখের রস প্রথমে আখ-মাড়া কল দিয়ে চিপে বের করা হয়। বড় বড় কারখানায় এই কাজটি কত বড় বিরাট আকারের কলের সাহায্যে করা হয়, তা' এই ছবিটি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। দোতালার সমান উঁচু কল, তার মধ্যে একবারে হাজার আখের ডাঁটা মড়্‌ মড়্‌ ক'রে ভেঙে চিপে, পিষে রস বের করা হয়! কলের পাশে যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে কলটা কত বড়।

আখের রসকে জ্বাল দিয়ে ঘন ক'রে, তা'র থেকে চিনির দানা বের করা হয়।

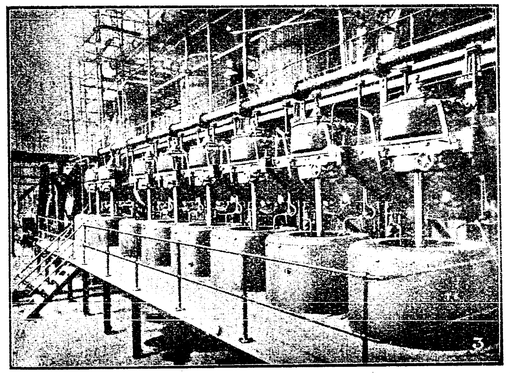

প্রকাণ্ড পাত্রে গরম ঘন রস ঢেলে দিয়ে পাত্রটাকে বন্‌ বন্‌ ক'রে ঘোরান হয়। রস আস্তে আস্তে ঠাণ্ডাও হ'তে থাকে আর চিনির দানাও জম্‌তে থাকে। ছবিতে দেখ, চিনির কারখানায় সারি সারি দানা-জমান পাত্র রয়েছে। এক একটা এত বড় যে, তোমাদের দু' চারজন অনায়াসে তার মধ্যে বসে খেলা কর্‌তে পারে।

দানা জমান হয়ে গেলে, সেই দানা-চিনি বস্তাবন্দি ক'রে চালান দেওয়া হয়। আবার কখনও সেই দানাকে জলে গুলে, আরও পরিষ্কার দানা জমিয়ে সাদা চিনি তৈরী করা হয়। পরিষ্কার সাদা চিনির আদর বিলাতে খুব বেশী। জাহাজের খোলে বোঝাই ক'রে হাজার হাজার মণ চিনি অনেক সময় বিলাতে চালান হয়। ছবিতে দেখ, প্রকাণ্ড নল লাগিয়ে জাহাজের খোল থেকে চিনির ঢিপিকে শুষে পরিষ্কার ক'রে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। লম্বা নলের ভিতর দিয়ে ঐ চিনি একেবারে সোজা গিয়ে চিনির গোলায়

হাজির হবে। সেখানে একে সুন্দর ঠোঙায় কিম্বা বস্তায় ভ'রে পাইকারদের কাছে বিক্রীর জন্য পাঠান হবে।



গত যুদ্ধের সময় যখন চিনির খুব অভাব হয়েছিল, তখন নানা জনে নানা জিনিষ থেকে চিনি বের কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলেন। একজন নাকি মিষ্টি কুমড়ো থেকে চিনি বের কর্‌বার উপায় বের ক'রেছিলেন। কুমড়োর চেহারার উপযুক্ত পরিমাণ চিনি তা' থেকে পাওয়া গেলে তো কোন কথাই নাই,—কিন্তু, সে বিষয়েই সন্দেহ।

শ্রীসুবিনয় রায়।

লক্ষ্মী ছেলে

এক বেজায় জ্যাঠা ছেলে ছিল। যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন, ততদিন সে লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে টো টো করে বেড়িয়েছে। শেষটায় যখন বাবা মারা গেলেন, তখন ছেলে ভারি বিপদে পড়্‌ল। কি করে! লেখাপড়া ত আর বেশী জানে না, যে কাজ করে খাবে? তখন সে ভাব্‌ল, "আমার ত আর আত্মীয় স্বজন কেউ নাই! শুধু আছেন মামা। তিনি আবার আমার উপরে চটা! কি আর করি? তাঁর কাছেই যাই।" এই না ভেবে সেই দিনই দুপুর বেলা সে মামা-বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। মামা এদিকে খেয়ে-দেয়ে দিব্যি ঘুম দিচ্ছেন। তার চেঁচা-মেচিতে তাঁর কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি চটে বল্লেন—"হতভাগা! কি কর্‌তে এসেছিস? কি চাস্?" "আজ্ঞে এখানে থাক্‌তে এসেছি।" মামা আর কি করেন বল্‌লেন—"আচ্ছা থাক্! দেখিস্ বাঁদরামি করিস্ না।"

সেখানে সে বেশ আছে। খায় দায় ঘুম দেয়। একদিন তার মামী বল্‌লেন —"ঐ হাঁড়ীতে রসগোল্লা আছে, দেখিস্ কেউ যেন খায় না।" এই ব'লে যেই মামী অন্য ঘরে গেছেন, শ্রীমান্ সব রসগোল্লা গিলেটিলে বসে আছেন।

একটু পরেই মামী ফিরে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কে রসগোল্লা খেয়েছে রে?" ছেলে সাধুর মতন বল্‌ল—"আজ্ঞে আমি।" "কেন রে?" "ক্ষিদে পেয়েছিল বলে।"

মামী এ এসব দেখে হাড়ে হাড়ে চটে গেলেন। ঠিক কর্‌লেন, তাকে তাড়াতে হবে। তখন ছেলে ভাব্‌ল—"তাই ত, মামীকে একটু খুসী কর্‌তে হবে।"

একদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল, যাতে মামীর মত একেবারে উল্টে গেল। তখন বোধ হয় রাত একটা হবে, হঠাৎ মামার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। তাঁর মনে হল ঘরের ভিতর কে যেন খচ্‌মচ্ কর্‌ছে। ভয়ে তাঁর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। টাক্ মাথায় চুল ক'টা খাড়া হয়ে গেল কপালে ঘাম দেখা দিল।

অতি কষ্টে বল্‌লেন—"কে রে?" তবু কোন উত্তর না পেয়ে "চোর চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। অম্নি কে জানি হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। এমন সময় শুন্‌তে পেলেন বাইরে ছেলেটা বল্‌ছে, "কে মশাই? না বলে চুরী কর্‌তে এসেছেন কেন? বলে এলেই ত পার্‌তেন, তা'হলে জিনিষ সব বের ক'রে রাখ্‌তাম; আপনি শুধু নিয়ে যেতেন।"

মামী বল্‌লেন—"দেখ না, গিয়ে কে?" মামা লেপের তলায় মাথা ঢুকিয়ে শুয়ে ছিলেন, আস্তে আস্তে উঠে দরজাটা একটু ফাঁক করেই দরাম্ করে বন্ধ করে দিয়ে, এক দৌড়ে আবার লেপের তলায় ঢুক্‌লেন। মামী শুন্‌লেন ছেলেটা আবার বল্‌ছে—"চৌবাচ্চায় নাব্‌বেন মশাই? গরমের দিন, আরাম লাগ্‌বে। তাছাড়া, সাঁতার শেখা ভাল, যদি কখন জলে"—

তারপর ঝপাং করে একটা শব্দ হ'ল আর মনে হ'ল, একটা ভারি জিনিষ জলে পড়্‌ল! আর ভীষণ জল ছিট্‌কানর শব্দ।

মামী আবার ডেকে বল্‌লেন—"ওগো দেখ না গিয়ে কি হয়েছে।" মামা আবার মাথাটা একবার বের করে তক্ষুণি ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর উঠে দরজাটা ফাঁক করে নাকটা বের করে দিলেন, বের করেই আবার ঢুকিয়ে নিয়ে দৌড়ে খাটে উঠ্‌লেন গিয়ে। তারপর সেই যে দেয়ালের দিকে ফিরে শুলেন্না নিয়ে আমি চ্যাঁচামেচিতেও টু শব্দটি কর্‌লেন না।

এদিকে জলের শব্দ থেমে গিয়েছে। ছেলেটা জানি কি একটাতে লাথি মেরে বল্‌ল—"যান, মশাই! বাড়ী যান!" তারপর সব চুপ্ চাপ।

খানিক বাদে আবার ছেলেটি এসে ডাক্‌ল—"ভয় নাই মামা! বেরিয়ে আসুন্। সে ভেগেছে।"

হঠাৎ মামার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি দৌড়ে বাইরে গিয়ে ছেলেকে ধরে যা আদর! মামীরও রাগ চলে গেছে। কি সাহসী ছেলে! যদি চোরটা কাম্‌ড়িয়ে দিত বা পা মচ্‌কে দিত।

তার পর দিন মামী কতগুলো ভিজে কাপড় দেখে ছেলেটাকে বল্‌লেন—"ওকি! তোমার কাপড় ভিজ্‌ল কি করে?" সে বল্‌ল—"কাল রাত্রে চোরটা জল ছিট্‌কিয়ে দিয়েছিল। মামী বল্‌লেন—"আহা! যদি নিউমোনিয়া হ'ত!"

তখন হতে আর ছেলের আদরের সীমা নাই।

শ্রীলীলা রায়।

অতি লোভের সাজা

(তুরস্কের উপকথা)

ডামাস্কাস্ নগরে হাসান নামে একটি যুবক ছিল—সে যেমন সুপুরুষ তেমনি গুণবান্, আর তার স্বভাবটি ছিল তেমনই মিষ্টি। বিশেষতঃ বাঁশী বাজাইতে এবং গান গাহিতে হাসানের তুল্য আর কেহই নিপুণ ছিল না। সে জন্য ডামাস্কাস্ নগরের সকলেই তাহাকে খুব ভালবাসিত। হাসানদের পরিবারে সে নিজে, তাহার পিতা এবং বিমাতা এই তিনটি প্রাণী। পিতা হাসানকে একটি মনোহারী দোকান করিয়া দিয়াছিলেন—সেই দোকানের আয় দ্বারাই তাহাদের সংসার চলিত। নগরের মান্যগণ্য লোকেরা তাঁহাদের দরকারী জিনিষপত্রের জন্য, হাসানের দোকান ছাড়া অন্যত্র যাইতেন না। শুধু তাহাই নহে, জিনিষ কিনিতে আসিয়া সকলে হাসানের মিষ্ট ব্যবহারে এবং তাহার গান ও বাঁশী শুনিয়া এমনই খুসী হইতেন, যে, সকলেই ক্রীত জিনিষের তিন চারি গুণ মূল্য দিতেন। এইরূপে হাসানের পিতা গুণবান্ পুত্রের কল্যাণে বেশ দুপয়সা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পদ্মনাভ নামে এক ব্রাহ্মণ হাসানের দোকানে আসিলেন। হাসানের গান শুনিয়া ব্রাহ্মণের মন গলিল, এবং যাইবার সময় তিনি

তাহার হাতে দুইটি টাকা দিয়া তাহাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। তখন হইতে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন হাসানের দোকানে আসিয়া তাহার গান বাঁশী শুনেন আর দুইটি করিয়া টাকা দিয়া চলিয়া যান।

এই ভাবে কিছুদিন গেলে পর, হাসান তাহার পিতার নিকট ব্রাহ্মণের কথা বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধ যেমন বিস্মিত হইলেন, তেমনি তাঁহার মনে সন্দেহও হইল। পুত্রকে বলিলেন—"বাবা! আমার বোধ হয় ব্রাহ্মণের মনে কোন দুষ্ট মতলব আছে, নতুবা রোজ কেন সে মিছামিছি তোমাকে টাকা দিয়ে যায়? যাহোক্, ব্রাহ্মণ আবার এলে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বলো। আরো বলো, যে, তিনি আমার বাড়ীতে এলে আমি খুব খুসী হব। তাঁর সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা বল্‌লেই, তাঁর মতলব বুঝ্‌তে পার্‌ব।"

পরদিন ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ হাসানের দোকানে আসিলে, হাসান তাঁহাকে পিতার অনুরোধ জানাইল। ব্রাহ্মণ রাজি হইলেন, হাসান তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া গেল। হাসানের পিতা ক্ষণকাল পদ্মনাভের সহিত আলাপ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহার মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। অধিকন্তু, পদ্মনাভের ভদ্রতা ও উদারতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহাশয়! আমার নাম পদ্মনাভ, আমি বিদেশী লোক—কোন বিশেষ কাজে এখানে আমাকে আস্‌তে হয়েছে এবং কিছুদিন আমাকে এই নগরে থাক্‌তে হবে।" ইহা শুনিয়া হাসানের পিতা মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তা যদ্দি হয়, তবে দয়া করে আমার বাড়ীতে এ কয়দিন থাকুন, আপনার কোন রকম কষ্ট হবে না আপনার সেবা ক'রে আমরা ধন্য হব।" পদ্মনাভ সন্তুষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন।

হাসানের ও তাহার পিতার সেবা যত্নে পদ্মনাভ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে পর, একদিন পদ্মনাভ গোপনে হাসানকে বলিলেন—"বৎস হাসান! তোমার স্বভাবে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি কতগুলি গুপ্ত বিদ্যা জানি, সেই সব বিদ্যা তোমাকে শিখিয়ে দিব, আর তোমাকে সকলের চেয়ে ধনী ক'রে সুখী কর্‌ব, তাই আমার ইচ্ছা। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে কতগুলি গুপ্তধন তোমাকে আমি দান কর্‌ব।"

হাসান বলিল—"মহাশয়! আপনি আমাকে খুব স্নেহ করেন, আমার উপকার করাই আপনার ইচ্ছা তা আমি বেশ জানি। কিন্তু পিতার অনুমতি না নিয়ে আমি

TORN PAGE(S).

কি করে যাব ?" তখন পদ্মনাভ হাসানের পিতাকে সব কথা বলিলে, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলেন। হাসান মহা খুসী হইয়া পদ্মনাভের সহিত যাত্রা করিল।

ক্রমে তাঁহারা নগর পার হইয়া জনশূন্য এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, হাসান দেখিল, সম্মুখে একটি অতি পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা। অট্টালিকার নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ। পদ্মনাভ বলিলেন—"বৎস! "এই কুয়ার মধ্যে অতুল গুপ্তধন আছে, সমস্ত তোমাকে দান কর্‌ব।" হাসান বলিল—"কূয়া যে দেখ্‌ছি জলপূর্ণ, কি করে নাম্‌ব ?"



পদ্মনাভ বলিলেন—"বৎস! বিস্মিত হয়ো না, ঐশী শক্তির বলে সব কাজই সিদ্ধ হয়।" এই বলিয়া পদ্মনাভ একখণ্ড কাগজে একটি মন্ত্র লিখিয়া কূয়ার জলে ফেলিবামাত্র, জল শুকাইয়া গেল। হাসান দেখিল, কূয়ার মধ্যে সুন্দর সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। তখন পদ্মনাভ হাসানের সহিত সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিছুদূর গেলে পর প্রকাণ্ড তামার কপাট দেখা গেল। পদ্মনাভ আবার কাগজে মন্ত্র লিখিয়া কপাটে ছোঁয়াইলেন, কপাট খুলিয়া গেল। সেই দরজা দিয়া দুইজনে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই দেখিলেন—বিকটাকার একটা বিদ্‌ঘুটে কাল লোক প্রকাণ্ড পাথর হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই ত ভয়ে হাসানের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পদ্মনাভ বিড় বিড় করিয়া একটা মন্ত্র পড়িলেন, আর তখনই সেই বিকটাকার লোকটা অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

পদ্মনাভ হাসানকে লইয়া সেই ঘর পার হইলেন। পার হইয়া আর একটা ঘরের দরজায় উপস্থিত হইলে দেখা গেল, ভীষণ দুইটা বাঘ দরজায় প্রহরী, তাহাদের মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইতেছে! পদ্মনাভ আবার একটা মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র, বাঘ দুইটা অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি হাসানকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরে রাশি রাশি রত্ন, ঘরের মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা চুনী পাথর, তাহা যেন সূর্য্যের মত জ্বলিতেছে। সেই ঘর পার হইয়া তাঁহারা আর একটি ঘরে গেলেন। সেই ঘরের মধ্যে হীরা, মতি, চুনী, পান্না, মণি, মুক্তা, সোণা রূপা স্তূপাকারে সাজান রহিয়াছে। আর একটা রূপার সিন্ধুকের মধ্যে এক রাজার মৃতদেহ!

হাসান অবাক্ হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়! সিন্ধুকের মধ্যে যে মৃতদেহ দেখ্‌ছি, ইনি কে ?" পদ্মনাভ বলিলেন—"ইনি পূর্ব্বে মিসরদেশের রাজা ছিলেন। ইনি অনেক রকম গুপ্ত বিদ্যা জান্‌তেন এবং সেই বিদ্যার বলে এই নির্জ্জন স্থানটিতে সোণার পুরী তৈরি করেছিলেন। এই অগাধ ধনরাশি তাঁহারই বিদ্যাবলে সঞ্চিত; আর ঐ যে পশ্চিম দিকে কাল্ রংএর মাটি সঞ্চিত দেখ্‌ছ, এই মাটির গুণের কথা শুন্‌লে বিস্ময়ের সীমা থাক্‌বে না। ঘরের কোণে ঐ যে, রূপার পাত্রগুলি দেখ্‌ছ, তাতে পরিষ্কার টল্‌টলে জল আছে। খানিকটা এই কাল মাটি এই জলে ভিজিয়ে রাখ্‌লে, একটু পরেই সব সোণা হয়ে যায়! যে কোন সামান্য পাথরে এই মাটি ছোঁয়ালে পর, তা মহামূল্য পাথর হয়ে যাবে। বৎস! এই মাটি যদি খানিকটা নিয়ে যাও, তবে সমস্ত মিসর দেশটা হীরায় মুড়িয়া দিতে পার্‌বে। এই মাটির আরো গুণ এই, যে—যে কোন রোগী হোক্ না কেন, এই মাটি খেলে তৎক্ষণাৎ তার রোগ দূর হয়। আর এই মাটির প্রলেপ চোখে লাগালে, পৃথিবীর সমস্ত দৈত্য দানব তার বশীভূত হয়। বৎস! এখন ভেবে দেখ, আমি তোমাকে কত ধনের অধিকারী কর্‌লাম।"

হাসান আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া পদ্মনাভকে বলিল—"প্রভো! আপনার দয়ার সীমা নাই। এখন যদি অনুমতি করেন, তবে এই ধনের কিঞ্চিৎ নিয়ে গিয়ে মা বাবাকে সুখী কর্‌তে পারি।" পদ্মনাভ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলেন।

তখন হাসান পদ্মনাভকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া, ইচ্ছামত নানা রকম রত্ন গ্রহণ করিল। তারপর পদ্মনাভ তাহাকে লইয়া কূয়া হইতে উঠিয়া আসিলেন।

তখন হাসান মহা বিস্মিত হইয়া দেখিল, যে, আবার কূয়াটি জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

ইহার পর পদ্মনাভ হাসানকে লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। হাসানের নিকট সেই অমূল্য রত্ন সকল দেখিয়া, তাহার জনক জননীর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। তখন হইতে মনোহারী দোকান তুলিয়া দিয়া, হাসান পিতা মাতার সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

বিমাতাকে হাসান আপন মায়ের মত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার বিমাতা ছিলেন ভারি দুষ্ট স্ত্রীলোক। হাসান যে ধন আনিয়াছিল তাহা দ্বারা তাহারা আজীবন পরমসুখে থাকিতে পারিত। কিন্তু বিমাতার মনে দারুণ লোভের সঞ্চার হইল। তিনি একদিন হাসানকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"বাছা, হাসান! তুমি অগাধ ধন এনেছ, তা ঠিক! কিন্তু ক্রমাগত খরচ কর্‌তে কর্‌তে সে ধন আর কত দিন থাক্‌বে? যাহোক্, আমি তোমার ভালর জন্য একটা যুক্তি ঠিক করেছি—শুন। পদ্মনাভ তোমাকে পুত্রের চাইতেও বেশী স্নেহ করেন। তুমি তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বিদ্যা শিখে নাও। তারপর তাঁকে কোন রকমে মেরে ফেল্‌তে পার্‌লে আর আমাদের চিন্তার কারণই থাক্‌বে না। তখন ইচ্ছা মত যখন খুসী গিয়ে কূয়ার ধন নিয়ে আস্‌তে পার্‌ব। মানুষ ত আর চিরদিন কেউ বেঁচে থাক্‌বে না? পদ্মনাভও বৃদ্ধ হয়েছেন—এই বেলা একটা কিছু ব্যবস্থা করে রাখাই মঙ্গল।"

বিমাতার দুরভিসন্ধি শুনিয়া হাসানের চক্ষু স্থির হইয়া গেল! ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—"মা! আপনি এমন জঘন্য কথা আর মুখে আন্‌বেন না। আমি যে ধন এনেছি, রাজার ভাণ্ডারেও তা আছে কিনা সন্দেহ। আর যদি এ ধন ফুরিয়েও যায়, তাতেই বা চিন্তার কারণ কি? আমি বল্‌বামাত্র ব্রাহ্মণ আমাকে আবার সেখানে নিয়ে যাবেন, আমি ইচ্ছামত ধন আন্‌তে পার্‌ব। আপনি কখনও এরূপ লোভ কর্‌বেন না। যিনি রাতদিন আমার মঙ্গলকামনা করেন, যাঁর কল্যাণে অগাধ ধন পেয়ে আমরা পরমসুখে আছি—তাঁকেই মেরে ফেল্‌তে পরামর্শ দিচ্ছেন? আমাদ্বারা এরূপ জঘন্য পাপ কাজ কখনই হবে না।"

কিন্তু হায়! বিমাতা হাসানকে নানা রকম যুক্তি দেখাইয়া, শেষে তাহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, যে, সাধু-হৃদয় হাসানের মনেও দারুণ লোভের

সঞ্চার হইল, সে বিমাতার পরামর্শে সায় না দিয়া আর পারিল না। তখন সে ধীরে ধীরে পদ্মনাভের নিকটে গিয়া তাঁহার গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা জানাইল। বলা বাহুল্য, প্রার্থনা করামাত্র পদ্মনাভও সম্মত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই হাসান পদ্মনাভের সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিল। তখন তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। হাসান পদ্মনাভের সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছে শুনিয়া, পাপীয়সী বিমাতা ভারি খুসী হইলেন।

তারপর একদিন হাসান, পিতা ও বিমাতার সহিত সেই গুপ্ত-ধনাগারে যাত্রা করিল। কূয়ার নিকটে গিয়া হাসান মন্ত্র-লেখা কাগজ জলে ফেলিবামাত্র, কূয়ার জল শুকাইয়া গেল। তখন সিঁড়ি দিয়া তিনজনে নীচে নামিলেন। সেই তামার কপাটের নিকট উপস্থিত হইয়া হাসান মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর, কপাট খুলিয়া গেল। সকলে যেমন ঘরে ঢুকিয়াছেন, অমনি সেই বিকটাকার কাল লোকটি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল এবং হাসানও মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র সে একেবারে অজ্ঞান।

ঘরে ঢুকিবামাত্র সেই ভীষণ দুই বাঘ মহা গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। হাসান আবার মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর বাঘ দুটিকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন আর কথা কি? তিনজনে মিলিয়া রাশি রাশি নানা রকমের রত্ন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এক একজনের পুঁটুলি গুরুতর ভারি হইল। অবশেষে অতি কষ্টে পুঁটুলি মাথায় লইয়া তিন জন ঘর হইতে বাহির হইবেন, এমন সময় অতি ভয়ঙ্কর তিনটি মহা বলবান্ দৈত্য তাঁহাদিগের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল!

ভয়ে হাসানের শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দৈত্য বশ করিবার মন্ত্র ত সে শিখে নাই—এখন উপায়? এখন যোড় হস্তে দৈত্যের স্তব করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে? কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, হাসান বিমাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল—"পাপীয়সি! তোর পরামর্শে পড়েই এই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছি। নিশ্চয় পদ্মনাভ আমাদের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে, আমাদের মার্‌বার জন্য এই দৈত্য পাঠিয়েছেন।"

এই সময়ে হঠাৎ গম্ভীর স্বরে দৈববাণী হইল—"অকৃতজ্ঞ নরাধম! তোকে পুত্রের সমান ভালবেসে আমার সব বিদ্যা শিখিয়েছিলাম। তার প্রতিদানে, আমাকে মেরে এই অতুল ধন ভোগ কর্‌বি ভেবেছিলি—এখন তার ফল ভোগ কর্। বিদ্যাবলে

তোদের দুষ্ট মতলব জান্‌তে পেরে আমিই এই দৈত্য পাঠিয়েছি, তোদের সাজা দেবার জন্য।”

এই দৈববাণী শেষ হইবামাত্র, দৈত্যেরা তিন জনেরই প্রাণ বধ করিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

গাছ ত নয়—কুমীর

সৌখীন্ এক বানর ছিল, ছুট্‌লো নদীর ধার,
ক্যামেরাতে তুল্‌তে ফটো উৎসাহ কি তার!
এদিক্ ওদিক্ চেয়ে শেষে, দেখ্‌লে অতি কাছে,
গাছের মত কি যেন এক প'ড়ে সেথায় আছে।
অম্‌নি কাজে লেগে গেল, কাপড় দিল ঢাকা,
ফোকাস্ ঠিক করে নিল, ঘুরিয়ে কলের চাকা।
তার পরে যা দেখ্‌লে বানর—ভয়েতে ঘাম ছোটে,
গাছ বলে যা ভেবেছিল, গাছ নয় সে মোটে।
গাছের মত কুমীর সেটা, লম্বে আশী হাত,
নোড়ার মত বড় বড় ছুঁচলো তার দাঁত।
প'ড়েছে হায় যমের মুখে, বিশাল তাহার হাঁ,
ঠক্ ঠক্ ঠক্ কাঁপে বানর, মুখে নাইক রা।
ভয়ে যেন হতভম্ব, নাই বুদ্ধি বল,
আকাশ পাতাল কতই ভাবে, চক্ষে ঝরে জল।
ভাব্‌লে কি আর হবে মিছে, বাঁচ্‌তে যদি চাও,
নাক, কাণে না খৎটি দিয়ে, চোঁচা দৌড় দাও।
ছুট্‌ছে যারা প্রাণের দায়ে, বুক্‌টি চেপে হাতে,
পালাও বাপু, পাল্লা দিয়ে ছুটে তাদের সাথে।
এখন থেকে ভেবে চিন্তে হাতটি দিও কাজে,
মনে রেখো, যার কর্ম্ম তারেই শুধু সাজে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।



গাছ ত নয়—কুমীর

সাহসের কায

মার্টিনেল একজন ফরাসী সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। ফ্রান্সে অনেক বড় বড় সেনাপতি জন্মিয়াছেন, তাঁরা বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন। মার্টিনেল সে রমক কিছু করেননি, কিন্তু তিনি এমন কতকগুলি ভাল কায করে-ছিলেন যার জন্য ফ্রান্সের লোকে তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাস্ বুর্গের এক দুর্গে আগুন লাগে। যে ঘরে আগুন লেগেছিল, ঠিক তার উপরের ঘরে ৯ জন রোগী ছল। তাদের পালিয়ে যাবার মত অবস্থ ছিল না। দুর্গের সৈন্যেরা নিজেদের প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত, রোগীদের কথা তাদের একবারও মনে হ'ল না। সকলেই রোগীদের ফেলে বাইরে পালিয়ে এল। যে ঘরে আগুন লেগেছিল ঠিক তার পাশের ঘরেই এক গাদা বারুদ্; আগুন যদি সেখানে পৌঁছায় ত এক ভীষণ কাণ্ড ঘট্‌বে, রোগীদেরও বাঁচাবার কোন সম্ভাবনা থাক্‌বে না। সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌ছে, কেউ সাহস ক'রে দুর্গের ভিতরে যাচ্ছে না।

এমন সময় মার্টিনেল সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি ব্যাপার দেখেই কয়েকজন সাহসী লোককে সঙ্গে নিয়ে, দুর্গের মধ্যে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক দূর উঠ্‌তেই ধোঁয়ায় আর গরমে তাঁদের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল্। তখন মার্টিনেল সঙ্গের লোকদের ফিরিয়ে দিয়ে, একা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। অনেক কষ্টে আগুনের ঘরের কাছে এসে দেখেন যে, ঘরের দরজা খিল দিয়ে বন্ধ করা রয়েছে। তখন তিনি একখানা বেঞ্চ্ তুলে নিয়ে তাই দিয়ে দরজায় ক্রমাগত ঘা দিতে লাগ্‌লেন। খুব জোরে কয়েকবার আঘাত করার পর দরজা ভেঙ্গে গেল।

তিনি দেখ্‌লেন যে, আগুন ক্রমেই বারুদের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগুনের ভিতর দিয়ে তিনি বারুদের ঘরে যাবার চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু উপরের ঘরের রোগীদের কথা মনে হওয়া মাত্র, তিনি চোখ মুখ বুজে এক দৌড়ে আগুন পার হয়ে, বারুদের ঘরে ঢুক্‌লেন। তাঁর সমস্ত শরীরে ফোস্কা পড়ে গেল। তিনি সে সব একেবারেই গ্রাহ্য না ক'রে বারুদের ঘরের জানালা খুলে, রাস্তার লোকদের ডেকে বল্লেন, "এখনও

সময় আছে, তোমরা আগুনের ঘরে যত পার জল ঢাল, আগুন নিবে যাবে।" তখন লোকেরা সাহস পেয়ে আগুনের ঘরে খুব জল ঢাল্‌তে লাগ্‌ল। আগুন নিবে গেল, আর উপরের ঘরের রোগীরাও বেঁচে গেল।

আর একদিন মার্টিনেল নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলেন। নদীর ধারে একটা মিল (Mill) ছিল। মিলে জল নিবার জন্য নদীর ধার থেকে মিল পর্য্যন্ত একটা সরু খাল কাটা ছিল। মার্টিনেল বেড়াতে বেড়াতে হটাৎ একটা চীৎকার শুন্‌তে পেয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, একজন লোক সেই সরু খালে প'ড়ে গিয়ে জলে ভেসে যাচ্ছে। তিনি আর এদিক্ ওদিক্ না দেখে, একেবারে জলের মধ্যে লাফিয়ে প'ড়্‌লেন, আর অল্প সময়ের মধ্যেই সাঁতার কেটে সেই লোককে ধ'রে ফেল্লেন। কিন্তু জলের স্রোত বেশী থাকাতে তিনিও সেই লোককে নিয়ে ভেসে যেতে লাগ্‌লেন। হটাৎ তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, সাম্‌নেই মিলের চাকা জলের উপর বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে; আর একটু দূর গেলেই তিনি সেই চাকার মধ্যে গিয়ে প'ড়্‌বেন। কিন্তু তবু তিনি সেই লোককে ফেলে পালাবার চেষ্টা কর্‌লেন না। তাকে এমন ভাবে ধ'রে রাখ্‌লেন, যাতে তিনি নিজে চাকার মধ্যে গিয়ে প'ড়্‌লেও, তার বিশেষ ক্ষতি না হয়। অল্পক্ষণ পরেই তিনি চাকার মধ্যে গিয়ে প'ড়্‌লেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য রকমে বেঁচে গেলেন। খালি চোট লাগার দরুণ একটু কাবু হয়ে পড়্‌লেন। অনেক কষ্টে সেই লোককে নিয়ে তিনি ডাঙ্গার কাছে এলেন। ততক্ষণে আশেপাশের লোকজন তাঁদের সাহায্যের জন্য দৌড়ে এল, আর তাঁরাও বেঁচে গেলেন।

এর প্রায় ১৭ বছর পরে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, এক ডিউকের বিয়ে উপলক্ষে নানা রমক বাজী পোড়ান হচ্ছিল। লোকেরা তামাসা দেখ্‌বার জন্য একটা সরু পথ দিয়ে সেদিকে যাচ্ছিল। হটাৎ একজন দুর্ব্বল লোক ভিঁড়ের মধ্যে পা পিছ্‌লিয়ে প'ড়ে যাওয়াতে একটা গোলমাল আরম্ভ হ'ল। পিছনের লোকেরা গোলমালের কারণ বুঝ্‌তে না পেরে, আরও ঠেলাঠেলি কর্‌তে লাগ্‌ল। তাতে তিন চারজন বুড়োমানুষ মাটীতে প'ড়ে গেলেন। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই গোলমালের আওয়াজ মার্টিনেলের কাণে গিয়ে পৌঁছাল। তিনি তাঁর সঙ্গের সৈন্যদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে, তাড়াতাড়ি ভিঁড়ের মধ্যে এসে দেখেন যে, অনেক লোক চাপা প'ড়ে মারা যাবার যোগাড়

হয়েছে। তিনি প্রথমে সেই সরু পথের মাঝ্‌খানে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে লোকদের বল্লেন, "তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, অনেক মানুষ চাপা পড়েছে।" কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হ'ল না। এক প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির কাছে একটা টব উল্টিয়ে যাওয়াতে গোলমাল আরও বেড়ে গেল। অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ভিঁড়ের মধ্যে প'ড়ে গেল। তখন তিনি ভিড়ের মধ্যে থেকে আহত লোকদের তুলে নিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনি অনেক ছোট ছোট্ ছেলে-মেয়ে আর বুড়োমানুষকে তুলে নিয়ে, গোলমালের বাইরে নিরাপদ জায়গায় রেখে এলেন। কিন্তু অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজে তিন চারবার ভিঁড়ে চাপা পড়েছিলেন; একবার মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেলেন। ক্রমে অনেক লোক তাঁর সাহায্যে আসাতে তিনি গোলমাল সহজেই থামাতে পার্‌লেন, আর যে সব লোক চাপা পড়েছিল তাদের সেবা আর চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর্‌লেন।

তখনকার দিনে ফ্রান্সে 'সব চেয়ে বেশী সাহসের কাজ' দেখাবার জন্য যে পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট ছিল, মার্টিনেলকে সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এই পুরস্কার পাওয়া তখন খুব সম্মানের বিষয় ছিল।

শ্রীসুবিমল রায় এম্-এ।

জলের তলায় ছবি আঁকা

এবারের রঙ্গিন ছবিতে দেখ, একজন ডুবুরি কেমন জলের নীচে ব'সে রং তুলি দিয়ে ছবি আঁক্‌ছেন! এঁর রং, তুলি, ছবি আঁক্‌বার ক্যান্‌ভাস্, সবই একটু নতুন রকমের—অর্থাৎ জলের নীচে ছবি আঁক্‌বার উপযুক্ত ক'রে বানান হয়েছে;—সবই "Waterproof"! ইনি প্রবাল-দ্বীপে গিয়ে সাগর-গর্ভের ছবি অনেক এঁকেছেন। টাহিটী দ্বীপে ইনিও গিয়েছিলেন।

লোকটির নাম মিষ্টার সাড় প্রিচার্ড। ছেলেবেলা থেকেই এঁর জলে নামা ও ডুব দেওয়ার সখটা খুবই বেশী। বড় হয়ে এই সখ এখন ইনি কাজে লাগিয়েছেন। জলের নীচে ডুব দিয়ে যে সব আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখ্‌তেন, সেগুলির ছবি এঁকে এখন ইনি সকলকে দেখাচ্ছেন।

ইউরোপের কোন দেশে সমুদ্রের তলাটা নাকি তেমন সুন্দর নয়। তাই তিনি প্রবাল দ্বীপ-পুঞ্জে গিয়ে ছবি আঁকেন;—যেখানে জলের তলায় নানা রঙের সুন্দর এবং অদ্ভুত মাছ খেলা করে, আর নানা রঙের প্রবালে জলের তলায় সুন্দর বাগানের সৃষ্টি হয়।

অদ্ভুত জীব

সন্দেশে অনেক সময় নানা রকম অদ্ভুত জন্তুর ছবি দেওয়া হয়ে থাকে। কারোর চেহারা অদ্ভুত, কারোর চালচলন অদ্ভুত, কারোর আত্মরক্ষার উপায় অদ্ভুত। এবারে যে জন্তুর ছবি দেওয়া হ'ল তার বাড়ী হচ্ছে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া প্রদেশে।

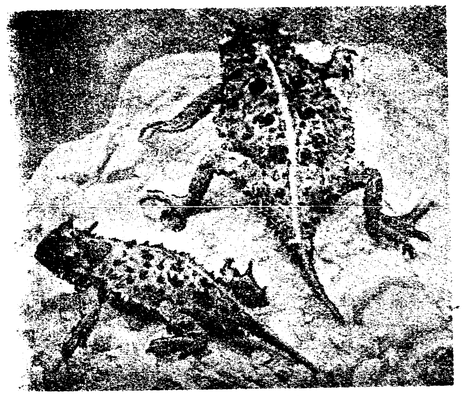

ছোট খাট এক বিঘৎ লম্বা জন্তু, তার সমস্ত শরীর কাঁটায় ঢাকা নাকের উপর গণ্ডারের মত সিং; চেহারা দেখ্‌লে কোনও জন্তুই চট্ করে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। সাধারণতঃ এগুলিকে শিংওয়ালা ব্যাঙ্ বলা হয়; কিন্তু আসলে সে ব্যাঙ্ নয়, গিরগিটি জাতীয় জিনিষ।

মনে হতে পারে যে, আত্মরক্ষার জন্য এ জন্তুর পক্ষে ঐ কাঁটাওয়ালা পোষাকটিই যথেষ্ট কিন্তু যে কারণেই হোক, সে কেবল ঐ পোষাক নিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তার উপরে সে আত্মরক্ষার এমন একটি চমৎকার উপায় বার করেছে যা পৃথিবীতে আর কোনও জন্তুর জানা নাই। লামা প্রভৃতি দুই একটি জন্তু, আর আফ্রিকার কোনও কোনও সাপ থুতু ছিটিয়ে শত্রুকে জব্দ কর্‌তে জানে, অনেক রকম সমুদ্রের পাখি আছে যারা বিশ্রী রকম শব্দ করে, নাক দিয়ে এক রকম তেলা জিনিস ছিট্‌কাতে পারে। কোনো কোনো জন্তু তাড়া কর্‌লে অতি বিশ্রী দুর্গন্ধ রস ছড়াতে থাকে, কামানবাজ পোকা (Bombardier beetle) আর কোনো কোনো জাতের শুঁয়ো পোকা নানা রকম ঝাঁঝাল রস ছুঁড়ে মার্‌তে ওস্তাদ; কিন্তু এই জন্তুটির আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে চোখ দিয়ে রক্ত ছিট্‌কান। একবার এক সাহেব কালিফোর্নিয়াতে এই রমক একটি জন্তু ধরেছিলেন। জন্তুটাকে তুলে ধর্‌তেই তার একটা চোখ থেকে সরু রক্তের ফোয়ারা ছুটে প্রায় এক হাত উঁচুতে সাহেবের কাঁধের কাছে গিয়ে পড়্‌ল। তার পরের মুহূর্ত্তেই আরেকটা চোখ থেকে আবার পিচ্‌কারির মত খানিকটা রক্ত ছিট্‌কিয়ে পড়্‌ল। এমনি করে দু চার মিনিটের মধ্যে চার পাঁচবার রক্ত ছিটিয়ে সে সাহেবের হাত মুখ জামা সব রক্তে ভিজিয়ে

দিল। সাহেবের কুকুর ভারি উৎসাহ করে জন্তুটিকে শুঁক্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু কাছে যাওয়া মাত্র হঠাৎ এক ঝলক রক্ত ছুটে তার সমস্ত মুখ ভিজিয়ে দিল। কুকুর বেচারা তৎক্ষণাৎ ভয়ে ও ঘৃণায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সেই যে তফাৎ সরে দাঁড়াল আর কিছুতেই তাকে জন্তুটার কাছে নেওয়া গেল না।

জন্তুটির চেহারা যতই ভয়ানক হোক তার স্বভাবটি নিতান্ত নিরীহ; সে পারত-পক্ষে অন্য কোন জন্তুর সঙ্গে লাগ্‌তে যায় না। হঠাৎ শত্রু কাছে এসে পড়্‌লে কেবল আত্মরক্ষায় নিজের অদ্ভুত বিদ্যার পরিচয় দেয়। মরুভূমির দেশে সামান্য পোকা মাকড় খেয়েই এরা জীবন ধারণ করে।

"উহ্যনাম পণ্ডিত"

পালোয়ান



খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ
হস্তী লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ
শক্ত যেন লোহার গঠন।
একদিন এক গুণ্ডা তাকে
বাঁশ বাগিয়ে মার্‌ল বেগে—
ভাঙ্‌ল সে বাঁশ শোলার মত
মট্ করে তার কনুই লেগে।
এইত সেদিন রাস্তা দিয়ে
চল্‌তে গিয়ে দৈববশে,
উপর থেকে প্রকাণ্ড ইট
পড়ল তাহার মাথায় খ'সে।
মুণ্ডুতে তার যেমনি ঠেকা
অম্‌নি সে ইট এক নিমেষে,
গুঁড়িয়ে হ'ল ধূলোর মত
ষষ্ঠি চলেন মুচ্‌কি হেসে।

ষষ্ঠি যখন ধমক হাঁকে কাঁপতে থাকে দালান বাড়ী,
ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্টে পড়ে গরুর গাড়ী।
ধুম্‌সো কাঠের তক্তা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্ত্তেকে,
একশো জালা জল ঢালে রোজ স্নানের সময় পুকুর থেকে।
সকাল বেলার জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া,
সঙ্গে তারি চৌদ্দ হাঁড়ি দৈ কি মালাই মুড়কি দেওয়া।
দুপুর হ'লে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্‌চি ভ'রে,
বরফ দেওয়া উনিশ কুঁজো সরবতে তার তৃষ্ণা হরে।
বিকাল বেলায় খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া,
সন্ধ্যা হ'লে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।
রাত্রে সে তার হাত পা টেপায় দশটি চেলা মজুত থাকে,
দুম্‌দুমাদুম্ সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায় তাকে।
বল্‌লে বেশী ভাব্‌বে শেষে এসব কথা ফেনিয়ে বলা—
দেখ্‌বে যদি আপন চোখে যাও না কেন বেনিয়াটোলা? *

আশ্চর্য্য কবর

পৃথিবীর পুরানো সভ্য জাতিদের মধ্যে মিসরবাসীরা প্রধান। ইজিপ্টেরই নাম মিসর। এই ইজিপ্টে পিরামিড, স্ফিংস্ প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য ভগ্নাবশেষ আজও মিসরবাসীদের অতীতের গৌরবের পরিচয় দিচ্ছে। প্রকাণ্ড বড় আকারের মন্দির, ঘর, বাড়ী, মূর্ত্তি এ সব তৈরী করান মিসরের রাজাদের একটা সখ অথবা বাতিক ছিল। তা' ছাড়া সুন্দর মাটির বাসন, দামী পাথর আর নানা ধাতুর তৈরী সুন্দর সুন্দর জিনিষ আর অলঙ্কার, কাঠের তৈরী সুন্দর রং করা মূর্ত্তি, বাক্স, আসবাবপত্র, এ সবও মিসরবাসীরা খুব সুন্দর ক'রে তৈরী কর্‌তে পার্‌ত। আজকালও মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গায় ঐ সব পুরানো জিনিষ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি লাক্সর সহরের কাছে এক পাহাড়ের উপত্যকায় ইংলণ্ডের লর্ড

* সন্দেশ-সম্পাদকের "আবোল তাবোল" (যন্ত্রস্থ) হইতে উদ্ধৃত।

এই সব বোতলের ভিতর ৩২০০ বৎসর আগেকার নানা রকম মলম পাওয়া গেছে। মলমের সুগন্ধ আজও পাওয়া যাচ্ছে।

কবরের পাশে তুতানখামিনের এই মূর্ত্তি খাড়া ছিল। এই মূর্ত্তি কাঠের তৈরী।

পরকালের খোরাক! কবরের সঙ্গে নানা রকম মাংস - হরিণের মাংস, হাঁসের মাংস ইত্যাদি পাওয়া গেছে। গোল পাত্রে মসলা মিশিয়ে মাংসকে তাজা রাখা হয়েছিল। এছাড়া অনেক রকম ফলও ছিল।

পরকালে ব্যবহারের জন্য নানা আসবাব! খাট, পালং, চৌকি, দোলা, বাক্স, রথ,—কিছুই বাদ যায়নি।

কার্ণারভনের একটি দল রাজা তুতান্‌খামিনের কবর আবিষ্কার ক'রেছেন, তা'তে প্রায় ৩২৭৫ বৎসর আগেকার নানা রকমের সুন্দর জিনিষ পাওয়া গেছে।

রাজা তুতান্‌খামিন্ প্রায় ৩৩০০ বৎসর আগে ইজিপ্টে রাজত্ব করেছিলেন। সে সময় মিসরবাসী রাজাদের কবর দেবার সময় নিয়ম ছিল যে, কবরের সঙ্গে নানা



তুতান্‌খামিনের চটিজুতা—এই আশ্চর্য্য চটির উপর সুন্দর সোণার আর পাথরের কাজ করা।

রকমের আসবাব পত্র, কাপড় চোপড়, গহনা, খাবার জিনিষ রেখে দেওয়া হবে, যাতে রাজারা পরলোকে গিয়ে সে সব জিনিষ ব্যবহার কর্‌তে পারেন!

তুতান্‌খামিনের কবরের সঙ্গে যে সব জিনিষ ছিল তার কিছু নমুনা সঙ্গের ছবিতে পাবে। ছবির পরিচয় দেওয়া আছে, কাজেই বুঝ্‌বার আর কোন অসুবিধা হবে না।

এই আবিষ্কার নিয়ে পৃথিবীময় হৈ চৈ পড়ে গেছে। আমেরিকা থেকে দলে দলে বড়লোক ঐ কবরের জায়গায় বেড়াতে গিয়েছেন; তা'ছাড়া কবরে যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে তার নকল ক'রে নানা জনে নানা জিনিষ বানাচ্ছেন। যেমন "তুতান্‌খামিন্ টেবিল", "তুতান্‌খামিন্ ফুলদানি", "তুতান্‌খামিন্ গাউন" (পোষাক)—ইত্যাদি!

শ্রীসুবিনয় রায়।





সুকুমার রায়চৌধুরী

জন্ম—১৩ই কার্ত্তিক, ১২৯৪ মৃত্যু—২৪শে ভাদ্র, ১৩৩০

(বিলাতে তোলা ছবি)

সন্দেশ

একাদশ বর্ষ. আশ্বিন, ১৩৩০ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"অজর অমর অরূপ রূপ,
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ,
দেহ নহে মোর চির নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।
বিশ্ব আত্মা মাঝে হয়ে মগন
আপন স্বরূপ হেরিলে মন,
না থাকে সন্দেহ না থাকে ভয়
শোক তাপ মোহ নিমেষে লয়,
জীবনে মরণে না রহে ছেদ
ইহ পরলোকে না রহে ভেদ।"

—সুকুমার রায়।

স্বর্গীয় সুকুমার রায়

"সন্দেশ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় আমাদের নিরাশ করিয়া শোকাচ্ছন্ন করিয়া গত ১০ই সেপ্টেম্বর বেলা ৮-১৫টার সময় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

সুকুমার-বাবু স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১২৯৪ সালের ১৩ই কার্ত্তিক। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর পূর্ণও করে নাই। এই অল্প বয়সেই সুকুমার-বাবু নানা ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষত্বের পরম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সুকুমার-বাবুকে চিনিতে হইলে তাঁহার পিতৃপরিচয়ও একটু জানা দরকার, কারণ, সুকুমার-বাবুর বহু সদ্‌গুণ প্রদীপ হইতে প্রদীপ জ্বালার মতন পিতার নিকট হইতে পাওয়া। উপেন্দ্রকিশোর-বাবু এমন বিনয়ী মিষ্টস্বভাব লোক ছিলেন যে, তাঁহাকে জানা মানেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালোবাসা। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর আমার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল আমি তাঁহাকে আগে নমস্কার করিব, কিন্তু কখনো পারি নাই, দেখা হইবা মাত্র তিনি এত অবনত হইয়া নমস্কার করিতেন যে, আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম—কারণ, তিনি আমার চেয়ে সকল রকমেই বড় ছিলেন—বয়সে, জ্ঞানে, কৃতিত্বে, প্রতিষ্ঠায়, চরিত্রে। উপেন্দ্রকিশোর-বাবু সঙ্গীতবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; চিত্র ছাপিবার হাফ্‌টোন-ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রথা তিনিই এদেশে প্রবর্ত্তন করেন ও বহু নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া ঐ বিদ্যার উন্নতি করেন; শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষী "ছেলেদের রামায়ণ" ও "ছেলেদের মহাভারত"।

এই অশেষগুণসম্পন্ন পিতার পুত্র সুকুমার-বাবু বাল্যকাল হইতেই নানা বিষয়ে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া দুই বিষয়ে সম্মানের (অনার্স) সহিত বি-এস্‌সি পাশ করেন। পরে তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেদিন তাঁহাকে বিদায় দিতে হাবড়া-ষ্টেশনে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে আমরাও ছিলাম—সেই সৌম্যমূর্ত্তির হাস্যমুখ এখনো মনে পড়িতেছে, সেই হাসিতে সঙ্কল্প ও আশা জ্বলজ্বল করিতেছিল।

বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার-শিল্পকলেজে ফোটোগ্রাফী এবং ফোটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া অনুসারে ছবির ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি

করিয়া, সেখানে স্বকীয় গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া, যশোমণ্ডিত সুকুমার-বাবু দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিনও তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে আমরা হাবড়া-ষ্টেশনে গিয়াছিলাম।

তাহার পর বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে একত্রে যাপন করিয়া, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানিবার অবসর পাইয়াছিলাম। সুকুমার-বাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পর যে গুণ সর্ব্বাগ্রে লোকের কাছে ধরা পড়িত, তাহা হইতেছে তাঁহার রসিকতা ও তেজস্বিতা। তাঁহার বাক্য ছিল সরস, তাঁহার রচনা ছিল সরস, তাঁহার সঙ্গ ছিল সরস, তাঁহার ব্যবহার ছিল সরস। আনন্দময়তা তাঁহার স্বভাব ছিল। এই আনন্দময়তা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি বন্ধু-মজ্‌লিসে আনন্দের কেন্দ্র হইতেন, এবং যাহা কিছু রচনা করিতেন তাহা আনন্দে অভিষিক্ত হইত। শিশুদের উপযোগী-কবিতা লেখা বড় শক্ত কাজ; এই কাজে প্রথম কৃতিত্ব দেখান শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং পরে নানা-রকমে কৃতিত্ব দেখান সুকুমার-বাবু। বিমল হাসির কবিতা লিখিতে সুকুমার-বাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেইসব কবিতার ছন্দ নিখুঁত, মিল আশ্চর্য্যজনক ও বিষয় নূতন হইত। তাঁহার "খাওয়া" ও "পড়া" সম্বন্ধে কবিতা দুটি বঙ্গভাষায় ভাষা-তত্ত্বের দিক্ হইতেও বিশেষ সমাদৃত হইবে—আমরা যে কত বিভিন্ন অর্থে খাওয়া ও পড়া শব্দ ব্যবহার করি তাহা তিনি হাস্যের সূত্রে একত্র গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব বাংলায় "আবোল-তাবোল" কবিতা রচনার প্রথা প্রবর্ত্তনে। রচনার অবলম্বন কোনো বিষয় নয়, পূর্ব্বাপর কথার কোনো সঙ্গতি নাই, অথচ সেটি সুখপাঠ্য সরল কবিতা হইবে—এরূপ রচনা অত্যন্ত কঠিন; এই কঠিন কর্ম্মে অবলীলাক্রমে তাঁহার লেখনী নিযুক্ত হইত, ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। এই আবোল-তাবোল কবিতাগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বহুবার অনুরোধ করিয়াছিলাম; তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া তাহা ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ছাপা শেষ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

সুকুমার-বাবু হাস্যকৌতুককর অভিনয় ও গান করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন; হাস্যকর ছবি আঁকিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। এইসব কবিতা গান অভিনয় ছবিতে হাসি থাকিত, কৌতুক থাকিত, কিন্তু কাহাকেও বিদ্রূপ থাকিত না—উহা পড়িয়া শুনিয়া দেখিয়া সকলে আনন্দ পাইত, কেহ আঘাত পাইত না।

সুকুমার-বাবু হাস্যরসিক ছিলেন, কিন্তু ছেব্‌লা ছিলেন না। তাঁহার বাক্যে ব্যবহারে একটি শুচি সংযম ছিল। তিনি গভীর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট চিন্তাশীল মনীষী ছিলেন। তিনি গম্ভীর বিষয়ে গভীরচিন্তাপূর্ণ আলোচনা ও রচনা করিতেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি আর্টে ও সাহিত্যে নিপুণ সমজ্‌দার দিলেন। সুপ্রযুক্ত স্বল্প বাক্যে তিনি গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। বিলাতের কোয়েষ্ট্ (The Quest) নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায়, মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসীতে তিনি গম্ভীর বিষয়ে ইংরেজী বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ মনীষীদিগের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সুকুমার-বাবুর অন্তর একদিকে যেমন মনীষায় স্বচ্ছ উজ্জ্বল ছিল, অন্যদিকে যেমন আনন্দময়তায় সরস ছিল, অপর দিকে আবার ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবদ্‌নির্ভরতায় মধুর ছিল। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছিলাম তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুদের রোগের সেবার মধ্যে ও তাঁহার নিজের দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগের মধ্যে। বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর অন্তিম পীড়ার সময় সুকুমার-বাবু সস্ত্রীক যেরূপ কায়মনো-বাক্যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অজিতকুমারের অকাল-মৃত্যুতে শোকার্ত্ত আত্মীয়-বন্ধুদের সান্ত্বনা দিয়া সুকুমার-বাবু গান করিয়াছিলেন—

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়,
জয় অজানার জয়!"

নিজে সাংঘাতিক কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়াও তিনি নিজের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা কৌতুকপ্রিয়তা হাস্যময়তা হারাইয়া ফেলেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার আন্তরিক ছিল বলিয়া তিনি সুখদুঃখ রোগশোক দুইই প্রফুল্ল ভাবে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং পুষ্পের মৃত্যু দ্বারাই যেমন তাহার পরিণতিলাভ হয় ফল হইয়া উঠাতে, তেমনি এই দেহের মৃত্যুতে মানবের জীবনের পরিণতিলাভ ঘটে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া হাসিমুখে ভগবান্‌কে বলিতে পারিতেন—

"দুলিছ গো, দোলা দিতেছ!
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন, পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল!
চিরকাল একই লীলা গো,
অনন্ত কলরোল!
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে!"

সুকুমার-বাবু এই বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন—

"মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মত! জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে' হতেছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়!"

এই বিশ্বাসের জোরেই দীর্ঘ আড়াই বৎসর ক্রমাগত রোগ ভোগ করিয়াও তিনি আসন্ন মৃত্যুকে হাসি দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সদাপ্রসন্ন হাস্যমুখের সাম্‌নে মৃত্যু যেন তাহার কৃষ্ণমূর্ত্তি লইয়া আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তিনি মনের জোরে বহুবার মৃত্যুকে প্রতিহত করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। বহুকাল শয্যাগত থাকার পর গত বৎসর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-উৎসবে সুকুমার-বাবুকে উপস্থিত দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ বৎসর বর্ষার অন্তেই অন্তক তাঁহাকে নামশেষ করিয়া অপহরণ করিল।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শুইয়া শুইয়া "সন্দেশে"র জন্য ছবি আঁকিয়াছেন, শিশু বন্ধুদের আনন্দ দানের জন্য আবোল-তাবোলের ছাপার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গভাষা বাঙালীর কলাশিল্প অনেক কিছু পাইবে আশা করিয়া ছিল; মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সের আড়াই বৎসর শয্যাগত অবস্থায়

কাটিয়াছিল। এই অল্প বয়সেই তিনি যে প্রতিভার ও চরিত্রমাধুর্য্যের পরিচয় দিয়া গেছেন তাহা অসামান্য। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে পরিবারের ও আত্মীয়-বন্ধুদের ক্ষতি ত হইলই; সমাজের, দেশের, শিল্পের, সাহিত্যের নানা দিকে দারুণ ক্ষতি হইল। আমরা আশা করি ভগবান্ যাঁহাকে মৃত্যুরূপে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়া লইয়া গেলেন, তাঁহাকে

"নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে।"

কিন্তু তাঁহার বিচ্ছেদকাতর ক্ষতিগ্রস্ত আমরা—

"আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে,
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে!"

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলিবিয়া

পারস্যের সুলতান আব্বাস ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন, তাঁহার সঙ্গে একজন মাত্র কর্ম্মচারী থাকিত।

রাজদরবারে সচরাচর যাহারা যাতায়াত করে, সকলেই রাজার মন রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলে। কাহারও ভিতরের আসল স্বভাবটি জানিবার উপায় নাই; সকলেই যেন ছদ্মবেশ ধরিয়া রাজার সমুখে যায়, রাজার খোসামোদ ভিন্ন যেন আর কিছুই তাহারা করিতে জানে না। গ্রামের লোক সাদাসিধা সরল, তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি, সবই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক সরল মানুষের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের সরল মনের বিমল আনন্দ ভোগ করিবার জন্যই সুলতান আব্বাস ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন সুলতান ছদ্মবেশে বাহির হইয়াছেন। অনেক গ্রাম পার হইয়া গেলেন। দেখিলেন, গ্রামে গ্রামে সকলে মনের আনন্দে নাচ গান প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ করিতেছে—তাহাতে কোলাহল নাই, চীৎকার চেঁচামেচি নাই, রাজদরবারের মত খরচ পত্রও নাই কিন্তু তবু তাহাতে আমোদের অভাব দেখা

যায় না। পথের শ্রমে সুলতান ক্লান্ত হইয়াছিলেন, একজন গ্রামবাসীর বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া কিছু জলযোগ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, তেমন মিষ্টি এবং তৃপ্তিকর খাদ্য যেন তিনি রাজবাড়ীতে কখনও খান নাই।

তারপর এক ক্ষেতের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। চারিদিকে নানা রকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, নিকটে ছোট একটি ঝরণা কুলকুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে।



সেই ঝরণার ধারে গাছের তলায় বসিয়া একটি কৃষক বালক মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতেছে—তাহার ভেড়ার দলটি নিকটেই চরিয়া বেড়াইতেছে।

সুলতান বালকের নিকটে গিয়া দেখিলেন, তাহার মুখখানি সুন্দর হাসিখুসী, চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং দেখিলেই মনে হয়, ছেলেটি ভারি বুদ্ধিমান্। কৃষকের সন্তান হইলেও তাহার রকম সকম, ধরণ ধারণে যেন আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে।

ছেলেটির পোষাক জীর্ণ মলিন, কিন্তু তাহাতে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় নাই। তাহাকে দেখিয়া সুলতান প্রথমে ভাবিলেন, বুঝিবা ছদ্মবেশধারী উচ্চ বংশের কোন ছেলে হইবে। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—তাহার নাম "আলিবিয়া", নিকটেই এক গ্রামে তাহার গৃহস্থ মা বাবা থাকেন।

ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাহার সরল অমায়িক ব্যবহারে এবং এই অল্প বয়সেই তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখিয়া, সুলতান একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গ্রাম্য

প্রজাদের কথা, যাহা এতকাল যাবৎ রাজদরবারে কেহ তাঁহার কাণেও তুলে নাই, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এই বালকের মুখে সব শুনিতে পাইলেন। বালক ত আর জানে না, যে, সে সুলতানের সঙ্গে কথা বলিতেছে? তাই সে তাঁহার প্রশ্নে মন খুলিয়া সমস্ত কথাই বলিয়াছে, কিছুই গোপন করে নাই। ইহার ফলে সুলতান যারপর নাই খুসী হইলেন, কেন না, এমন স্বাভাবিক সরল উত্তর রাজদরবারে থাকিয়া তিনি জীবনে কখনও শুনিতে পান নাই। সঙ্গের কর্ম্মচারীটিকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন, যেন সে তাঁহার পরিচয় না দিয়া ফেলে।

সুলতান মনে মনে ভাবিলেন—"রাজার ছেলেরাও ত এই রাখাল বালকের চাইতে কোন বিষয়ে ভাল বলিয়া মনে হয় না! আমার যদি এমন সুন্দর, বুদ্ধিমান্ একটি ছেলে থাকিত, তবে কত সুখী হইতাম। ইহাকে যদি এখন হইতে যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে, কালে এই বালক যে একজন খুব বড় লোক হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি ইহাকে রাজবাড়ীতে লইয়া গিয়া, সর্ব্বদা আমার নিকটে রাখিয়া পরমযত্নে শিক্ষা দিব।"

কিছুদিন পরে, সুলতানের আদেশে আলিবিয়াকে রাজবাড়ীতে আনা হইল। সে যখন জানিতে পারিল, যে, স্বয়ং সুলতানই ছদ্মবেশে তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া খুসী হইয়াছেন, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আলিবিয়ার শিক্ষা আরম্ভ হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই বুদ্ধিমান্ কৃষক-বাকল শিল্প, বিজ্ঞান, গীত বাদ্য, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে খুব নিপুণ হইয়া উঠিল। রাখালের লাঠি, জীর্ণ পোষাক আর সেই বাঁশীটি যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়া, এখন সে মূল্যবান্ পোষাক পরিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের পর এখন তাহার তুল্য রূপবান্ এবং গুণবান্ যুবক রাজদরবারে দ্বিতীয় কেহ নাই।

রাজ্যের যাবতীয় কঠিন কার্য্যে তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখিয়া, সুলতান ভারি খুসী হইলেন। বিশেষতঃ সুলতান যখন দেখিলেন, যে, প্রাসাদের মূল্যবান্ আসবাব জিনিষপত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে আলিবিয়ার পছন্দ এবং রুচি খুব বেশী রকমের আছে, তখন তিনি তাহাকে একটি গুরুতর বিশ্বাসের কাজে নিযুক্ত করিলেন। খুব দায়িত্বের কাজ—রাজভাণ্ডারের হীরা, মণি, জহরৎ এবং অন্য সমস্ত মূল্যবান্ জিনিষ পত্রের তত্ত্বাবধান এখন হইতে আলিবিয়াকে করিতে হইবে।

কিছুদিন পরে আলিবিয়া, সুলতানের আদেশ লইয়া মা বাবার কাছে গেল। ছেলেবেলা যে সব স্থানে বাঁশীবাজাইয়া, নাচিয়া গাহিয়া সে সঙ্গীদের সঙ্গে বেড়াইয়াছে, সে সমস্ত জায়গা একবার ঘুরিয়া আসিল। তখন তাহার মনে হইল —"গ্রাম্য জীবনেই মনের প্রকৃত সুখ শান্তি; কেহ যেন এই বিমল সুখ ছাড়িয়া রাজদরবারের দুঃখ ভোগ করিতে কখন না যায়।"

সুলতানের অনুগ্রহে অনেক কাল আলিবিয়ার দিন পরমসুখে কাটিল বটে কিন্তু শেষে তাহাকেও রাজদরবারের দুঃখের আস্বাদন পাইতে হইয়াছিল। সুলতান আব্বাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র "সা সোফি" পারস্যের সিংহাসনে বসিলেন। আলিবিয়ার সুখ সৌভাগ্যকে রাজকর্ম্মচারীদের অনেকে গোপনে হিংসা করিত। তাহারা এখন আলিবিয়ার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। একদিন তাহারা নূতন সুলতানকে গোপনে বলিল—"হুজুর! আলিবিয়া বিশ্বাসঘাতক। স্বর্গীয় সুলতান বিশ্বাস করিয়া তাহাকে তোষাখানার ভার দিয়াছিলেন। সে ভাণ্ডারের বহু মূল্যবান্ জিনিষ চুরি করিয়াছে।"

তোষাখানায় বহু মূল্যবান্ একটি তলোয়ার ছিল, সুলতান আব্বাসের পিতা উহা লইয়া যুদ্ধে যাইতেন। তলোয়ারের মুঠিতে হীরা, মণি মুক্তার কাজ করা ছিল। দুষ্ট কর্ম্মচারীদের পরামর্শে সা সোফি আলিবিয়াকে বলিলেন—"আমার দাদা মহাশয়ের সেই মহামূল্য তলোয়ারটি লইয়া আইস, আমি দেখিব।"

আলিবিয়া তলোয়ার লইয়া আসিলে দেখা গেল, তাহার মুঠির মূল্যবান্ পাথর-গুলি নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আলিবিয়া বিশ্বাসী সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ করাইয়া দিল, যে, তাহার উপর তোষাখানার ভার দিবার পূর্ব্বেই, স্বর্গীয় সুলতান হুকুম দিয়া তলোয়ারের মুঠির পাথর তুলাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পর দুষ্ট কর্ম্মচারীদের পরামর্শে, সা সোফি আবার আলিবিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোষাখানার সমস্ত ধন-রত্ন আমি দেখিব।" আলিবিয়া তখনই তাঁহাকে তোষাখানায় লইয়া গিয়া সমস্ত দেখাইতে লাগিল। সব জিনিষের তালিকা প্রস্তুত ছিল। সুলতান তালিকাটি হাতে লইয়া প্রতি ঘরে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন—প্রত্যেকটি জিনিষ যথাস্থানে, পরমযত্নে রহিয়াছে, একটিও স্থানান্তরিত হয় নাই। সা সোফি মনে মনে লজ্জিত হইলেন। ভাবিলেন—আলিবিয়াকে

মিছামিছি সন্দেহ করিয়াছেন বলিয়া, তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবেন। তখন হঠাৎ চাহিয়া দেখিলেন. কিছু দূরে একটা ঘরের দরজায় তিনটা বড় বড় তালা লাগান। সেই দুষ্ট কর্ম্মচারীরাও সঙ্গে ছিল, তাহারাও এই তালা-বন্ধ ঘরটা দেখিতে পাইল। দেখিয়াই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"মহারাজ! নিশ্চয় ঐ ঘরে আলিবিয়া চুরির ধন সব লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

সা সোফি তখন খুব রাগিয়া আলিবিয়াকে বলিলেন—"শীঘ্র ঘরের দরজা খোল। ঘরে কি রাখিয়াছ আমি দেখিতে চাই"

আলিবিয়া হাঁটুগাড়িয়া যোড়হস্তে বলিল—"মহারাজ! এঘর খুলিতে বলিবেন না। পৃথিবীর মধ্যে আমার সকলের চাইতে মূল্যবান্ যে জিনিষ, উহাই এঘরে আছে। দোহাই ভগবানের! উহা কাড়িয়া নিবেন না। বহুকাল আপনার পিতার সেবা করিয়াছি, এখন আমার একমাত্র সম্পত্তি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও যদি লইয়া যান, তবে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। আমার যাহা কিছু আছে, সমস্ত নিন্ কিন্তু এ ঘরের জিনিষ আমার থাকুক্।"

সা সোফি ভাবিলেন, চুরির ধনে ঘরটি পূর্ণ। সুতরাং আরো জোর করিয়া ঘর খুলিতে বলিলেন। আলিবিয়া ঘর খুলিল। তখন সকলে দেখিল, ঘরের মধ্যে অন্য কোন জিনিষ নাই—আছে শুধু, রাখালের লাঠি, একটা বাঁশী আর জীর্ণ মলিন একটি পোষাক! এই তিনটি জিনিষ আলিবিয়া পরম যত্নে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। রাজদরবারের সুখ সৌভাগ্যে পড়িয়া, পাছে সে আত্মহারা হইয়া যায়, তাই সে মাঝে মাঝে আসিয়া সে তাহার রাখাল-জীবনের এই মহামূল্য জিনিষগুলি দেখিয়া যাইত।

আলিবিয়া দুঃখ সাম্‌লাইতে পারিল না। মনের আবেগে বলিল—"দেখুন মহারাজ! আমার সেই রাখাল-জীবনের সুখের চিহ্নগুলি একবার দেখুন। অতি সামান্য জিনিষ! কিন্তু যাহারা অনাবশ্যক জাঁকজমক তুচ্ছজ্ঞান করে এবং মায়ের দেওয়া মোটা ভাত কাপড় পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে—তাহাদিগের নিকট ইহা মহামূল্য ধন। এই ধনই মানুষকে স্বাধীনতা দেয়, মানুষের মনে শান্তি বিতরণ করে। আপনি আমার সব কাড়িয়া লউন, শুধু, আপনার স্বর্গীয় পিতা যখন স্নেহবশতঃ আমাকে দুঃখের পথে আনিয়াছিলেন, তখন যে ধনে আমি ধনী ছিলাম সেই ধনগুলি আমি রাখিতে চাই।"

আলিবিয়ার কথা শুনিয়া সা সোফির চৈতন্য হইল। দুষ্ট কর্ম্মচারীদের প্রতি তিনি রাগিয়া আগুন হইলেন। তাঁহার আদেশে সেই মুহূর্ত্তে দুষ্টদের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর সুলতান সোফি আলিবিয়াকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিয়া, পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আলিবিয়া প্রতিদিন একবার করিয়া তাঁহার রাখাল-জীবনের এই চিহ্নগুলি দেখিয়া যাইতেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ভাবুক

মোণ্ডা বানান কর্‌তে গেলে
জিভেই আসে জল;—
ও ভাই জিভেই আসে জল!
লোল পড়ে তাই মুখ খুলি না
কেমনে বলি, বল—
ও ভাই কেমনে বলি, বল?

সলিল বানান কর্‌তে গেলে
মন চলে যায় পালের কোলে,
নদীর ধারে, বড়শী নিয়ে
যেথায় ছেলের দল!
সব ভুলে যাই, আন্‌মনে চাই
কেমনে বলি, বল?

একা গাড়ী ঐ চলেছে
যেই পড়েছি ভাই,—
ওরে যেই পড়েছি ভাই,

বই ছুঁড়ে সব, গাড়ীর পিছে
খানিক দূরে যাই,
ও ভাই খানিক দূরে যাই!

বনের কথা বল্‌লে আগে
বাঘের থাবাই মনে জাগে,
সাম্‌নে ওকি? চোখ দু'টা ভাই
এক্কেবারে থ,—
ও ভাই এক্কেবারে থ,—
এমনি ধারা সব ভুলে যাই
বেরোয় নাকো 'ব'!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পশুরাজ

মানুষের সঙ্গে বনের হিংস্র জন্তুদের শত্রুতা সেই আদিম কাল থেকেই চলে এসেছে। অবশ্যি এসব বিবাদে শেষে মানুষই জয় লাভ করে। মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি অনেক বেশী, তা ছাড়া তাদের মারাত্মক অস্ত্র 'বন্দুকের' কাছে সিংহ বাঘ প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুরা সহজেই কাবু হয়ে যায়।

বন্য জন্তুর মধ্যে সিংহই সকলের চেয়ে মাতব্বর, তাই তাকে 'পশুরাজ' বলে। ভারতবর্ষের বনে সিংহ আছে, এসিয়ার অন্যান্য জায়গাতেও সিংহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে সিংহের সংখ্যা এতই কমে গিয়েছে, যে, এখন আর শিকারীদের সিংহ শিকার কর্‌বার হুকুম নাই। আজকাল পৃথিবীর মধ্যে আফ্রিকা দেশেই হলো সিংহের প্রধান আড্ডা। আফ্রিকার যে স্থানে শ্বেতাঙ্গদের বাস, সেখানে অবশ্যি সিংহ বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায় না কিন্তু পুরান জায়গা ছেড়ে কোন নূতন জায়গায় গেলে তখন বুঝা যায় পশুরাজ মানুষের কত বড় ভীষণ শত্রু! নূতন কোন জায়গায় মানুষের চেহারা দেখ্‌লেই হরিণগুলি বহু দূরে পলায়ন করে। তখন

পশুরাজ সিংহ পেটের দায়ে গরুবাছুর ত সাবার করেই মানুষকে পর্য্যন্ত ছেড়ে কথা কয় না। শ্বেতাঙ্গদের গাড়ীটানা ঘোড়া, গরু, গাধা, এমন কি তাহারা নিজেও,

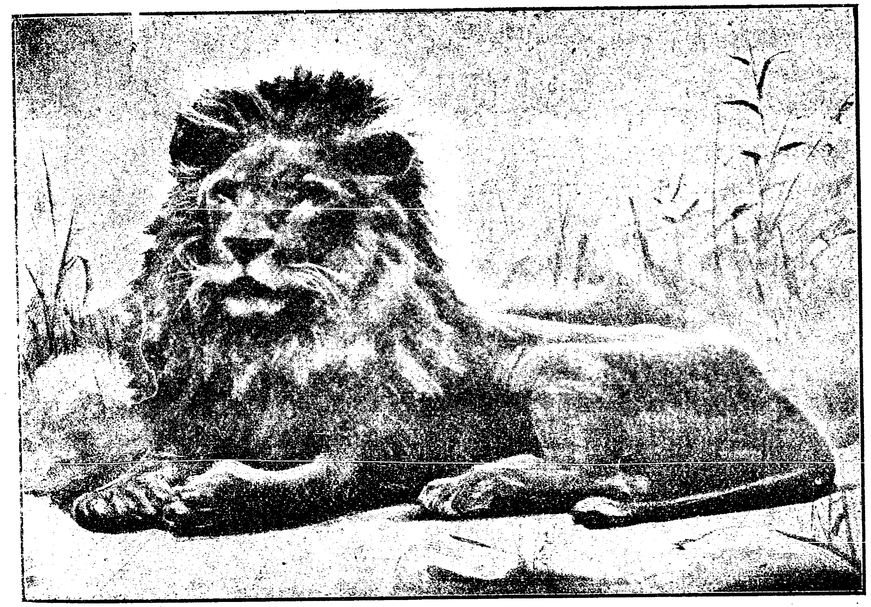

তাদের বন্দুক থাকা সত্ত্বেও, কিছুতেই নিরাপদ নয়। গভীর রাত্রে, অন্ধকারে চোরের মত চুপি চুপি এসে সিংহ শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে। প্রকাণ্ড গরুটি মহিষটি এক থাবায় মেরে ফেলে, বিড়াল যেমন ইঁদুর কাম্‌ড়ে ধ'রে নিয়ে যায়, তেমনি সেটাকে পিঠে করে নিয়ে অক্লেশে চলে যায়।

সিংহ বিড়ালজাতীয় জন্তু, ঠিক যেন খুব বড় এবং ভীষণ একটা বিড়াল। বিড়ালের থাবাটির ভিতর কেমন তার ধারাল নখগুলি লুকান থাকে। বিড়ালের জিভটি কেমন খড়্‌খড়ে। সিংহের থাবা প্রকাণ্ড বড়, তার নখগুলি অতি ভীষণ,

জিভ আরো অনেক বেশী খড়্‌খড়ে, ঠিক যেন ধারাল উকোর মত। এই উকোর মত জিভ দিয়ে সিংহ বড় বড় জন্তুর হাড় থেকে চেটে মাংস তুলে নেয়।

বিড়ালের মত সিংহও একটানা দৌড়ে বেশী দূর যেতে পারে না। কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে খানিক দূর খুব বেগে যেতে পারে। এই কারণে, সোজা দৌড়ে গিয়ে সিংহ কখনও হরিণকে ধর্‌তে পারে না। কোন দ্রুতগামী জন্তু শিকার কর্‌তে হলে, সিংহকে নানা রকম কায়দা খেলাতে হয়।

সিংহ যখন রাত্রে শিকার কর্‌তে বেরয়, তখন প্রায়ই ভীষণ গর্জ্জন কর্‌তে থাকে। মাথাটাকে মাটিতে নীচু করে ডাকে—সে যে কি ভীষণ গর্জ্জন! মাটি থর্ থর্ ক'রে কাঁপে! যেমন জোর, তেম্‌নি গম্ভীর—শুন্‌লেই মনে হয় জন্তুটির গায়ে অসাধারণ শক্তি। কোন ঝরণার কাছে গিয়ে, খুব একটান জল খেয়ে নিয়ে, তারপর সিংহ চুপ করে গুঁড়ি মেরে বসে থাকে। ক্রমে অন্ধকারে চুপি চুপি যখন হরিণ প্রভৃতি অন্য কোন জন্তু জল খেতে আসে, তখনই সিংহ তার খাবারের জোগাড় করে নেয়। এই হলো সিংহের খাদ্য সংগ্রহের একটি উপায়। তাছাড়া আরও উপায় আছে।

একদল হরিণ হয়ত মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। সোজা দৌড়ে গিয়ে তাদের ধরা সিংহের পক্ষে সম্ভব নয়। ঝোঁপ ঝাপ কিংবা বড় বড় পাথর আশে পাশে থাক্‌লে, হয়ত তার আড়ালে চুপি চুপি গুঁড়ি মেরে গিয়ে, সে শিকারের অনেকটা কাছে যেতে পারে। কিন্তু তেমন কিছু আশ্রয় না থাক্‌লে, তখন সিংহকে অন্য উপায় দেখ্‌তে হয়। তখন দুটো মিলে এক সঙ্গে শিকার করে। একটা সিংহ কোন আড়ালে লুকিয়ে থাকে, অন্যটা অনেকখানি ঘুরে গিয়ে হরিণগুলোর অন্য ধারে উপস্থিত হয়। গিয়েই ভীষণ গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে তাদের তাড়া করে। হঠাৎ ভয় পেয়ে হরিণের দল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্ দেয়, সিংহটাও পিছনে পিছনে তাড়া করে যায়। আর এমন ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, যে, হরিণের দল বাধ্য হয়ে সেই লুকান সিংহটার দিকেই যেতে থাকে। তারা ত আর জানে না, যে, অন্য একটা সিংহ সেই পথে লুকিয়ে আছে? কাজেই তারা নিশ্চিন্ত মনে ছুটে মৃত্যুর মুখেই গিয়ে উপস্থিত হয়! হরিণের দল কাছে আসামাত্র, লুকান সিংহটা তাদের মধ্যে লাফিয়ে প'ড়ে, চক্ষের নিমেষে গোটাকতককে মেরে ফেলে।

সিংহ মানুষের শত্রু হলেও সে বড় উঁচুদরের শত্রু, তার মন মহৎ। পেটে ক্ষিদে না থাক্‌লে সে প্রায়ই মানুষের কোন অনিষ্ট করে না। এমন কি, হঠাৎ মানুষের সাম্‌নে পড়ে গেলে, থতমত খেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়। তখন মানুষ যদি একদৃষ্টে তার চোখপানে তাকিয়ে থাকে, তবে, এমনও শোনা গিয়েছে, যে, শেষে সিংহই পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়।



খুব ছোট বাচ্চা সিংহ ধরে আন্‌লে তারা বেশ পোষ মানে এবং সহজেই পালকের (trainer) কাছে নানা রকম খেলা শিখে। সার্কাসে সিংহের নানা রকম খেলা বোধ করি তোমরা দেখেছ। সিংহ তার ট্রেইনারের ইচ্ছামত নানা রকম তামাসা করে বটে, কিন্তু অচেনা লোক তাদের খাঁচায় ঢুক্‌লে তখনই তাকে মেরে ফেলে। একবার প্যারিস্ সহরে একটা সার্কাসে একজন লোক, সিংহের খাঁচায় ঢুকে তামাসা দেখাবার সময় ভীষণ এক দুর্ঘটনা ঘটে-ছিল। লোকটিকে ঊনিশটা সিংহের সঙ্গে খেলা কর্‌তে হয়েছিল। তার মধ্যে ছয়টা সিংহ ছিল তার চেনা, সেগুলোকে সে নিজেই শিখিয়েছিল। বাকি তেরটা সিংহও শিক্ষিত ছিল বটে কিন্তু তাদের শিখিয়েছিল অন্য লোকে। সুতরাং সেই সিংহগুলির কাছে এলোকটি ছিল অচেনা।

খাঁচায় ঢুক্‌বামাত্র হঠাৎ লোকটির পা পিছ্‌লিয়ে যায়। সেই মুহূর্ত্তে একটা অচেনা সিংহ তার উপর লাফিয়ে প'ড়ে, তাকে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে

অন্য অচেনা সিংহগুলোও এসে তাকে আক্রমণ কর্‌ল। তখন মনে হলো, যে, লোকটির মৃত্যু নিশ্চিত।

এমন সময় ভারি আশ্চর্য্য এক কাণ্ড হলো। উনিশটা সিংহের মধ্যে সকলের বড় এবং বলবান্ সিংহটা, চক্ষের নিমেষে অন্য সিংহগুলির মধ্যখানে লাফিয়ে প'ড়ে, তাদের ভীষণ আক্রমণ কর্‌ল। সেই সিংহটা ছিল ট্রেইনারের ভারি প্রিয়, সে তার প্রভুকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে অন্যগুলির সঙ্গে এমনই লড়াই কর্‌ল, যে, সে নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সেগুলিকে কোণঠাঁসা না করে ছাড়্‌ল না। এই অবসরে অন্য লোকেরা খাঁচায় ঢুকে ট্রেইনারটিকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। ট্রেইনারের আঘাত লেগেছিল গুরুতর, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, প্রায় নয় মাস হাঁসপাতালে থেকে সে ভাল হয়েছিল। এরপর সে শুধু তার প্রিয় সিংহটিকে নিয়েই খেলা দেখাত।

ডাব্‌লিন সহরের চিড়িয়াখানায় ভারি বুড়ো একটা সিংহী ছিল। সেটা এতই বুড়ো হয়েছিল, যে, চট্ পট্ নড়ে চড়ে বেড়াতে পার্‌ত না। বেচারির খাঁচায় বড় বড় ইঁদুর ঢুকে তার পায়ে কাম্‌ড়িয়ে দিত। বুড়ো বয়সে বেচারির কষ্টের একশেষ হয়েছিল।

অবশেষে তার দুঃখে কাতর হয়ে তার রক্ষক, তাকে ইঁদুরের উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্য, তার খাঁচায় একটা কুকুর ঢুকিয়ে দিল। কুকুরটা খাঁচায় ঢুক্‌তেই সিংহী উঠে দাঁড়াল সেটাকে মার্‌বার জন্য। কুকুরটা একটুও ভয় পেল না। খাঁচার কোণায় বড় একটা ইঁদুর বসেছিল, সে সটান সেখানে গিয়ে সেটাকে মেরে ফেল্ল। এই ব্যাপার দেখে সিংহীটা ভাব্‌ল—"তাইত! আমি মনে করেছিলাম ইঁদুরের জ্বালায়ই বাঁচি না, তার উপর এটা আবার কি নূতন উপদ্রব এসে জুট্‌ল। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি এ আমার বন্ধু—আমার শত্রু নিপাত কর্‌তে এসেছে।" এই ভেবে সিংহী কুকুরটার সঙ্গে খুব ভাব করে নিল। তখন থেকে প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময়, সিংহী কুকুরটাকে ডেকে কাছে নিয়ে তার বড় থাবাটি দিয়ে তাকে জড়িয়ে শুয়ে থাক্‌ত। কুকুরটাও সিংহীর বিশাল বুকে মাথাটি রেখে আরামে ঘুমাত। আর কি ইঁদুর সিংহীর কাছে আস্‌তে ভরসা পায়? বাকি জীবনটা সিংহী খুব শান্তিতেই কাটিয়ে ছিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

কাজের ফিকির

১

মাচার উপর কলার কাঁদি
নজরে যেই পড়া,

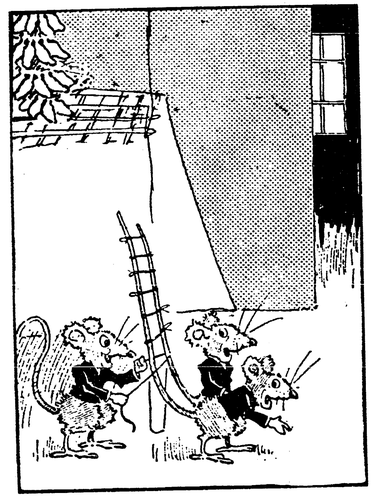

অম্‌নি দেখ, সুরু হ'লো
লেজের সিঁড়ি গড়া;

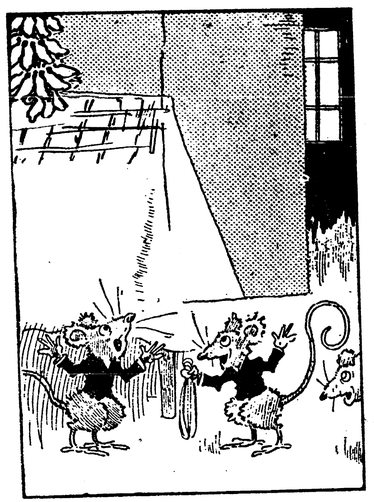



তারপরে বাস্! কার্য্যসিদ্ধি!
যেমন তা'তে চড়া।

২

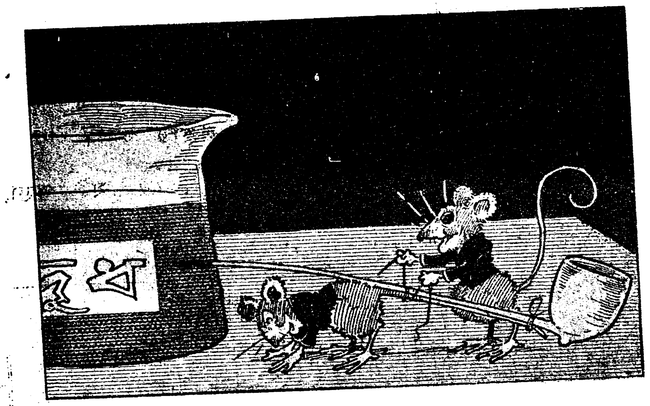

দুধটা খাওয়া সহজ হবে
শিখ্‌লে পরে কল,

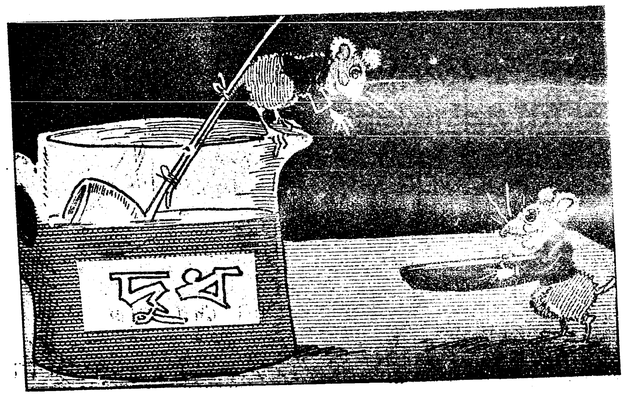

অম্‌নি করে চাপ্‌তে হবে
লেজে বাঁধা নল;

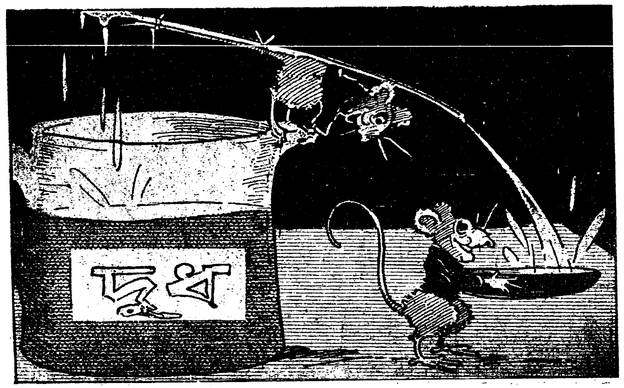

শেষকালেতে ঢাল্‌তে হবে
ঢালে যেমন জল।

৩

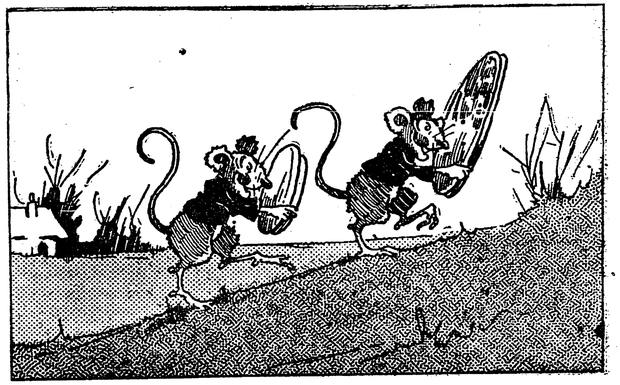

"বাইক" চড়ার সখ্‌ হয়েছে
তাই ত ভাঁড়ার লুট্‌,

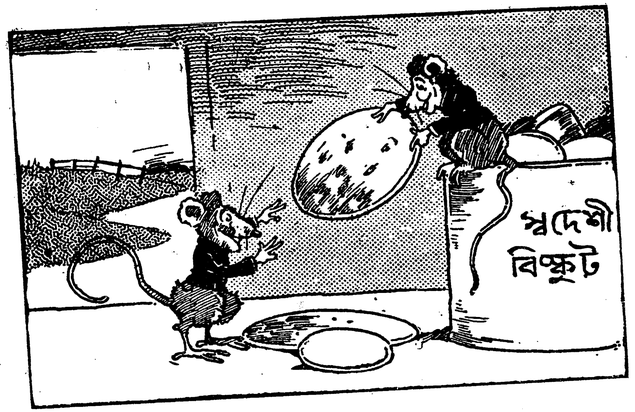

চাকার তরে চাই ত যোগাড়
স্বদেশী বিস্কুট ;

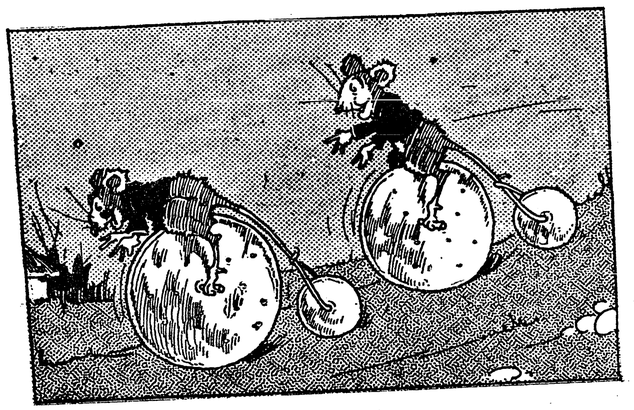

অবাক কাণ্ড! এক্কেবারে
পাল্লা দেওয়া ছুট!

চোর কে ?

দীনু আর বীণা দুই ভাই বোন জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। দুজনেই খুব ভয় পেয়েছে, কিন্তু দীনুর কিনা বার বৎসর বয়স তাই সে মুখে খুব সাহস দেখিয়ে, ছোট বোনকে শান্ত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল। বীণা বল্‌ল, "দাদা, আর ত হাঁট্‌তে পার্‌ছি না, বড় পা ব্যথা কর্‌ছে।" দীনু বল্‌ল, "ভয় কি, এই দেখনা বড় রাস্তার কাছে এসে পড়্‌লাম।" সত্যি কিন্তু সে নিজেই জানে না কোন্‌দিকে বড় রাস্তাটা।

খানিক দূর গিয়ে তারা দুজনে একটা সরু রাস্তা দেখ্‌তে পেয়ে, সেই রাস্তা ধরে হাঁট্‌তে লাগ্‌ল। তাদের মনে আশা হচ্ছিল, যদি কোন বাড়ী দেখ্‌তে পায় তো সেখানে গিয়ে রাত্‌টা বিশ্রাম কর্‌বে। বীণা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ; তাই দীনু ছোট বোনের হাত ধ'রে টেনেই নিয়ে চলেছিল আর গল্প বলে ভয় ভাঙ্গাবার চেষ্টা কর্‌ছিল। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দীনুর মনেও বাঘ ভাল্লুকের ভয় হচ্ছে। শীতের দিন বলে তাদের হাত পা হিমে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

অনেক দূর গিয়ে যখন আর তাদের পা চলে না—এমন সময় দীনু একটা ছোট্ট বাড়ী দেখে হঠাৎ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। সেই বাড়ীতে পৌঁছে অনেক ঠেলাঠেলি কর্‌তেও কেউ কিন্তু দরজা খুল্‌লে দিল না। দীনু বল্‌ল, "বাড়ীতে নিশ্চয় কেউ নেই, পিছনের দরজাও বন্ধ ; চল দেখি জানালা কোন রকমে খুলে ঢুক্‌তে পারি কি না। কি ভাগ্যি আমার পকেটে ছুরিও একটা আছে দেখ্‌ছি"—বলে সে ছুরি বের করে কোন রকমে জানালার ছিট্‌কিনিটা ঠেলে খুলে ফেল্ল। তারপর দুজনে সেই জানালা দিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল।

তারা দেখ্‌ল যে সেটা একটা রান্নাঘর। উনুনে তখনও আগুন জ্বল্‌ছে খাবারও কিছু আছে। বীণা ততক্ষণ উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে হিমে-ভিজা কাপড় সেঁক্‌ছে। দীনু খাবার দেখেই বল্‌ল, "এস বীণা, আমরা খেয়ে নিই।" বীণারও খুব ক্ষিদে পেয়েছে, কিন্তু পরের খাবার খেতে তার তত ইচ্ছা কর্‌ছিল না ; সে বল্‌ল, "দাদা, ওদের খাবার খেলে যে আমাদের চোর মনে কর্‌বে।"

দীনু বল্‌ল, "বাড়ীর লোকেরা এলে তাদের খাবারের দাম দিলেই হবে, আর তারা যখন শুন্‌বে যে আমরা রাস্তা হারিয়ে এখানে এসেছি, তখন বোধ হয় রাগ

কর্‌বে না।” তখন দুজনে সব খাবারগুলি খেয়ে আগুনের পাশে গিয়ে বস্‌ল। তাদের খালি ভয় কর্‌ছিল কখন কে এসে পড়ে। তাই হঠাৎ লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে দীনু লাফিয়ে উঠ্‌ল—“এই রে! এ বাড়ীর কেউ আস্‌ছে; আমি গিয়ে ওদের একটু বলে আসি।” বেচারার মনে একটু ভয়ও কর্‌ছিল লোকেরা রাগ কর্‌বে কি না। দীনু দরজার কাছে গিয়েই দৌড়ে ফিরে এসে বল্‌ল, “বীণা, শীগ্‌গির চল, এখান থেকে পালাতে হবে এক্ষুণি।” বীণা তো অবাক্! সে বল্‌ল, “না দাদা, আমি আর হাঁট্‌তে পার্‌ব না; আমার পায় বড় ব্যথা হয়েছে। কেন পালাতে বল্‌ছ?” দীনু বল্‌ল, “একটু দরজা ফাঁক করে দেখ্‌লাম, যারা এসেছে তাদের চেহারা ঠিক যেন চোর ডাকাতের মত; চল পালাই।” বীণাও খুব ভয় পেল; কিন্তু তখন আর পালাবার উপায় ছিল না, কারণ তখনই তাদের গলার আওয়াজ দরজার কাছে শোনা গেল। একজন বল্‌ছে, “এই ছিদু, শীগ্‌গির্ আয়!” তা'র বিশ্রী গলার আওয়াজ শুনে দীনু আর বীণার বড় ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। বীণা ভয় পেয়ে বল্‌ল, “দাদা, কি হবে?” দীনু বল্‌ল, “দোতালায় উঠ্‌বার একটা সিঁড়ি দেখেছি। এখন আর পালাতে পার্‌ব না; চল উপরে গিয়েই লুকাই।”

তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে পৌঁছেই শুন্‌তে পেল, সেই লোকগুলো একতালার রান্নাঘরে ঢুকে বল্‌ছে, “দেখ্‌ছিস্ না, কেমন আগুন জ্বল্‌ছে? নিশ্চয় কেউ এখানে আছে এখন।” একথা শুনে তাদের আরও ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল। উপরে গিয়ে তারা দেখ্‌ল যে, একটা মাত্র শোবার ঘর, তার এক কোণে একটা বড় দেয়ালের আলমারী।

দীনু বল্‌ল, “শীগ্‌গির্ এস বীণা, এটার মধ্যেই লুকাই; আর ত উপায় নেই।” তখন দুজনে আলমারীর মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আলমারীর ভিতরটা ভয়ানক অন্ধকার আর বাতাস বের হবার পথ নেই;—বীণা তো অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। দীনুর কিন্তু এসব দেখ্‌বার সময় নেই; সে শুধু কাণ পেতে শুন্‌ছে কেউ উপরে আসে কি না। একটু বাদে তার মনে হল যেন কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছে। লোকটা উপরে উঠেই বল্‌ল, “কেউ নেই রে রামা”—বলেই সে নীচে নেমে গেল। দীনু অনেকক্ষণ কাণ পেতে রইল কিন্তু আর কোন সাড়া শব্দ পেল না। তখন বীণা চুপি চুপি বল্‌ল, “দাদা, আমার দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে”! দীনুরও দম আট্‌কে আস্‌ছিল; তাই সে আস্তে আস্তে দরজা খুল্‌ল। ঘরটা অন্ধকার। বীণা তার

কাণে কাণে বল্‌ল, “বাঁচা গেল! কিন্তু দাদা, ওরা হয়ত আবার এক্ষুণি উপরে আস্‌বে; তখন ত আর আমরা সারারাত এই আলমারীতে আট্‌কে থাক্‌তে পার্‌ব না?” দীনুরও সেই ভাবনা; সে বল্‌ল, “তুমি একটু এখানে দাঁড়াও; আমি চুপিচুপি নীচে গিয়ে দেখে আসি। ওরা যদি এখনও রান্নাঘরটায় থাকে তা হ'লে আমরা সাম্‌নের দরজা দিয়ে বাইরে পালাতে পারি”—এই বলে সে নীচে নেমে দেখে সবই অন্ধকার, কেবল রান্নাঘরে আলো দেখা যাচ্ছে আর সেই বিকট গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেই আওয়াজ শুনে তার একটু ভয় কর্‌ল; তারপর সে ভাব্‌ল, ছোট বোন্‌কে বাঁচাতে হবে কোন রকমে।

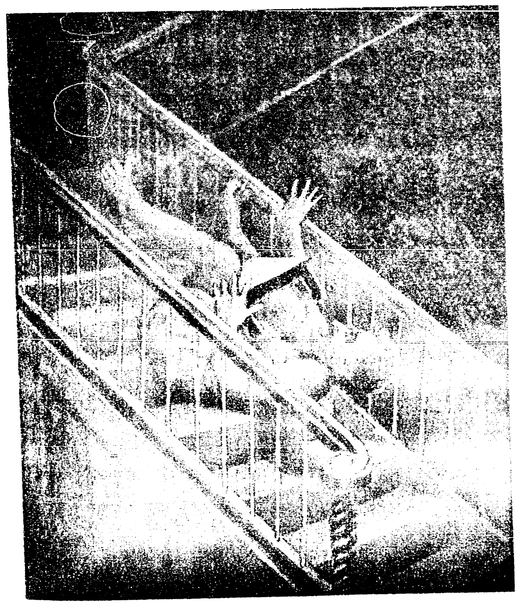

এ কথা ভেবেই তার মনে খুব সাহস হ'ল; সে পা টিপে আস্তে আস্তে ঘর পেরিয়ে দরজার সাম্‌নে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু, অন্ধকারে অর্দ্ধেক পথ যাবার আগেই হঠাৎ কিসে জানি পা লেগে সে পড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে কি একটা জিনিষও ধপ্ করে মাটিতে পড়্‌ল। দীনু বেচারা ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট! সে ভাব্‌ল আর রক্ষে নেই, এখনই সেই লোকটা তাকে ধরে ফেল্‌বে। এই ভেবেই সে বীণার কাছে যাবার জন্য দৌড়ে সিঁড়িতে উঠে পড়্‌ল আর অম্‌নি একটা লোকও সিঁড়ির দিকে ছুটে এল। রান্নাঘরের দরজা খুল্‌তেই আলোটা ঠিক সিঁড়ির উপরে পড়েছিল বলে, দীনু সে লোকটাকে উপরে উঠ্‌তে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেল। হাতের কাছে একটা ছোট চৌকি ছিল, সেটাকে তুলেই লোকটাকে ধাঁই করে মার্‌ল আর

লোকটাও গড়িয়ে সিঁড়ির নীচে পড়ে গেল। তখন তার সঙ্গের লোকটাও এক দৌড়ে এক্কেবারে বাইরে পালিয়ে গেল।

বীণা বল্‌ল, "ও দাদা! লোকটা নিশ্চয় মরে গেছে।" দীনুর মনেও ভয় হচ্ছিল; সে বল্‌ল, "চল নীচে গিয়ে দেখি"—যদিও একথা বল্‌তে তার গলা কেঁপে উঠ্‌ল।

নীচে নেমে লোকটার উপর ঝুঁকে দীনু ভাব্‌ছে কি কর্‌বে (বেচারা ছেলেমানুষ, তখনও তার হাত পা কাঁপ্‌ছিল);—হঠাৎ ভয়ানক চম্‌কে উঠে সে পিছন ফিরে দেখ্‌ল যে সাম্‌নের দরজা খুলে একজন কে এল।

তাঁর চেহারা দেখে দীনুর একটু ভরসা হল, কারণ লোকটি ভালমানুষের মত দেখ্‌তে আর বয়সও বেশী নয়। তিনি ঢুকেই অবাক্ হয়ে দীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "তোমরা কে—আর এ লোকটাই বা কে?" দীনুর তখন একটু সাহস হলো। সে একটু এগিয়ে এসে বল্‌ল, "আমার বোন আর আমি পথ হারিয়ে, জলে ভিজে, ক্লান্ত হয়ে এ বাড়ীতে ঢুকেছিলাম। তারপর এ লোকটা এলো—একে দেখে ভয় পেয়ে আমি এই চৌকিটা ছুঁড়ে মার্‌লাম—এখন কি এরা আমায় পুলিশে দেবে?" একথা শুনে ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লেন, "ধরে নেবে! তোমায়? ঐ লোকটার তো এ বাড়ী নয়, বাড়ী আমারই! এ লোকটা নিশ্চয়ই চোর; গহনা চুরি কর্‌তে এসেছিল বোধ হয়।"—বলেই তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আবার বল্‌লেন, "আমি ছবি আঁক্‌তে আর কবিতা লিখ্‌তে ভালবাসি, তাই এই পাহাড়ের কাছে নির্জ্জনে এই বাড়ীটায় এসে কিছু দিন আছি"। একথা বল্‌তেই একজন সুন্দরী মেয়ে (বোধ হয় তাঁর স্ত্রী) সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "দেখত, আমাদের এই দুটি ছোট্ট অতিথি এসে চোরের হাত থেকে তোমার গহনা বাঁচিয়েছে; এদের রাত্রে খুব ভাল করে খাইয়ে বিশ্রাম কর্‌তে দাও"—বলে দীনুর হাত ধরে তাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন; বীণাও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গেল।

তারপর চোর মহাশয়ের জ্ঞান হলে তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হ'ল। দীনু আর বীণা তাঁদের আদর যত্নে পেট ভ'রে খেয়ে, মনের সাধে গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল।

শ্রীপুষ্পলতা রায়।

মার্কোপোলো

এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীরা, নিজেদের দেশ ছাড়া অন্য দেশের সংবাদ জানিত না। ক্রমে নানা কারণে মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, যে, বিশাল পৃথিবীতে, কূল কিনারা বিহীন সমুদ্রের পর পারে, তাহাদের দেশের মত আরও অনেক দেশ আছে। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র-যাত্রা আরম্ভ হইল, এবং কালে ক্রমে একটি একটি করিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি আবিষ্কৃত হইল, ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরের পরিচয় পাইল। মানুষের মনে এই যে আবিষ্কারের ইচ্ছা জাগিয়াছিল, তাহার মূলে একটি অল্পবয়স্ক বালকের দেশ-ভ্রমণের কাহিনী। সেই বালকের নাম "মার্কোপলো"।



মার্কোপলো পনর বৎসর বয়সের সময় পদব্রজে চীন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কত দেশ পার হইয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল, কত অসভ্য বর্ব্বর লোকের সংস্রবে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। পূর্ব্বকালেও সময়ে সময়ে লোকে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিত না। সেজন্য পরবর্ত্তী পর্য্যটকেরা সে ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কোন সাহায্য পায় নাই। মার্কোপলো বড় হইয়া, তাঁহার ভ্রমণের আশ্চর্য্য ঘটনা সকল পুস্তকে লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তক পড়িয়া লোকে কত সব অজানা দেশ এবং সেই সব দেশের অদ্ভুত মানুষের আর সে দেশের বহুমূল্য ধনরত্নের সংবাদ পাইল। মার্কোপলোর পুস্তক পড়িয়া অন্যেরা শুধু পদব্রজে নয়, জাহাজে চড়িয়াও সে সব দেশে যাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

মার্কোপলো ভিনিস্ নগরে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার বাবা ও কাকা পূর্ব্বে এক-বার চীন দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার যাইবার কালে বালক মার্কোপলোকেও সঙ্গে লইলেন। তখন পলোর বয়স সবে মাত্র পনর বৎসর। তাঁহাদিগকে পাহাড় পর্ব্বত পার হইয়া, ভীষণ মরুভূমির মধ্য দিয়া, আগুনের মত

গরম দেশ এবং দারুণ শীতের দেশের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। পথের অসহ্য কষ্টে মার্কোপলো অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অদম্য উৎসাহ তাঁহাকে সবল করিল এবং তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইরূপে দারুণ কষ্ট যাতনা পাইয়া, অবশেষে তাঁহারা যখন চীন দেশে পৌঁছিলেন, তখন চীনদেশের তখনকার রাজা "কুব্‌লাই খাঁ" তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভারি খুসী হইলেন। মার্কোপলো পরম আদর যত্নে রাজবাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে কুব্‌লাই খাঁর ভারি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। মার্কো অনেকগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখিয়া রাজা তাঁহাকে রাজদূত নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মার্কোপলোকে রাজার আদেশে কোচিন্ চায়না, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্থানে দূতরূপে যাইতে হইত। ফিরিয়া আসিয়া রাজকার্য্যের হিসাব ত দিতেনই, তাছাড়া, দেশের অবস্থা, দেশবাসীর আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, দেশের নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের খাঁটি সংবাদ দিতেন। মার্কোপলোর মত বুদ্ধিমান্ দূত কুব্‌লাই খাঁর সময়ে কেহ ছিল না। সে জন্য কুব্‌লাই খাঁ মার্কোপলো, তাঁহার পিতা এবং কাকাকে কত যে মহামূল্য ধনরত্ন দিয়াছিলেন তাহার সীমা নাই।



পলো-বর্ণিত—হাতীর উপরে কুব্‌লাই খাঁর সিংহাসন।

ক্রমে চীনদেশে বিশ বৎসর কাটিয়া গেল, পলোরা ভিনিসে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। কুব্‌লাই খাঁ এই কথা শুনিয়া ভারি দুঃখিত হইলেন বটে কিন্তু শেষে তাঁহাদের যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। তাঁহারা নিরাপদে ভিনিস্ নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

চীন ভ্রমণে মার্কো যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন সবই তাঁহার পরিষ্কার মনে ছিল। তিনি দেশে ফিরিয়া, সেই সমস্ত লিখিয়া ফেলিলেন। অনেক কাল পর্য্যন্ত লোকে সে সব বৃত্তান্ত পড়িয়া সত্য বলিয়া মানিতে চাহিত না। ভারতবর্ষ এবং চীনের মত এত বড় দেশ আছে আর তাহাতে কোটি কোটি লোকের বাস—এ সকল কথা সকলের নিকট অসম্ভব মনে হইত। সে দেশের ধন দৌলত, মণি মাণিক্য, মূল্যবান্ রেশম, উপাদেয় খাদ্য, উত্তম গন্ধদ্রব্য—এ সকল বিষয়ের কথা পুস্তক পড়িয়া সকলে ভাবিত মিথ্যা। ক্রমে লোকে যখন প্রমাণ পাইতে লাগিল, যে, মার্কোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সত্য কথাই লেখা হইয়াছে, তখন তাহাদের মনে আবিষ্কারের নানা রকম বুদ্ধি খেলিতে লাগিল।

সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক "কলম্বাস্" মার্কোপলোর দুই শত বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন। মার্কোপলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়া তাঁহার অনেক উপকার হইয়াছিল। তিনি যখন সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তখন মার্কোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁহাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল।

মার্কোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে, তাঁহাকে কতটা বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা একটি ঘটনাতেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে।—বিশ বৎসর পরে তাঁহারা যখন ভিনিসে ফিরিয়া আসিলেন, তখন কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল না। এতটুকু মার্কো বাল্যকালে চীনযাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি যে আবার এখন মস্ত বড় পর্য্যটক হইয়াছেন এবং অগাধ ধনরত্ন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন —একথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তখন পলোরা করিলেন কি, মহা ভোজের আয়োজন করিয়া পুরাতন বন্ধু বান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজের দিনে সকলে উপস্থিত হইলে, প্রথমে পলোরা মহামূল্য লালরংএর সাটিনের পোষাক পরিয়া খাবারের ঘরে আসিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই পোষাক বদ্‌লাইয়া আরো মূল্যবান্ পোষাক পরিলেন। এই ভাবে বার কয়েক পোষাক বদ্‌লাইয়া, অবশেষে যে পোষাকে তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যাহা একেবারে মলিন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল—সেই পোষাক পরিয়া আসিলেন। তখন নিমন্ত্রিতেরা অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর সেই

মলিন পোষাকের তালি পটি এবং লাইনিং কাটিয়া যখন দেখান হইল, যে, কাপড়ের তলায় রাশি রাশি মণিমুক্তা রহিয়াছে, তখন সকলের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এবং সকলেই মানিয়া লইলেন, যে, সত্য সত্য পলো পরিবারই দেশভ্রমণ করিয়া এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

আকাশে ওড়া

পাখীর দেখাদেখি মানুষের ও আকাশে উড়্‌বার সখ। উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি ফ্রান্সে মোগলফিয়ে সাহেব আর তাঁর ভাই বেলুনে চ'ড়ে প্রথম আকাশে ভ্রমণ করেন। তখন এই ব্যাপার নিয়ে কতই না হৈ চৈ পড়েছিল। তাঁ'দের পর বেলুনের নানা রকম উন্নতি হয়, কিন্তু, বেলুনের একটা বিশেষ দোষ এই যে, বাতাস যে দিকে চল্‌বে বেলুনও সেদিক ছাড়া অন্য কোন দিকে যেতে পার্‌বে না, আর তা'কে যেমন ইচ্ছা উঠাতে বা নামাতে পারা যায় না।



চম্‌চমের আকারের বেলুনকে Air-ship (এয়ার শিপ্) অর্থাৎ আকাশ-জাহাজ বলা

বেলুন আগে গোলাকারই ছিল। পরে এই বেলুনের আকার বদ্‌লিয়ে তাকে চম্‌চমের আকারে বানিয়ে, তার নীচে চালাবার এঞ্জিন লাগিয়ে বেলুনকে ইচ্ছামত চালাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই

হয়। জার্ম্মেনীর কাউণ্ট্ জেপ্‌লিন সাহেব বহু বৎসর প্রাণপণ খেটে অকাশ জাহাজের নানা রকম উন্নতি ক'রেছেন এবং তার ফলে এখন আকাশ-জাহাজে চ'ড়ে চলা ফেরা করা অনেক নিরাপদ হয়েছে। জার্ম্মেনীতে আকাশ জাহাজে ক'রে রীতিমত ডাক আর আরোহী চালান করা হচ্ছে। ছবিতে দেখ একটা বিরাট আকারের আকাশ-জাহাজের আরোহীরা নাম্‌ছে। জাহাজের কাছে আরোহীরা নিতান্তই ছোট। এই জাহাজে আরোহীদের জন্য খুব আরামের বন্দোবস্ত আছে। জাহাজে খাবার, চা, ইত্যাদিও পাওয়া যায়। পাশে তার বিরাট আস্তাবলটিও রয়েছে।

আকাশ-জাহাজ ছাড়া আর এক রকমের উড়্‌বার কল আছে তার কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনেছ—তার নাম হচ্ছে এরোপ্লেন। আকাশ-জাহাজ বাতাসের চেয়ে হাল্কা ব'লে উড়ে চলে, কিন্তু এরোপ্লেন বাতাসের চেয়ে ভারি। পাখী যেমন বাতাসের চেয়ে ভারি অথচ আকাশে অনায়াসে উড়ে চলে, এরোপ্লেনও

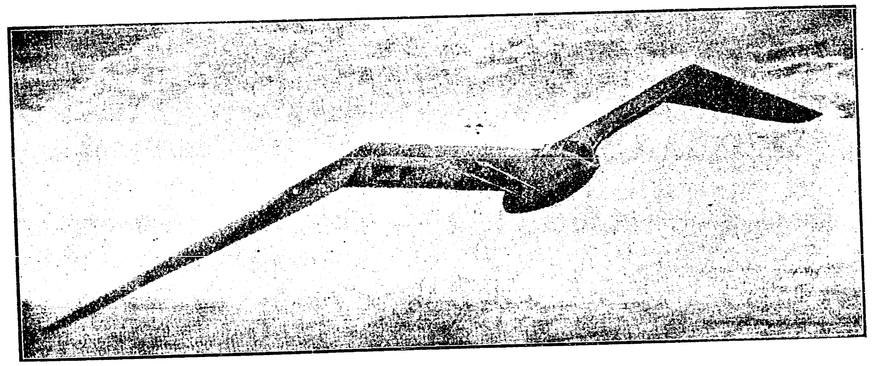

ঠিক সেইভাবেই আকাশে উড়ে চলে। পাখীকে উড়্‌তে দেখে মানুষে প্রথমে দুটি প্রকাণ্ড পাখার সাহায্যে উড়্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল। তা'তে ভাল কাজ না হওয়ায় ডানা আর ঘুড়ির মাঝামাঝি একটা কল বানিয়েছিল। তার সাহায্যে সামান্য দূর ওড়া গিয়েছিল। এ বৎসর জার্ম্মেনীতে একজন এঞ্জিনিয়ার ঠিক পাখীর আকারে একটা ঐ রকম উড়্‌বার কল বানিয়ে অনেক দূর উড়েছিলেন। ছবিতে দেখ কেমন সুন্দর উড়্‌ছে সেই কল।

মানুষ প্রথমে চালাবার কলের সাহায্য ছাড়া, শুধু নিজের শরীরের বলের সাহায্যে উড়্তে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু, শেষে দেখা গেল যে মানুষের শরীরের বল অতি সামান্য এবং দমও কম; তার সাহায্যে বেশী উড়া সম্ভব হয় না। তাই নানা রকমের কলে চালান এরোপ্লেন তৈয়ারী হ'লো। এই এরোপ্লেনেরই নানা রকম উন্নতি হয়ে আজকাল এরোপ্লেনে চলা ফেরা অনেক বেড়ে গেছে। এরোপ্লেনে করে ডাক যাচ্ছে, এরোপ্লেনে যুদ্ধও চল্‌ছে।

তোমরা অনেকে হয় তো এরোপ্লেন দেখেছও। সম্প্রতি একটা কথা উঠেছে যে, বিলাত থেকে এ দেশে এরোপ্লেনে ডাক আস্‌বে আর আরোহীও আস্‌বার বন্দোবস্ত করা হবে। এরোপ্লেনের এক মস্ত সুবিধা এই যে, আকাশ পথে কোন রাস্তা দেখে চল্‌তে হয় না—একেবারে সোজা রাস্তায় চলে আসা যায়। তা' ছাড়া শূন্যে খুব জোরেও যাওয়া যায়। বিলাত থেকে এ দেশে ৪।৫ দিনেই আসা যাবে। এখন জাহাজে আস্‌তে ১৬।১৭ দিন লাগে।

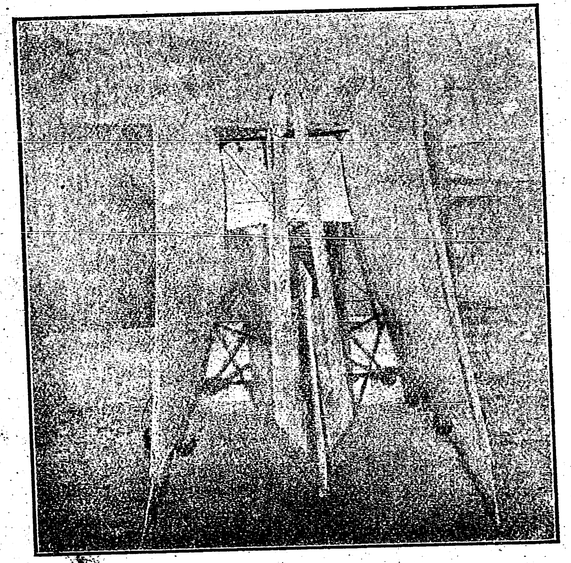

এরোপ্লেন যাতে সকলেই ব্যবহার কর্‌তে পারে, সে জন্য নানা রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। এরোপ্লেনের ডানাই বড় আপদ। তাকে সাম্‌লাতেই অনেক জায়গা চাই। সে জন্য জার্ম্মেনীতে এক রকম এরোপ্লেন তৈরী করা হয়েছে, তার ডানা দুটো মুড়ে এরোপ্লেনটাকে একটি সাধারণ আস্তাবলে রেখে দেওয়া যায়। তা' ছাড়া এই এরোপ্লেনকে চালানও নাকি বেশ সহজ; একজনেই সাম্‌লাতে পারে।

আজকাল নূতন এক জাতের এরোপ্লেন তৈরী করা হয়েছে তার তলায় নৌকার মত একটা জিনিষ লাগান আছে। এই এরোপ্লেন জলেও চল্‌তে পারে আকাশেও

উড়্তে পারে। এর নাম হচ্ছে "হাইড্রো-প্লেন" ('হাইড্রো'—অর্থাৎ জল)। ছবিতে দেখ একটা হাইড্রোপ্লেন জলে ভাস্‌ছে। এটা ফিলিপাইন দ্বীপের

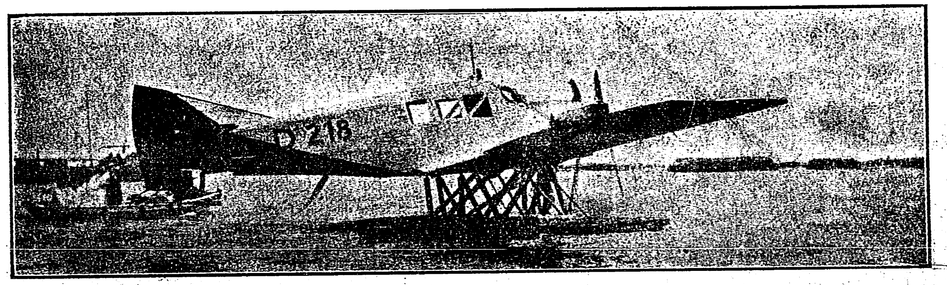

রাজধানী হাভানা সহর থেকে ব্রেজিলের রাজধানী পর্য্যন্ত, নিয়ম মত যাতায়াত করে।

সম্প্রতি বিলাতে একটি দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। লণ্ডন থেকে একটি এরোপ্লেনের ডাক যাচ্ছিল লিভারপুলে। মাঝপথে এরোপ্লেন হঠাৎ মাটিতে প'ড়ে গিয়ে এরোপ্লেনের আরোহী, চালক সব মারা যায়। পরে অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল যে, দু'জন আরোহী মাঝপথে মল্লযুদ্ধ করাতে এরোপ্লেন টল্‌মল ক'রে উল্টে যায়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এরোপ্লেনে ওড়া এখনও তত নিরাপদ হয়নি। আকাশে এরোপ্লেন যা'তে টল্‌মল না করে তার জন্য অনেক রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরোপ্লেনের ডানা আগে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাক্‌ত; তার ফলে, মাঝে মাঝে কাপড় ছিঁড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘট্‌ত। এখন এলুমিনিয়ামের ডানা তৈরী হচ্ছে। আগে এরোপ্লেনের এঞ্জিন ছিল একটা; এখন দুইটা এঞ্জিন লাগান থাকে—একটা বিগ্‌ড়িয়ে গেলে আরেকটা চালিয়ে দেওয়া হবে। মাটি থেকে উপরে থাক্‌লেও যাতে মাটির লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে পারা যায়, তার জন্য বিনা-তারের টেলিফোন থাকে। এরোপ্লেনের আকারটাকেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হচ্ছে;—যা'তে আকাশে খুব স্থিরভাবে ওড়া যায় আর বাতাসের ধাক্কাটা বেশী জোরে না লাগে। এই সব উন্নতির ফলে যে এরোপ্লেন তৈরী হয়েছে তা'র ছবি দিলাম। সারি সারি ৬।৭টা এরোপ্লেন রয়েছে, আর একটা এরোপ্লেন আকাশে উড়্ছে।

অজানা দেশের ভিতর দিয়ে যেতে স্থলপথে কত ভয়, কত বিপদ থাকে, কিন্তু এরোপ্লেনে সেই দেশ আকাশ-পথে পার হ'লে সে সব ভয় থাকে না। আকাশ তো

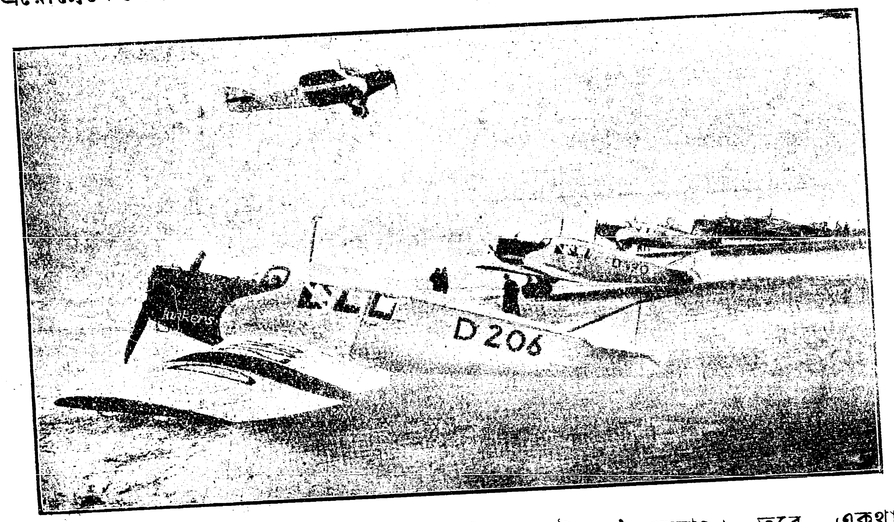

সবই সমান;—কেবল ঝড়-বৃষ্টি, মেঘ-বিদ্যুতেরই যা' তফাৎ। তবে, একথা একেবারে ঠিক নয়। যাঁরা আকাশপথে চলেন তাঁরা বলেন যে, ঝড়ে এরোপ্লেনকে তত সহজে কাবু করে না;—বরং ঝড়ের গতির উল্টোদিকেও এরোপ্লেন সহজেই চলে। আকাশে মাঝে মাঝে একরকম 'পকেট' ('Air-pockets') থাকে, সেখানে নাকি হঠাৎ বাতাস ক'মে যায় আর এরোপ্লেন এই 'পকেট'এর মধ্যে পড়্লেই বেখাপ্পা রকমে টলমল কর্তে থাকে। এই ভাবে অনেক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। কেন যে এই 'পকেট' হয়, কি করে এই 'পকেট'এর স্থান নির্দ্দেশ করা যায়, তা' কেউই বল্তে পারে না। আমাদের দেশের আকাশে নাকি 'পকেট' থাকে না আর এ দেশের হাওয়ার গতিও নাকি এরোপ্লেন চালাবার পক্ষে সুবিধাজনক।

শ্রীসুবিনয় রায়।



সুকুমার রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত

সূর্য্যাস্তে গঙ্গা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সন্দেশ

একাদশ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩০ | ৭ম সংখ্যা

আনন্দ

যে আনন্দ ফুলের বাসে, যে আনন্দ পাখীর গানে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দে বাতাস বহে, যে আনন্দ সাগর জলে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়, যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দে আকাশ ভরা, যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ সকল সুখে, যে আনন্দ রক্তধারায়,
সে আনন্দ মধুর হয়ে, তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মত, থাকুক তব জীবন ভরি।

সুকুমার রায়।

COLOURED DOCUMENT.

অপরাজিতা ফুলের কথা

সরযূতীরে অযোধ্যায় সেকালে দুটি ছেলে মেয়ে বাস করত। ছেলের নাম যোধন, মেয়ের নাম সুরূপা। তাদের ভারী ভাব ছিল, এম্নি ভাব যে দুদণ্ডও ছাড়া-ছাড়ি হত না। সুরূপার মা বল্‌তেন যেখানে যোধন, আমি জানি আমার সুরূপাকেও সেইখানেই খুঁজে পাব, ওরা যেন মাণিক-জোড়! পণ্ডিতমশায়ের কাছ হতে ছুটি পেলেই তারা নদীর ধারে বনে বনে ফুল তুলে বেড়াত, এম্নি করে সেই অঞ্চলের প্রায় সব ফুলের নামই তাদের জানা হয়েছিল। ফুলেদের জন্মস্থান, তাদের জীবন ইতিহাস, দৈনিক জীবন যাত্রা, কোথায় থাকে কি খায়, কি খেতে পেলে, কেমন জায়গায় হাওয়া খেলে, আর রাতে ঘুমলে তাদের শরীর ভাল থাকে, রং ভাল হয়, আর শীগ্‌গির শীগ্‌গির বেড়ে ওঠে, এ সব কথা তারা দুজনে বেশ ভাল করেই শিখে নিয়েছিল।

একদিন বৈশাখের ভোরে, বেড়াতে বেড়াতে তারা একটি ছোট্ট নদীর ধারে এসে পৌঁছল। এই নদীটি গিয়ে সরযূর সঙ্গে মিশেছে। নদীর ধারটি গাছ-পালায় সবুজ, আর সে সব গাছ পালা এম্নি ঘন যে, চারিদিক ছায়ায় ঘেরা, যত্নে সাজান যেন একখানি কুঞ্জ। এদিকে ওদিকে ঘুরে দুজনে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়্‌ল, তখন এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে, লতায় পাতায় ঘেরা, সুগন্ধে মনোহর, ছায়ায় সুশীতল কুঞ্জ বনের দুয়ারের কাছে এসে বসে রইল। সেখানকার ঘাস এমন ঘন যে, মনে হয় যেন তারা খুব পুরু নরম মখমলের সবুজ গাল্‌চের উপর বসে আছে। চারিদিকে মৌমাছি কেবলি গুণ-গুণ করে, এক ফুল হ'তে আর এক ফুলের কাছে গিয়ে মধু সংগ্রহ কর্‌ছিল। ঝোপের আড়ালে ঝিঁঝিঁ অনবরত ডাক্‌ছিল, ঠিক যেন কে তানপুরার পাঁচটি তারের উপর কেবলি আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে কোকিল ডাক্‌ছিল, দয়েল শীষ দিচ্ছিল, পাপিয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছিল, আর ঘুঘুর সেই একটানা গানেরও বিরাম ছিল না। ফুলের গন্ধের ভারে বিভোর বাতাস আর দৌড়ে চল্‌তে পার্‌ছিল না, পদে পদে থেমে পড়্‌ছিল। দুপুরের কড়া রোদ, গাছের পর্দ্দার মধ্যে এসে, মোলায়েম হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল! সে যেন ঠিক্ সন্ধ্যা রাতের জ্যোৎস্না! চারিদিকে ঝিঁঝিঁ সেই একঢালা সুরে ঘুমের মন্ত্র পড়্‌ছিল। চুপ করে বসে বসে, যোধনের শরীর এলিয়ে এল, চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে মাঝে মাঝে বুজে আস্‌তে লাগ্‌ল। সুরূপার হ'ল উল্টো, মন্‌টা তার ভারী

জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল, সে চোখ চেয়েই স্বপনের দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। হঠাৎ নদীর পাড়ে জলের ধারে, কতকগুলি অজানা ফুল দেখে, সে একেবারে ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এমন ফুল আর কখনোত দেখেনি, একই লতায় অনেকগুলি ফুটেছে। কতক তার খোলা আকাশের মত ফিঁকে নীল, কিছু বা বর্ষার মেঘে নুয়ে পড়া আকাশের মত ঘননীল, তার সঙ্গে ধোঁয়ার ধূসর আভা, আবার কতকগুলি সাগরের জলের মত একেবারে গাঢ় নীল। ফুলগুলির গড়ন পল্‌তে পরান কালো মাটীর প্রদীপের মত। চোখের পাতার আকারের কচি শ্যাম পাতার মধ্যে কালো চোখের মত ঘন নীল ফুলগুলি দেখে, সুরূপা উৎসাহের সঙ্গে জোরে বলে উঠ্‌ল, "দেখো দেখো কি চমৎকার নতুন ফুল, এমনটিতো আর কখনো দেখিনি!" হঠাৎ চম্‌কে উঠে যোধনের ঘুমও ভেঙে গেল, সেও বলে উঠ্‌ল, "কৈ, কৈ, কোথায়?" সুরূপা ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখালে, আর বল্লে, "যোধন ভাই, এ ফুল আমায় এনে দিতে হবে।" লতাটি নদীর খাড়া পাড়ের গা বেয়ে উঠেছিল, যেখানে ফুটেছিল, সেখানে নেমে তাদের তুলে আনা কঠিন কাজ, কিন্তু যোধনের সেকথা মনেই আসেনি। এক তো সুরূপা যখন বলেছে, তখন সে কাজ না করে, তার চোখে খাটো হবার ইচ্ছে যোধনের মোটেই ছিল না। তার উপর ঘুমের ঘোর তখনও ভালো করে ছোটেনি, তাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ধারণা কর্‌বার অবস্থা তখনও তার হয়নি। সাবধানে একটা গাছের ঝুঁকে-পড়া ডাল ধরে, সে নেমে গেল, এক হাত বাড়িয়ে যেম্নি ফুলগুলি তুল্‌বে, অম্নি অন্য যে হাতে সে গাছের ডাল ধরেছিল, সেই হাত আল্‌গা হয়ে খসে গেল। ঝোঁক্ সাম্‌লাতে না পেরে, ছিট্‌কে গিয়ে সে নদীর একটা আবর্ত্তের মুখে পড়ে গেল, সেখান হতে আর উঠ্‌তে পর্‌ল না। জলের পাকে কষে বেঁধে কে যেন তাকে টেনে টেনে ডুবিয়ে দিল। একেবারে তলিয়ে যাবার আগে, সে একটিবার সেই ঘূর্ণীপাকের উপরে হাত তুলে, চেঁচিয়ে বল্লে, "ভুলো না"—"ভুলো না"!

সেই হতে অপরাজিতা স্মৃতির ফুল হয়ে আছে। অসীম আকাশের মত, অতল সাগরের মত, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের নীলকণ্ঠের মত তার রং সুনীল। সারা বৎসর ধরে, সব ঋতুতেই এফুল ফোটে। বর্ষার দুঃখ, শীতের নিষ্ঠুরতা, কিছুতেই তাকে আটক কর্‌তে পারে না। স্মৃতির মত সেও অমর আর তেম্নি অপরাজিত।

(জর্ম্মান কাহিনী)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বাহাদুরী

(সত্য ঘটনা)

"দেখ দেখ মাইকেলকে দেখ। ওকে দেখ্‌লেই আমার হাত নিস্ পিস্ করে।" তিন শ বছর আগে ফ্লাশিংএর এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন স্ত্রীলোক আর একজনকে এই কথা বল্‌ছিল। দুই পকেটে দুই হাত দিয়ে যে ছোট ছেলেটি তাদের সাম্নে দিয়ে যাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে অন্য স্ত্রীলোকটি বল্‌ল "কেন ?"

প্রথমজন উত্তর দিল, "ওর অহঙ্কারের ভাব দেখ্‌লে গা জ্বালা করে, সবটাতেই ওর বাহাদুরী নেওয়া চাই। দেখে নিও, এম্‌নি করে ও একদিন গোল্লায় যাবে। অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।" অন্যজন তাতে বল্‌ল, "কিন্তু এইরকম বাড়াবাড়ি কর্‌তে কর্‌তে অনেক সময় বড়লোকও হওয়া যায়।" ছেলেটি ততক্ষণে বাজারের দিকে চলে গেছে, কোথায় কোথায় কি দুষ্টুমি করবে তারি খোঁজে। ঠিক সেই সময়ে সে একটা দুষ্টুমির সুবিধাও পেয়ে গেল। একটা গির্জ্জার চূড়া মেরামত করা হচ্ছিল, তার ছাতে পুরাণ শ্লেট পাথর বদ্‌লিয়ে নূতন শ্লেট বসান হচ্ছিল। মজুরেরা তখন কি কাজে চলে গেছে, কিন্তু তাদের লম্বা লম্বা মই গুলো চূড়ার গায়েই দাঁড় করান আছে। মাইকেল ভাব্‌ল "এই সুবিধা। একবার যদি ঐ চূড়োর উপর চড়তে পারি তবে কি মজাটাই হয়।" যেম্‌নি ভাবা তেম্‌নি কাজ করা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মই বেয়ে সে উঠে গেল। গির্জ্জার চূড়ার মাথাটা ক্রমে সরু হয়ে গেছে, তার উপরে আবার একটা সোণালী রংএর গোলার মত গোম্বুজ, তার উপরে লোহার ডাণ্ডার আগায় weather vane (বাতাসের দিক্-নির্ণয় যন্ত্র)। সেই সোণালী গোলাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে মাইকেল শুন্‌তে পেল, নীচে মজুরেরা কথাবার্ত্তা বল্‌ছে। কিন্তু সে তাদের জান্‌তে দিল না যে, সে উপরে বসে আছে। এত কষ্ট করে যখন উঠা গেছে তখন এত শীঘ্র যে তারা তাকে ধরে জোর করে নামিয়ে নেবে, তাকি সয় ? সকলে এক বার তার বাহাদুরীটা দেখ্‌বে না ? তাই সে চুপ করে রইল।

খানিক পর, মাইকেল আস্তে আস্তে লোহার ডাণ্ডাটা ধরে উঠে দাঁড়াল। সেই শূন্যের উপর মাথা ঠিক রেখে দাঁড়িয়ে থাকা যে সে লোকের কাজ নয়। বাজারের রাস্তা থেকে হঠাৎ বোধ হয় কেউ উপরে গির্জ্জার চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে, কারণ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাজার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, সবাই একদৃষ্টে গির্জ্জার

চূড়ার উপরে সেই ছোট্ট মানুষটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর তাদের বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ কর্‌ছে, এই বুঝি পড়ে যায় ভেবে। মাইকেল ত তাই চায়; এতগুলি লোক তাকে দেখ্‌ছে ভেবে তার ভারি স্ফূর্ত্তি হ'ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ উপরে থাকাও আবার নিরাপদ নয়। লোকেরা নিশ্চয় তাকে নামাবার যোগাড় যন্ত্র করবে, আর, নামিয়ে আন্‌লে পরে তার বাবা হয়ত তাদের সকলের সাম্নেই তাকে মার দেবেন; তারচেয়ে মানে মানে নিজেই নেমে পড়া ভাল। এই মনে করে মাইকেল নাম্‌তে গেল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! মজুরেরা কখন মই নামিয়ে নিয়ে গেছে! এখন উপায়? অবশ্য লোকেরা এখনি মই নিয়ে এসে তাকে নামাবার চেষ্টা করবে; কিন্তু তা'হলে বাহাদুরী আর রইল কোথায়? এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মাথাটা ঘুরে গেল, এক মুহূর্ত্ত সে স্থির হয়ে রইল। তারপর গোম্বুজের গোলাটাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে সড় সড় করে নেমে পড়্‌ল। গোলাটার পেটের কাছটা এত মোটা যে, তার আঙ্গুলে ভয়ানক টান পড়্‌তে লাগ্‌ল। মাঝ পথে এসে, গোম্বুজের নীচে গির্জ্জার চূড়ার আগায় তার পা ঠেক্‌ল। তার পায়ে ছিল লোহার নাল বাঁধা জুতা। সেই জুতা দিয়ে এক লাথি মেরে সে একটা শ্লেট ভেঙ্গে ফেলে পা রাখবার যায়গা করে নিল। গির্জ্জার



চূড়া আর গোম্বুজের মাঝখানের সরু যায়গাটা কোন রকমে ধর্‌তে পারলেই সে বেঁচে যায়। কিন্তু গোম্বুজটাকে জড়িয়ে কোন রকমে দাঁড়ান যাচ্ছে, ছেড়ে দেওয়া বিপদ। উল্টে পড়ে যাবার আগে, তাড়াতাড়ি সরু যায়গাটা ধর্‌তে না পারলে মৃত্যু নিশ্চয়। হঠাৎ সে হাত ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে ঝুঁকে পড়ল। নীচের লোকদের মুখ ভয়েতে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোক ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "বলেছিলাম না, বলেছিলাম না।" আর একজন বল্‌ল, "রাখ, দেখ আগে।" বাস্তবিক তারা দেখ্‌ল, নিমেষের মধ্যে মাইকেল গোম্বুজের গোড়াটা ধরে ফেলেছে। তারপর জুতার বাড়ীতে পুরাণ শ্লেটগুলি ভেঙ্গে, তার নীচের কাঠে পা দিয়ে দিয়ে সে গির্জ্জার চূড়ার পিছল ছাত বেয়ে নেমে এল। তারপর চূড়ার সব চেয়ে উপরের জানালা খুলে, ভিতরের সিঁড়িতে আস্‌তেই তার বাবা তাকে ধ'রে ফেল্‌লেন। দুর্দ্দান্ত মাইকেলকে আঁট্‌তে না পেরে, তার বাবা বিরক্ত হয়ে তাকে নাবিক করে সমুদ্রে পাঠিয়ে দিলেন।

অনেক বছর পরে একদিন এক থুড় থুড়ি বুড়ি, আর এক বুড়ির সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসে বল্‌ল, "শুনেছ? এ্যাড্‌মিরাল মাইকেল ডি রয়টারের কীর্ত্তির কথা? কেমন যুদ্ধ জিতেছে? মনে আছে যে দিন সে গির্জ্জার চূড়ো বেয়ে উঠেছিল? কে জান্‌ত সে এমন একটা বড় লোক হবে।"

শ্রীসুখলতা রাও

অদ্ভুত চাকর

অনেক দিন আগে এক রাজকুমারী ছিলেন, তাঁর মত সুন্দরী তখন খুব কমই দেখা যেত। যে দেখ্‌ত সেই তাঁকে ভালবাস্‌ত। কিন্তু এত আদর যত্ন, এত ভালবাসা পেয়েও তাঁর মনে সুখ ছিল না, কারণ তাঁর মা ছিলেন বড় নিষ্ঠুর। তিনি লোককে কষ্ট দিয়ে যেমন আনন্দ পেতেন তেমন আর কিছুতে পেতেন না।

রাণীর জ্বালায় রাজবাড়ীর সকলে অস্থির! রাজকন্যা ভাব্‌তেন যে, তাঁর বিয়ে হয়ে গেলেই কষ্ট দূর হবে। অনেক রাজকুমারই তাঁকে বিয়ে কর্‌তে চাইতেন কিন্তু

তাঁর মায়ের জ্বালায় এ পর্য্যন্ত কেউ তাঁকে বিয়ে কর্‌তে পারেনি। কেউ রাজকন্যাকে বিয়ে কর্‌তে এলে, রাণী তাকে ভারি কঠিন কোন কাজ কর্‌তে দিয়ে বল্‌তেন —"যদি এ কাজ কর্‌তে পার, তবে রাজকন্যাকে পাবে আর যদি না পার, তবে তোমার মাথাটি কেটে ফেল্‌ব।" এই রকম দারুণ সর্ত্তের কথা শুনে সব রাজকুমারই ভয়ে চম্পট্ দিতেন। কাজে কাজেই রাজকুমারীরও দুঃখের শেষ হ'ত না।

একদিন রাজকুমারী তাঁর সখীদের সঙ্গে প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে এক বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় এক রাজকুমার সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এবং তক্ষুণি তিনি তাঁকে বিয়ে কর্‌বার জন্য রাজপ্রাসাদে চল্‌লেন।

প্রাসাদে যেতে হলে একটা বনের ধার দিয়ে যেতে হয়। রাজকুমার সে পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেন, সাম্‌নেই একটা মস্ত কি জানি জানোয়ার শুয়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে দেখ্‌লেন সেটা জানোয়ার নয়, একজন ভীষণ মোটা লোক। মোটা লোকটি তাঁকে দেখেই বল্‌ল—"আপনার কি চাকর চাই?" রাজকুমার বল্‌লেন—"বাবা! তোমার মত মোটা লোক দিয়ে আমি কি কর্‌ব? আচ্ছা তবু চল আমার সঙ্গে।" লোকটি বল্‌ল—"মোটাতে কি আসে যায়? দেখ্‌বেন এখন, আমি কত যত্ন করে আপনার কাজ কর্ম্ম করি।" রাজকুমার মোটা লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখ্‌লেন, ঘাসের উপর কাণ দিয়ে একজন লোক শুয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"এই! ঘাসে কাণ দিয়ে পড়ে আছ কেন?" লোকটি বল্‌ল—"দাঁড়ান মশায়! পৃথিবীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত কথা আমি কাণ দিয়ে শুন্‌ছি।" রাজকুমার অবাক্ হয়ে বল্‌লেন—"তবে চল বাপু আমার সঙ্গে। ভবিষ্যতে তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে।"

তিনজনে খানিক দূর গিয়েছেন এমন সময় হঠাৎ দেখ্‌লেন এই বড় ঢেঙ্গা দুটো পা! তার উপর দেখ্‌লেন শরীরটা, অবশেষে অনেক উঁচুতে মাথাটাও দেখা গেল। রাজকুমার অবাক্ হয়ে বল্‌লেন—"বাবারে, কি অদ্ভুত লম্বা মানুষ তুমি?" ঢেঙ্গা লোকটি বল্‌ল—"এ আর কি দেখ্‌ছেন! আমি ইচ্ছা কর্‌লে খুব উঁচু পাহাড়ের চেয়েও তিন গুণ লম্বা হতে পারি।" রাজকুমার খুসী হয়ে তাকেও সঙ্গে নিলেন। তখন ভারি অদ্ভুত এক কাণ্ড হলো! ঢেঙ্গা লোকটি বিড় বিড় করে কি বল্‌তেই, সে হঠাৎ ছোট্ট হয়ে সাধারণ মানুষের মত হয়ে গেল! তারপর

এই অদ্ভুত দলটি খানিক দূর গিয়ে দেখ্‌ল, একজন লোক দুপুররোদে বসেও ঠক্ ঠক্ করে শীতে কাঁপ্‌ছে। রাজকুমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, যে তার কোন অসুখ করেছে কিনা! লোকটি বল্‌ল, —"বোধ হয় ত আমার কিছু হয়েছে কারণ যত রোদের তেজ বাড়ে আমিও তত কেঁপে মরি; আবার শীতকালে গরমের জ্বালায় প্রায়ই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।" রাজকুমার দেখ্‌লেন যে, এ অদ্ভুত লোকটিকে নিয়ে তাঁর কোন উপকার হবে না, তবু বেচারাকে ফেলে যেতে ইচ্ছা হ'ল না, তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চল্‌লেন।

খানিক দূর গিয়ে দেখ্‌লেন, একজন লোক পায়ের আঙ্গুলগুলোর উপর ভর দিয়ে উঁকি মেরে চারদিকে চেয়ে যেন কি দেখ্‌ছে। রাজকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তুমি কি খুঁজ্‌ছ বাপু? কিছু হারিয়েছে কি?" সে বল্‌ল—"না, হারাইনি; আমার দৃষ্টি খুব প্রখর, পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তাই চেয়ে দেখ্‌ছি।" রাজকুমার একেও সঙ্গে নিলেন। এমনি করে পাঁচজন অদ্ভুত চাকর নিয়ে রাজকুমার রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন এবং সোজা রাণীর কাছে গিয়ে রাজকুমারীকে বিয়ে কর্‌তে চাইলেন। রাণী খুব খুসী হয়েই বল্‌লেন—"বেশত! ভালকথা। কিন্তু রাজকুমারীকে বিয়ে কর্‌বার আগে তিনটি কাজ কর্‌তে হবে।" রাজকুমার আগে থেকেই তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, বল্‌লেন—"কি তিন্‌টে কাজ?" রাণী বল্‌লেন—"আমি রেড্-সিতে (Red-sea) একটা আংটী ফেলে এসেছি সেটা নিয়ে এসো।"

রাণীর কথা শেষ হওয়া মাত্র রাজকুমারের প্রখর দৃষ্টিওয়ালা চাকরটি বলে উঠ্‌ল —"হাঁ ঠিক্! ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছি। সবুজ পাহাড়ের তলায় আংটিটা পড়ে আছে।" আর অম্‌নি লম্বা মানুষটি লম্বা হাত বাড়িয়ে আংটিটা তুলে নিয়ে এলে। রাণী অনেক কষ্টে রাগ চেপে বল্‌লেন—"বেশ! বেশ! এইবার দ্বিতীয় কাজ, এটা কিন্তু ভারি শক্ত। ঐ যে দেখ্‌ছ একশটা মোটা ষাঁড় রয়েছে, দুপুরের আগেই সব-গুলোকে খেয়ে শেষ কর্‌তে হবে; তারপর মাটীর নীচে একশ পিঁপে মদ আছে তাও সব খেয়ে শেষ কর্‌তে হবে।" রাজকুমার বল্‌লেন—"এ আর এমন কি শক্ত? তবে আমি অন্য একজনকে কি একাজে নিমন্ত্রণ কর্‌তে পারি?" রাণী হেসে বল্‌লেন—"নিশ্চয়! তবে মোটে একজন কিন্তু।" রাজকুমার মোটা মানুষটির দিকে চাইলেন। সে তাতে মহাখুসী হয়ে দুপুরের আগেই সব খেয়ে সাবাড় করে দিল; শুধু পড়ে রইল একশটা পিঁপে আর এক গাদা হাড়।



রাজকুমার আর পাঁচ চাকর

রাণী এবারে সত্যি খুব চটে গিয়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা! এইবার তৃতীয় কাজ। আজ সন্ধ্যার সময় মেয়েকে তোমার ঘরে রেখে আমি চলে যাব, তুমি তাকে পাহারা দিবে। ঠিক্ দুপুর রাত্রে যখন আমি ফিরে আস্‌ব, তখন সেখানেই যেন মেয়েকে দেখ্‌তে পাই।" রাজকুমার মনে মনে ভাব্‌লেন, "এটা আর তেমন শক্ত কাজ কি। আমি আমার পাঁচজন চাকরের সাহায্যে রাজকুমারীকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব।" সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী এলেন। রাজকুমার তাঁকে জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তারপর রাণী চলে গেলে, সেই পাঁচজন অদ্ভুত লোক যে যার কাজের বন্দোবস্ত করে নিল। লম্বা লোকটি নিজেকে খুব লম্বা করে দিয়ে বাড়ীর চারদিকে ঘিরে রইল, যাতে কেউ বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে কিংবা বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রখর দৃষ্টিওয়ালা লোকটি বড় বড় চোখ দিয়ে রাণীর গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌ল আর যার কাণ খুব ভাল, সে মাটিতে কাণ পেতে সব শুন্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে দুষ্টু রাণী কর্‌লেন কি, ঠিক রাত এগারটার সময় মন্ত্র পড়ে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে ফেল্লেন আর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু রাণী যতই চালাক হউন না কেন, রাত বারটার পর আর তাঁর মন্ত্রের কোন শক্তি রইল না। তখন রাজকুমার হঠাৎ চম্‌কে জেগে উঠে দেখেন যে, রাজকুমারী নাই। তিনি চীৎকার করে উঠ্‌তেই, যার কাণ খুব ভাল সে বল্‌ল—"ব্যস্ত হবেন না, আমি তাঁর কান্না শুন্‌তে পাচ্ছি কিন্তু অনেক দূরে।" প্রখর দৃষ্টিওয়ালা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি! তিনশ মাইল দূরে ঐ পাহাড়ের উপর তিনি বসে আছেন"। এই কথা বল্‌তেই সেই লম্বা লোকটি হাত বাড়িয়ে তাঁকে নিয়ে এলো। বাস্! আবার সব ঠিক্‌ঠাক্।

রাত বারটার পর রাণী এসে, রাজকুমারীকে ঠিক সেই জায়গায় দেখ্‌তে পেয়ে খুবই আশ্চর্য্য হলেন! কি আর করেন, অগত্যা রাজকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হলেন, কিন্তু চলে যাবার সময় রাজকুমারীর কাণে কাণে বলে গেলেন —"লজ্জার কথা! একদল চাকরের সাহায্যে তুমি রক্ষা পেলে।"

রাজকুমারী একটু অসন্তুষ্ট হয়ে রাজকুমারকে বল্‌লেন—"আমি এই বিয়েতে মত দেবার আগে, তোমার এই অদ্ভুত চাকরদের মধ্যে একজনকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে হবে। যতক্ষণ না সমস্ত কাঠ পুড়ে আগুন নিবে যায় ততক্ষণ সে যেতে পার্‌বে না।" রাজকুমার তাঁর সঙ্গীদের বল্‌লেন—"একাজ কর্‌তে

কে রাজী আছ বল?" তখন যাকে গরমে কাঁপায়, শীতে ঘামায়, সেই লোকটি বল্‌ল—"বেশ! আগুন জ্বালাও; আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব।"

তারপর মস্ত আগুন জ্বালান হ'ল। তার উপর দাঁড়িয়ে সে যেন আরো বেশী কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। আগুন যখন একেবারে নিবে গেল তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—"বাবা! এমন শীত আর জীবনে কখনও লাগেনি।" তখন রাজকুমারী খুব খুসী হয়েই রাজকুমারকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হলেন। রাণীরও আর আপত্তি কর্‌বার কিছুই রইল না।

শ্রীইলা রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

অফুরাণ

ধূসরের বুকে সবুজের ঢেউ
বনানী আপনহারা,
কোন সুদূরের জানে নাত কেউ,
এসেছে বারতা, কি কথার তোলাপাড়া!
বরষার শেষ বিদায় ভাষণ
ধরণীর কাণে কাণে,
"আমি চলিলাম বিছাবে আসন
শরৎ আসিয়া, গগনের মাঝখানে"—
"চোখের জলের ফুরাবে ফোয়ারা,
বাতাসের হা হুতাশ;
মনের মাঝারে সব সীমাহারা
আলোর মহিমা গান, গা'বে বারো মাস"!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রসার্‌পিনা

(গ্রীক্ পুরাণ)

গ্রীক্‌পুরাণের মতে কৃষিকার্য্যের দেবতা ছিলেন "সেরিস্"। কৃষকদের চাষ-বাসের ফলাফল দেবী সেরিসের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। সেরিসের কন্যার নাম ছিল "প্রসার্‌পিনা"।

উদ্ভিদ্-রাজ্যের গাছপালা, লতাপালা, ফুল ফল—এ সকলের দেবতা ছিলেন প্রসার্‌পিনা। প্রসার্‌পিনা মায়ের অনেক কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। মায়ের সাহায্য করিয়া অবসর পাইলেই, সুন্দরী প্রসার্‌পিনা বিশ্রামের জন্য সিসিলি দ্বীপে চলিয়া যাইতেন। সেখানে এট্‌না পর্ব্বতের উপত্যকায় সখীদিগকে লইয়া খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি করা তাঁহার একটি প্রধান কাজ ছিল।

একদিন তাঁহারা এইরূপে আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন—হাসি, তামাসা, গান সকলই চলিয়াছে। এই সময়ে যম রাজা "প্লুটো" তাঁহার মিশ্‌মিশে কাল চার-ঘোরার কৃষ্ণবর্ণ রথে চড়িয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ এই হাসির লহরী তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল। তিনি রথ হইতে নামিয়া, চুপি চুপি ঘন বনের মধ্য দিয়া চলিলেন। কোথা হইতে এই আনন্দের ধ্বনি আসিতেছে? খানিক দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি আড়াল হইতে সুন্দরী প্রসার্‌পিনাকে দেখিতে পাইলেন। এরূপ অপরূপ সুন্দরী তিনি আর কখন দেখেন নাই। দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, যে, ইহাকে রাণী করিতে না পারিলে তাঁহার জীবনে আর সুখ নাই।

ইতিপূর্ব্বে প্লুটো অনেক দেবীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, পাখী গান গায় না, ফুল ফোটে না—এমন যে অন্ধকার পাতালপুরী—সে পুরীর রাণী হইতেও কেহ রাজী হয় নাই। সেজন্য প্লুটোর মনে ভারি দুঃখ ছিল, এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, আর কোন দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিবেন না। এ ক্ষেত্রেও তিনি তাহাই করিলেন—মিষ্ট কথায় বিবাহের প্রস্তাব না করিয়া, ভাবিলেন, হঠাৎ প্রসার্‌পিনাকে ধরিয়া রথে তুলিয়া লইয়া একেবারে পাতালপুরীতে চম্পট্ দিবেন।

ঝোঁপ ঝাঁপের ভিতর দিয়া প্লুটো চুপি চুপি প্রসার্‌পিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শুক্‌না ডালে পা পড়িয়া হঠাৎ মট্ করিয়া শব্দ হইতেই, প্রসার্‌পিনা ও সখীর দল সেদিকে চাহিলেন। যমরাজ প্লুটোর মত কাল বিদ্‌ঘুটে চেহারা ত অন্য কোন দেবতার নয়? সুতরাং দৃষ্টিমাত্র তাঁহাকে চিনিতে কাহারও বাকি রহিল না। দারুণ ভয়ে সখীরা সকলে প্রসার্‌পিনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, প্রসার্‌পিনাও কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্লুটোর মতলব বুঝিতে তাঁহার মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না, কারণ, চক্ষের নিমেষে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া প্লুটো রথে চড়িলেন, আর তখনই কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া চারিটি রথ লইয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল।

সখীগণের আর্ত্তনাদ, চীৎকার চেঁচামেচি কিছুই আর শুনিতে পাওয়া যায় না, প্লুটোর রথ অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে তাঁহার ভয় হইল, হঠাৎ যদি সেরিস্ আসিয়া উপস্থিত হন—তবে ত প্রসার্‌পিনাকে কাড়িয়া লইবেন! প্লুটো আরো তাড়াতাড়ি রথ চালাইলেন। ক্রমে তাঁহার রথ সিয়ানী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সিয়ানী নদীর জল গভীর গর্জ্জনে ফুলিয়া উঠিল, তাহাতে প্লুটোর রথ পার না হইতে পারে।

প্লুটো বুঝিতে পারিলেন, যে, ক্রুদ্ধ নদীটি পার হইবার চেষ্টা করা বাতুলের কাজ হইবে। আবার ফিরিয়া যাইতেও ভরসা পাইলেন না—যদি সেরিসের সঙ্গে দেখা হয়, তবে ত তিনি প্রসার্‌পিনাকে ছাড়িতে বাধ্য হইবেন। এখন কি করা যায়? হঠাৎ তাঁহার একটা খেয়াল হইল—তাঁহার ভীষণ অস্ত্র দুইমুখো শূলটি লইয়া মাটিতে দারুণ একটা আঘাত করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ মাটি ফাটিয়া প্রকাণ্ড পথ হইল—সেই পথে রথ তাঁহাদিগকে লইয়া একেবারে পাতালপুরীতে গিয়া উপস্থিত!

পাতালে প্রবেশ করিবার মুখে প্রসার্‌পিনা কাঁদিতে কাঁদিতে পৃথিবীর শেষ দৃশ্য দেখিয়া লইলেন। "মা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কত দুঃখ করিবেন, কত খুঁজিয়া বেড়াইবেন"—এই কথা ভাবিয়া, সিয়ানী নদীর জলে তাড়াতাড়ি তাঁহার ওড়নাটি ফেলিয়া দিয়া প্রার্থনা করিলেন—"হে জলদেবি! আমার এই ওড়নাটি আমার মায়ের কাছে পৌঁছাইয়া দিও।"

এদিকে সেরিস্ কৃষিকার্য্য পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া প্রসার্‌পিনাকে দেখিতে পাইলেন না। চারি দিকে নানা স্থানে সন্ধান করিলেন, মেয়ের নাম ধরিয়া কত ডাকিলেন কিন্তু কোন সাড়া পাইলেন না। ক্রমে তাঁহার

দারুণ ভাবনা হইল, কাঁদিয়া আকুল হইলেন, "প্রসার্‌পিনা! প্রসার্‌পিনা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল, প্রকাণ্ড মশাল জ্বালিয়া সেরিস্ কন্যার সন্ধান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, দিনও শেষ হইয়া গেল, তবু তাঁহার চেষ্টা থামিল না। তাঁহার দৈনিক কাজগুলির কথা ভুলিয়া গেলেন। তাহার ফলে বৃষ্টি বন্ধ হইল, ফুল ফল শুকাইয়া গেল, ক্ষেতের শস্য সূর্য্যের উত্তাপে ঝল্‌সিয়া গেল! কিন্তু তবু সেরিসের ভ্রমণ শেষ হইল না, তিনি কন্যার সন্ধানে পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে একেবারে নিরাশ হইয়া তিনি ইলিউসিস্ সহরে এক রাস্তার ধারে বসিয়া, মেয়ের জন্য গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

পাছে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া দেবতা বলিয়া চিনিতে পারে, তাই তিনি বৃদ্ধার ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। বৃদ্ধার বেশে রাস্তার পাশে বসিয়া মেয়ের জন্য কাঁদিতেছেন, এমন সময়, সেই দেশের রাজা সেলিউসের দুই কন্যা তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া রাজকন্যা দুটির ভারি দয়া হইল এবং তাহারা বলিল—"বাছা! তোমার মেয়ে হারাইয়া কাঁদিতেছ? চল আমাদের সঙ্গে রাজবাড়ীতে। আমাদের একটি ছোট্ট ভাই আছে, "ট্রিপ্‌টোলিমুস্"—তাহাকে তুমি মায়ের মত যত্ন করিবে, দেখিবে শুনিবে।"

রাজকন্যা দুটির মিষ্ট ব্যবহারে সেরিস্ কতক সান্ত্বনা পাইয়া, তাহাদিগের প্রস্তাবে রাজি হইলেন। প্রাসাদে আসিলে পর রুগ্ন শিশুকে বুকে লইলেন এবং তাহার শুষ্ক মুখে চুম্বন করিবামাত্র শিশুর গাল সুস্থ এবং লাল হইয়া উঠিল! এই ব্যাপার দেখিয়া রাজপরিবারের সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

রাত্রে সেরিস্ শিশুকে লইয়া তাহার ঘরে একা বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল—শিশুটিকে অমর করিয়া দিবেন। তখন তিনি করিলেন কি, শিশুর সর্ব্বাঙ্গে অমৃত মাখাইয়া, বিড় বিড় করিয়া কি একটা মন্ত্র পড়িলেন। তারপর ঘরে যে কাঠকয়লার আগুন জ্বলিতেছিল, সেই আগুনের উপর শিশুকে শোয়াইয়া দিলেন—তাহার শরীরের অসার জিনিষ যাহাতে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়!

এই সময়ে হঠাৎ রাণী সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত। এই দারুণ কাণ্ড দেখিয়াই ভীষণ এক চীৎকার করিয়া আগুনের উপর হইতে শিশুকে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর যখন দেখিলেন, আগুনে তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই, তখন

নিশ্চিন্ত হইলেন এবং বৃদ্ধা ধাত্রীর উপর তাঁহার রাগ ঝাড়িবেন বলিয়া, তাহার দিকে ফিরিয়া দেখেন—একি কাণ্ড, ধাত্রী ত সেখানে নাই! তাহার স্থানে ঘর উজ্জ্বল করিয়া কৃষি-দেবতা সেরিস্ দণ্ডায়মান!!

সেরিস্ রাণীকে একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"রাণি! তুমি অসময়ে বাধা দিয়া অতি অন্যায় কাজ করিয়াছ। আমি তোমার পুত্রকে অমর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।" এই বলিয়াই সেরিস্ অন্তর্হিত হইলেন এবং আবার মেয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেরিস্ ইটালি দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একদিন নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ নদীর ঢেউ সাদা ধপ্‌ধপে একটা জিনিষ তাঁহার পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিয়া দিল। জিনিষটি দেখিয়াই তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন—এটা যে তাঁহারই কন্যার ওড়না!

কন্যার ওড়নাটি বুকে করিয়া সেরিস্ চলিতে চলিতে ভাবিলেন—"এবারে বোধ করি মেয়ের সন্ধান পাইব।" ক্রমে তিনি একটা ঝরণার ধারে উপস্থিত হইয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। ক্রমে তাঁহার ঘুমের ভাব আসিল, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, যে, ঝরণার জল কুল কুল স্বরে যেন তাঁহাকে কোন কথা বলিতেছে। কাণ পাতিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—ঝরণা বলিতেছে, "আমি আপনার কন্যার সন্ধান জানি। তাঁহাকে প্লুটো জোর করিয়া ধরিয়া পাতালপুরীতে লইয়া গিয়াছেন।"

সেরিস্ কন্যার সন্ধান পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনের দুঃখ গেল না। মরণ, তিনি ইহাও বেশ বুঝিতে পারিলেন, যে, প্লুটোর হাত হইতে মেয়েকে উদ্ধার করা সহজ নয়। তাই তিনি একটা অন্ধকার পর্ব্বত-গহ্বরে বসিয়া কন্যার জন্য শোক করিতে লাগিলেন। চাষবাসের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার প্রধান কাজ, কেননা তিনি কৃষি-দেবতা। কিন্তু হায়! সে কাজ একেবারে পড়িয়া রহিল।

আর উপায় নাই, এবারে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। পৃথিবীর কৃষকেরা তাঁহার উদ্দেশে পূজা পার্ব্বণ কতই করিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল—"যমপুরী হইতে কন্যার উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ফল শস্য কিছুই জন্মিবার হুকুম তিনি দিবেন না।" কাজেই কৃষকেরা একেবারে নিরাশ হইয়া দেবরাজ জুপিটারের নিকট আবেদন করিল—"দোহাই প্রভু! আমাদের দুঃখ দূর করুন, যমপুরী হইতে প্রসার্‌পিনাকে উদ্ধার করিয়া আবার পৃথিবীতে লইয়া আসুন।"

এই আবেদনের সংবাদ পাইয়া দেবী সেরিস্‌ও দেবপুরীতে গিয়া জুপিটারের নিকট তাঁহার দুঃখ জানাইলেন। তখন দেবরাজ এই সর্ত্তে প্রসার্‌পিনার উদ্ধারের



মার্কারি পাতালপুরী হইতে প্রসার্‌পিনাকে লইয়া আসিতেছেন।

আদেশ দিলেন, যে,—"প্রসার্‌পিনা যদি পাতালপুরীতে কিছু না খাইয়া থাকেন, তবেই তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।"

দেবরাজের আদেশ পাইয়া সেরিস্‌ তখনই পাতালপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যমরাজ প্লুটোর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি প্রসার্‌পিনাকে লইয়া রোয়ানা হইয়াছেন, এমন সময় যমপুরীর এক প্রেতাত্মা বলিয়া উঠিল, "প্রসার্‌পিনা আজ কয়েক দানা ডালিম খাইয়াছেন।" প্রসার্‌পিনা সত্যই সেদিন ডালিমের ছয়টি দানা খাইয়াছিলেন, সে কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। এখন উপায়? তখন জুপিটার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"প্রসার্‌পিনা যখন ডালিমের ছয়টি দানা খাইয়াছে, তখন প্রতি বছরের ছয় মাস তাহাকে যমপুরীতে কাটাইতে হইবে।" কাজেই তখন হইতে নিয়ম হইল, যে, বৎসরের ছয় মাস প্রসার্‌পিনা প্লুটোর রাজ্যে থাকিবেন, আর ছয় মাস পৃথিবীতে মায়ের কাছে কাটাইবেন।

দেবদূত মার্কারিকে নিযুক্ত করা হইল,—তিনি প্রসার্‌পিনাকে যমপুরী হইতে পৃথিবীতে আনিবেন, আবার ঠিক ছয় মাস পরে তাঁহাকে দিয়া আসিবেন।

প্রসার্‌পিনা পৃথিবীতে আসিলে ফল ফুল, লতা পাতা সজীব হইয়া উঠিত। আবার তিনি পাতালপুরীতে চলিয়া গেলে, সমস্ত শুকাইয়া গিয়া প্রকৃতিদেবী ম্লান হইয়া যাইতেন। এইরূপে পৃথিবীর কষ্ট দূর হইল। দেবী সেরিসেরও সর্ব্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা! অন্ততঃ ছয়মাসকালও কন্যাকে নিকটে রাখিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া তিনি অনেকটা সুখী হইলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

তখন আর এখন

তখন যদি দেখ্‌তে আমায়, উঠ্‌তে ভয়ে ঘেমে,
শুন্‌লে 'হাঁকার' ভূমিকম্পের কম্প যেত থেমে;
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
দশ জনারে দেখ্‌ছ যেমন আমিও এখন তাই।

মনে পড়ে রাজবাড়ীতে হ'লে প্রয়োজন,
বাঘের দুধ দুইয়ে দিতাম আশী হাজার মণ;
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
ভাব্‌তে গেলে সে সব কথা, বড়ই ব্যথা পাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

মনে পড়ে, দুইটি বেলা দাঁড়িয়ে বাড়ীর কাছে,
খড়্‌কে কাঠির কাজ সেরেছি আস্ত তালের গাছে :
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
তালের গাছে খড়্‌কে খোঁটার দিন গিয়াছে ভাই।

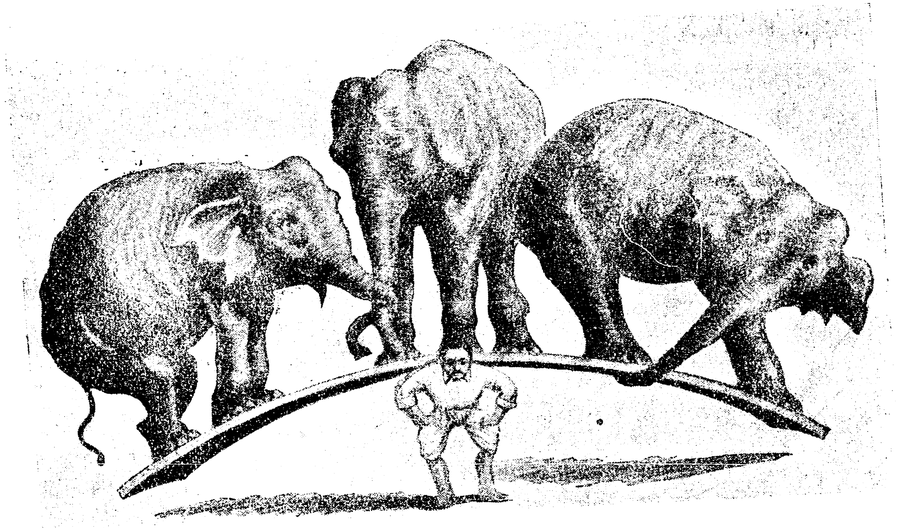

হাতী নিয়ে লোফালুফি ছিল আমার কাজ,
সবাই আমায় ডাক্‌ত তখন "কুস্তি-মহারাজ"।
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই—
তিনটি হাতীর ভারেই এখন হাঁপিয়ে মারা যাই!

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

কিছু চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
এই যে খোকা, কি নেবে ভাই
জলছবি আর লাট্টু লাটাই?
কেক্ বিস্কুট্ লাল দেশলাই?
খেল্‌না বাঁশি কিম্বা ঘুড়ি?
লেড্ পেন্‌সিল রবার ছুরি?
এসব আমার বাক্সে নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
বৌমা কি চাও শুন্‌তে পাই?
ছিটের কাপড় চিকন্ লেস্?
ফ্যান্সি জিনিষ ছুঁচের কেস্?
আল্‌তা সিঁদুর কুন্তলীন?
কাঁচের চুড়ি বোতাম পিন্?
আমার কাছে ওসব নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই?
আপনি কি চান কর্ত্তামশাই?
পকেট বই কি খেলার তাস?
চুলের কলপ জুতোর ব্রাস্?
কলম কালি, গঁদের তুলি,
নস্যি চুরুট, সূর্ত্তি গুলি,
ওসব আমার কিছু নাই
কারোর কিছু চাই গো চাই?

সুকুমার রায়।

ছুটির খেলা

জমিদার বাড়ীতে ভারি ধুমধাম। আত্মীয়, স্বজন যে যেখানে আছেন, ছুটিতে সকলে বাড়ী এসেছেন। ছোট বড় ছেলেমেয়েতে বাড়ী ভরে গিয়েছে। সারাদিন তাদের বাইরে কাটে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর ভিতর জমা হয়। সে সময়টা তাদের কোলাহলে ঘরে টেকা ভার। কচি ছেলেদের মধ্যে কারো ঘুম পেয়েছে, কারো ক্ষিদে পেয়েছে, তারা চ্যাঁ-ভ্যাঁ কর্‌ছে, বড় বড় ছেলেরা গল্প-স্বল্প তর্ক বিতর্ক কর্‌ছে; মাঝারি যারা তারা হুড়োহুড়ি কর্‌ছে, হয়ত বা ঝগড়াও লেগে যাচ্ছে। এমনি একদিন সন্ধ্যাবেলা তাদের ছোটকাকা এসে বল্‌লেন, "ঘরের ভিতর হুড়োহুড়ি কর্‌ছ কেন? বসে বসে খেল না।" ছেলেরা বল্‌ল, "বসে বসে কি খেলা খেল্‌ব? তাস দাবা খেল্‌তে ত তুমি মানা করেছ।" কাকা বল্‌লেন, "তাস দাবা ছাড়া বুঝি আর খেলা নেই?" এস, আমি একটা মজার খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি।" অম্‌নি ছোট বড় সকলে এসে তাঁর কাছে জড় হ'ল।

কাকা বল্‌লেন, "এ খেলার নাম "সত্যি মিথ্যা" খেলা। তোমরা সবাই অর্দ্ধেক গোল হয়ে আমার সাম্‌নে বস দেখি? আচ্ছা, এইবার আমি একটা একটা করে কথা বল্‌ব, যদি সে কথাটা সত্যি হয় তবে তোমরা সকলে হাত তালি দেবে; আর যদি মিথ্যা হয় তবে হাত তালি দেবে না। যেমন, আমি যদি বলি, "আমি ভাত খাই" তবে হাততালি দিতে হবে; কিন্তু যদি বলি "ছাগল মাংস খায়" কিম্বা "ছাগলের তিনটা পা" তবে তালি দেবে না। যদি সত্যি কথার বেলা তালি না দাও, কিম্বা মিথ্যা কথার বেলা ভুলে তালি দিয়ে ফেল, তা হ'লে শাস্তি পেতে হবে। কি শাস্তি জান? নিজের হাতে কাণমলা। এইবার তবে আরম্ভ করি, তোমরা মন দিয়ে শোন।" অম্‌নি তিনি তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগ্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে চটাপট্ তালি পড়্‌তে লাগ্‌ল—"মানুষ ভাত খায়," "মানুষ রুটি খায়," "মানুষ দুধ খায়," "বিড়াল মাছ খায়," "বিড়াল মাটি খায়," বল্‌তেই কেউ কেউ হাত তালি দিয়ে ফেল্‌ল, অনেকে থেমে গেল, আর খুব একটা হাসির ধূম পড়ে গেল। তারপর যারা যারা তালি দিয়েছে তাদের কাণমলা খেতে হ'ল। কাকা বল্‌লেন, "আচ্ছা, আবার বলি—"কাক ওড়ে," "চিল ওড়ে," "ঘুঘু ওড়ে," "শালিক ওড়ে," "জাহাজ

ওড়ে——হাঃ হাঃ—টেঁপি, খোকা, বেচু কাণমলা খাও। আবার—"গরু ওড়ে"। হুঁ, সবাই চালাক্ হয়েছ দেখ্‌ছি, কেউ হাততালি দিলে না। আচ্ছা, "ভেড়া ওড়ে," "মানুষ ওড়ে," "ফানুষ ওড়ে"—কই হাততালি দিলে না ত? কাণ মল! মানুষের বেলা না দিয়েছ নেই, যদিও আজকাল মানুষও ওড়ে কিন্তু ফানুষ ত ওড়ে। সবাইকে কাণ মল্‌তে হবে।

বড় ছেলেরা খানিক খেলে বল্‌ল, "এ ছেলে মানুষী খেলা। আমাদের মত কোন খেলা বলুন কাকা। তিনি বল্‌লেন, "তবে এস, দেখ্‌ব কার কত বিদ্যা বুদ্ধি। তোমরা কবিতা পড় ত?" নরেন বিপিন বল্‌ল, "হাঁ পড়ি।"—কাকা—"কবিতা লিখ্‌তে পার?" বিপিন—"সুধীশ দা পারে।" সুধীশ এবার কলেজে পড়্‌বে; সে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌ল, "শচিও পারে।" শচিনাথ কথাটা শুনে যেন খুসী হ'ল। কাকা বল্‌লেন, "তোমাদের সকলকে মিলে একটা কবিতা বানাতে হবে। একজন একটা লাইন বল্‌বে তারপর আরেকজন সেই লাইনের সঙ্গে মিল দিয়ে আর এক লাইন বল্‌বে। কিন্তু খালি মিল হ'লে হবে না, আগের লাইনের সঙ্গে তার বিষয়ের যোগ থাকা চাই। নরেন যেন বল্‌ল, "এক যে ছিল ডাইনী বুড়ী" আর বিপিন বল্‌ল—"মিঠাই খাব গণ্ডা কুড়ি" তাতে হবে না। একটা বিষয়ে বল্‌তে হবে। দুলাইন মিল হয়ে গেলে নূতন লাইন আরম্ভ হবে; পরের জন আবার তার মিল দেবে। তাহ'লে সুধীশ তুমিই আরম্ভ কর।" সুধীশ—"শচি করুক"। শচি অম্‌নি উৎসাহে বলে উঠ্‌ল, "শারদীয় অবকাশ ঘুরে এল যেমনি।" কাকা—"তোমরা গোল হয়ে বস, একজনের পর আর একজন বল। এবার বিপিনের পালা। "শারদীয় অবকাশ ঘুরে এল যেমনি" এর সঙ্গে মিল দিয়ে বল।" বিপিন ফস্ করে বলে ফেল্‌ল, "দেশে ছুটে এলাম অমনি"—সকলে হেসে উঠ্‌ল। কাকা বল্‌লেন, "কবিতা বাননো বুঝি এত সহজ? ঠিক আগের লাইনের ধরণের শুন্‌তে কথাগুলে হবে, ওর সমান কথা হবে, শেষের কথা দুটো এখানে মেলাতেও হবে। আচ্ছা পরের লাইনটা তোমার হয়ে আমিই বলে দিচ্ছি, "ঘর পানে মন মোর ছুটে গেল অমনি"; এবার সুধীশ বল। সুধীশ—"বেঁধে নিয়ে মোট্ মাট্ চেপে রেল গাড়ীতে", নরেন—"এক দিন এক রাতে পৌঁছিনু বাড়ীতে।" কাকা—"বেশ, বেশ, এবার আবার শচি বল।" শচি—"হেথা ভারি ধুমধাম্ পুলি পিটে মণ্ডা।" বিপিন—"পেট ভরে খাও সবে খাবে যত গণ্ডা।" কাকা—"বাঃ বাঃ!" সুধীশ—"নব সাজ পরি আজ

খুসী ভারি প্রাণটা"। নরেন—"রাত হ'ল ঢের ভাই ভাত হ'ল ঠাণ্ডা"। কাকা—"আচ্ছা, বেশ হয়েছে—

"শারদীয় অবকাশ ঘুরে এল যেমনি,
ঘরপানে মন মোর ছুটে গেল অমনি।
বেঁধে নিয়ে মোট্ মাট্ চেপে রেল গাড়ীতে,
একদিন একরাতে পৌঁছিনু বাড়ীতে।
হেথা ভারি ধূমধাম, পুলি পিঠে মণ্ডা,
পেট ভরে খাও সবে, খাবে যত গণ্ডা।
নব সাজ পরি আজ খুসী ভারি প্রাণটা,
রাত হ'ল ঢের ভাই ভাত হ'ল ঠাণ্ডা।"

এখন খেতে যাও। অন্য দিন আরো নূতন খেলা শিখিয়ে দেব।

শ্রীসুখলতা রা

সর্ব্বনেশে ঘর

ভাঁড়ার ঘরে বেড়ার ফাঁকে,
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে থাকে
ধাড়ী ইঁদুর; তার দাপটে
ভাঁড়ারে কি কাণ্ড ঘটে!
'দিন দুপুরে দাপাদাপি,
ডালায় কুলোয় লাফালাফি;
তরকারি আর ফলের শাঁস
কুরে কুরে করলে নাশ;
চুবানি খায় তেলের ভাঁড়ে,
গড়িয়ে পড়ে এ ওর ঘাড়ে;
পায়ের শব্দ শুনলে পরে
সুড়ুৎ ক'রে লুকিয়ে পড়ে।

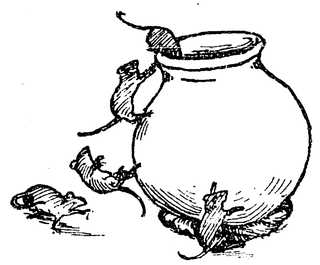

সেদিন রাতে হেসে হেসে,
ইঁদুর ছানা বল্‌ল এসে
দেখবে চল তাড়াতাড়ি,
আমাদের এক নূতন বাড়ী;
ভালবেসে যতন ভরে
কে রেখেছে তৈরী ক'রে,
রেলিং ঘেরা কাঠের ঘর,
বিড়াল এলে নেইকো ডর।
দুয়ার আছে আসতে যেতে,
খাবার আছে দেদার খেতে,
ঠিক আমাদের মাপেই যেন
কে গড়েছে ঘরটি হেন।

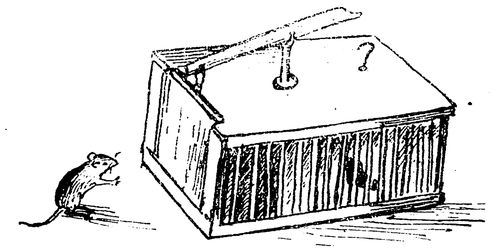

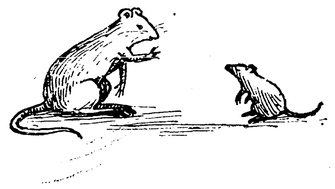

ধাড়ী ইঁদুর চোখ পাকিয়ে
বল্‌ল ছানার মুখ তাকিয়ে
"সবই ফাঁকি, সবই ফাঁকি,
মানুষগুলোর সব চালাকি,।
ও ঘর বড় সর্ব্বনেশে,
ফ্যাসাদেতে ফেল্‌বে শেষে।
বিড়ালের ভয় নাই বা থাক্,
খাবার কথা চুলোয় যাক্;
দুয়ার আছে ঢুক্‌তে বটে,
ঢুক্‌লে পরে বিপদ ঘটে,
পড়লে ধরা টেরটি পাবে,
হাতে হাতেই প্রাণটি যাবে।

শ্রীসুখলতা রাও

কাঁকড়া

এবারের "সন্দেশ"এ অনেক রকমের কাঁকড়ার একটি রঙ্গিন ছবি আছে। কাঁকড়া যে এত রকম রঙের হয় তা' বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান না। এই সব রঙ্গিন কাঁকড়ার অধিকাংশই প্রবাল-দ্বীপের দেশে, রঙ্ বেরঙের প্রবালের মধ্যে থাকে। সেখানের মাছও রং-বেরঙের হয়। যদি কোনদিন তোমাদের কেউ ডুবুরি হ'য়ে সে দেশের সমুদ্রের তলায় যেতে পার তা' হ'লে প্রবালের দেশের সমুদ্রের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ও তার অদ্ভুত রং-বেরঙের মাছ কাঁকড়া ইত্যাদি দেখে অবাক হয়ে যাবে।

আরেকটি কাঁকড়ার ছবি দিলাম; ইনিও সমুদ্রে থাকেন,—এঁর নিবাস জাপানে।

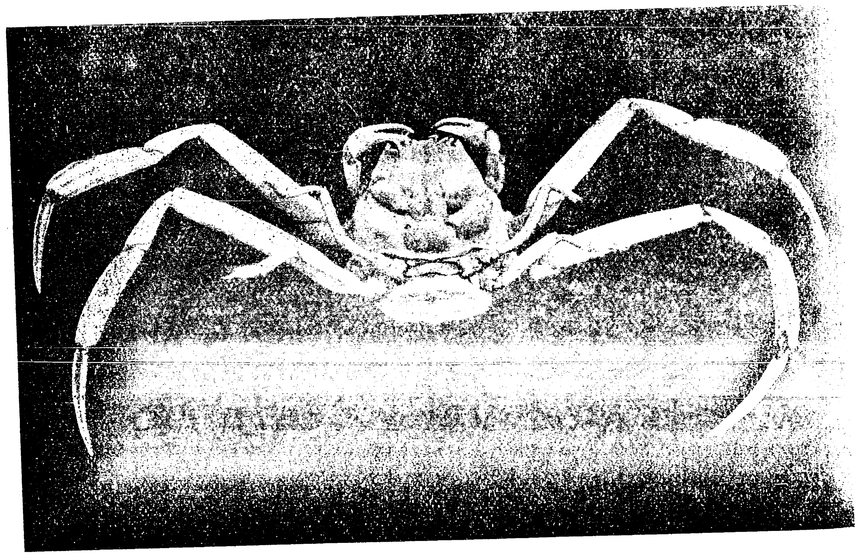

নামটি হচ্ছে 'রাক্ষুসে কাঁকড়া'। দুই কারণে এঁকে রাক্ষুসে' বলা যেতে পারে;—এক তো হচ্ছে, এঁর শরীরটি বিরাট আকারের, দেখ্‌লে কোন সর্ব্বনেশে রাক্ষুসে জানোয়ার ব'লেই মনে হয়; তা' ছাড়া, এঁর শরীরে ঠিক রাক্ষসের মুখের মতই দাগ আছে, ছবি দেখ্‌লে সেটা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

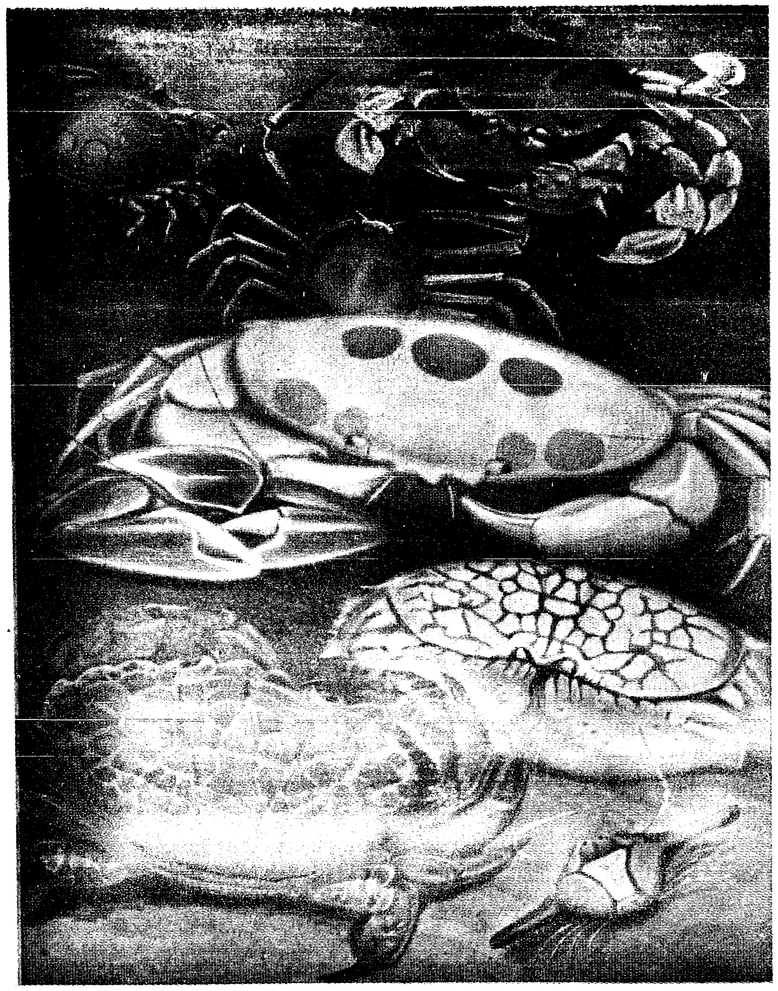

কাঁকড়া

COLOURED DOCUMENT.

আরেক বেচারার ছবি দিলাম ;—ইনি নিতান্তই বেচারা মানুষ। প'ড়ে আছেন যেন মরা কাঁকড়াটি। চেহারাটা দেখ্‌লে হঠাৎ মনে হয় যেন একটি চিংড়ি। এঁর গায়ের খোলা নিতান্তই নরম ; কেউ ধর্‌লে হয় তো গায়ের ব্যথায় অস্থির হবেন। কাজেই এঁর একটি মতলব আঁট্‌তে হয়েছে। ইনি সর্ব্বদাই একটি স্পঞ্জের (Sponge) মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। স্পঞ্জটি এঁর শরীরের উপরেই গজায় ; চলাফেরার সময়ও প'ড়ে যায় না। ছবিতে দেখ কাঁকড়া-ভায়া দিব্যি নিশ্চিন্তে লুকিয়ে ব'সে আছেন ; হঠাৎ চিন্‌বারও জো নাই। এঁরই এক জাত-ভাই আছেন তিনি শামুখের

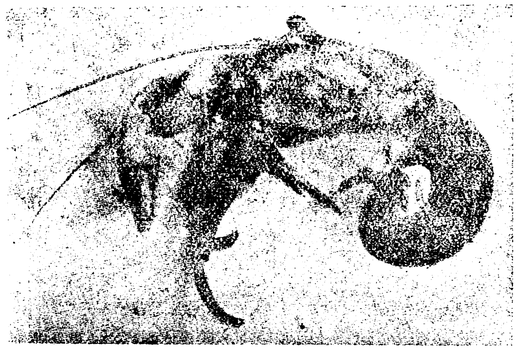

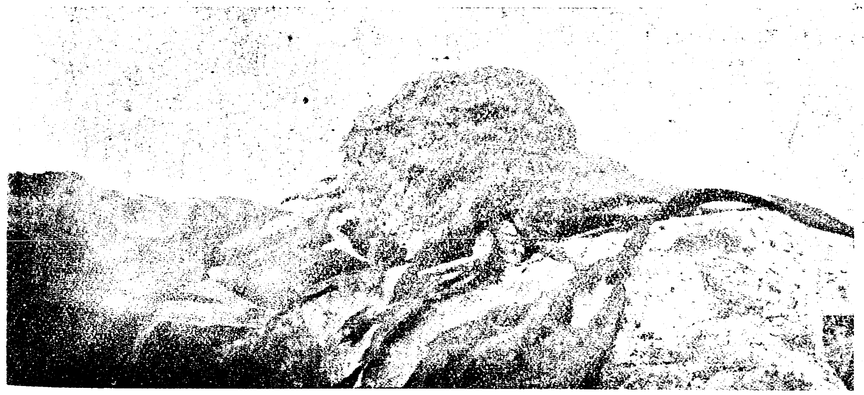

মধ্যে লুকিয়ে দিন কাটান। তাঁর কিন্তু অনেক বিপদ। ঐ জাতের কোন কাঁকড়ার যদি শামুখ হারিয়ে যায় তা' হ'লে তিনি এসে আরেকজনের সঙ্গে লড়াই ক'রে তাঁর শামুখ কেড়ে নেবার চেষ্টা কর্‌বেন।

প্রকাণ্ড ছুরি কাঁচি

জার্ম্মেনীর এক মেলায় একজন কারিকর একটি প্রকাণ্ড ছুরি এবং একটি প্রকাণ্ড কাঁচি দেখিয়েছিল। ছুরিটিতে অনেকগুলি ফলা। লম্বায় ছুরিটা প্রায় ২৭ হাত।

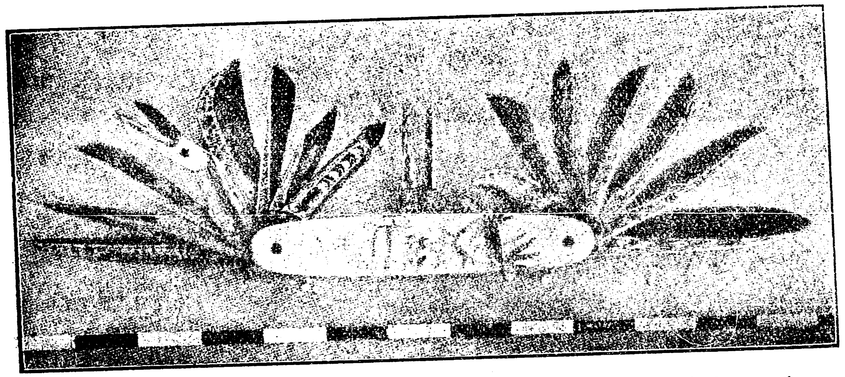

ছুরির পাশে যে মাপ-কাঠি বসান আছে তার একটি দাগ ৪০ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় ২ হাত আধ বিঘৎ। কাঁচিটা লম্বায় আরো অনেক বড়—প্রায় চুয়াল্লিশ হাত।

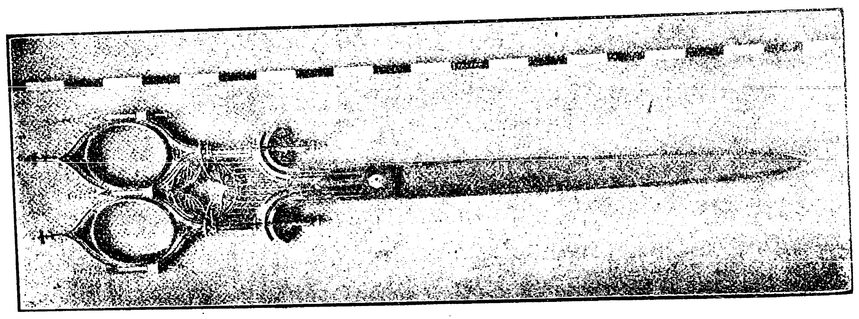

কুম্ভকর্ণের মত কোন অতিকায় লোক আজ থাক্‌লে তার কাজে এই দুটি যন্ত্রই লাগ্‌তে পার্‌ত। মানুষের কাছে এগুলি কেবল তামাসারই জিনিষ।

দেবধর্ম্ম

(জাতকের গল্প)

পূর্ব্বকালে বোধিসত্ত বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের ঘরে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মহিংসাস কুমার। বোধিসত্তের তিন চার বৎসর বয়স হইলে, তাঁহার একটি ভাই জন্মিল, তাহার নাম হইল চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার একটু বড় হইলে রাণীর মৃত্যু হইল—ব্রহ্মদত্ত আবার বিবাহ করিলেন।

কিছুদিন পরে নূতন রাণীর এক পুত্র হইল এবং তাহার নাম হইল, সূর্য্যকুমার। রাজা নূতন রাণীকে বড় ভালবাসিতেন। সূর্য্যকুমারের জন্মের পর একদিন রাজা রাণীকে বলিলেন—"রাণি! এই ছেলের জন্য তোমার যাহা খুসী বর চাও, আমি তাহাই দিব। রাণী তখন বর না চাহিয়া শুধু বলিলেন—"মহারাজ! যখন দরকার হইবে তখন বর চাহিয়া লইব।"

সূর্য্যকুমার বড় হইলে একদিন রাণী রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! এই ছেলে জন্মিবার পর আপনি বলিয়াছিলেন ইহাকে একটি বর দিবেন। এখন সেই বর চাহিতেছি—ইহাকে রাজা করুন্।" রাজা বলিলেন—"আমার প্রথম দুই পুত্র গুণবান্ ও তেজস্বী। তাহাদিগকে ছাড়িয়া তোমার পুত্রকে রাজ্য দিতে পারিব না।" কিন্তু রাণী এ কথা মানিলেন না, তিনি এই বরের জন্য রাজাকে রাত দিন জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। রাজার' মনে ভারি ভয় হইল। পাছে রাণী অন্য দুই পুত্রের অনিষ্ট করেন, এই মনে করিয়া তিনি একদিন বড় ছেলে দুটিকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! সূর্য্যকুমারের জন্মের পর আমি তোমাদের বিমাতাকে বলিয়াছিলাম—একটি বর দিব। সেই বরে এখন তিনি সূর্য্যকুমারকে রাজা করিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমি সূর্য্যকুমারকে রাজ্য দিতে চাই না। রাণী অবশ্য ইহাতে খুসী হইবেন না এবং ভিতরে ভিতরে তোমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন। তাই বলি, তোমরা এখন বনে বলিয়া যাও। আমার মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য লইও।"

রাজকুমার দুটি বাপের পায়ের ধূলা লইয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইবার সময় দেখিলেন, সূর্য্যকুমার উঠানে খেলা করিতেছেন। তাঁহাদের বনে যাইবার কারণ জানিয়া সূর্য্যকুমারও তাঁহাদের সঙ্গে না গিয়া ছাড়িলেন না। এইরূপে তিন ভাই একসঙ্গে বনে গেলেন।

রাজকুমারেরা চলিতে চলিতে ক্রমে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত। সেখানে বোধিসত্ত একদিন এক গাছের তলায় বসিয়া সূর্য্যকুমারকে বলিলেন—"ভাই! ঐ যে পুকুর দেখিতেছ, ঐ পুকুরে গিয়া স্নান কর আর জল খাও। তারপর ফিরিবার সময় পদ্মপাতায় করিয়া আমাদের জন্যও কিছু জল আনিও।"

ঐ পুকুরটি পূর্ব্বে ছিল কুবেরের। তিনি ওটি এক উদক-রাক্ষসকে (জলের রাক্ষস) দান করিয়া বলিয়াছিলেন—"যে লোক দেবধর্ম্ম কি জানে না, সে যদি এই পুকুরের জলে নামে তবে তোমার খাদ্য হইবে। কিন্তু জলে না নামিলে তাহার তুমি কিছুই করিতে পারিবে না।" সেই অবধি কেহ জলে নামিলে, উদক-রাক্ষস তাহাকে 'দেবধর্ম্ম কি' এই কথা জিজ্ঞাসা করে। আর উত্তর দিতে না পারিলেই তাহাকে খায়।

সূর্য্যকুমার ত আর এসব কথা জানিতেন না, তিনি নির্ভয়ে জলে নামিলেন অমনি উদক-রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেব ধর্ম্ম কাহাকে বলে, জান কি?" সূর্য্যকুমার বলিলেন—"তা আর জানি না? লোকে চন্দ্র ও সূর্য্যকে দেবতা বলে।" রাক্ষস—"মিথ্যা কথা, তুমি দেব ধর্ম্ম জান না" এই বলিয়া সূর্য্যকুমারকে টানিয়া জলের ভিতর লইয়া গিয়া তাহার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল।

সূর্য্যকুমারের ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত চন্দ্রকুমারকে তাহার সন্ধানে পাঠাইলেন। চন্দ্রকুমার জলে নামিলে রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া যখন সেই প্রশ্ন করিল, তখন তিনিও ঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকেও টানিয়া নিয়া রাক্ষস ঘরে বন্ধ করিল।

চন্দ্রকুমারেরও দেরি দেখিয়া বোধিসত্ত্বের মনে ভয় হইল, ভাবিলেন—হয়ত দুই ভাইএরই কোন বিপদ হইয়াছে। তখন পুকুরের পারে গিয়া পায়ের দাগ দেখিয়া বুঝিলেন, দুই ভাইই জলে নামিয়াছেন কিন্তু আর উঠেন নাই। বোধিসত্ত বুঝিতে পারিলেন, যে, জলে উদক-রাক্ষস থাকে। তখন হাতে তলোয়ার ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া পুকুরের পারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাক্ষস যখন দেখিল, বোধিসত্ত জলে নামিলেন না, তখন সে ব্যাধের বেশে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল—"ভাই! দেখিতেছি, পথ চলিয়া তোমার ভারি পরিশ্রম হইয়াছে। জলে নামিয়া স্নান কর, জল খাও, পদ্মের মৃণাল খাও তবেই শরীর ঠাণ্ডা হইবে।" ব্যাধকে দেখিয়াই বোধিসত্ত বুঝিতে পারিলেন, যে, এটা রাক্ষস। তখন তাহাকে বলিলেন—"তুমিই না আমার ভাই দুটিকে ধরিয়া

রাখিয়াছ?" রাক্ষস বলিল—"হাঁ।"—"কেন ধরিলে?"—"যাহারা এই পুকুরের জলে নামে তাহাদিগকে আমি খাই।"—"সকলকেই খাও?"—"কেবল যাহারা দেবধর্ম্ম জানে তাহাদিগকে খাই না।"—"আচ্ছা দেবধর্ম্ম কি জানিতে চাও?"—"হাঁ, বল।" —"বলিব বটে, কিন্তু পথ চলিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি।"

ইহা শুনিয়া রাক্ষস করিল কি, বোধিসত্তকে প্রথমে স্নান করাইয়া জল ও খাবার দিল। তারপর সুন্দর ঘর তৈরি করিয়া, তাহাতে একখানি সুন্দর খাটে বোধিসত্তকে বসাইয়া সে নিজে মাটিতে বসিল।



বোধিসত্ত তখন তাহাকে বলিলেন—"শুন তবে বলিতেছি, দেবধর্ম্ম কি—যে লোক সর্ব্বদা প্রশান্তচিত্ত, সত্যবাদী, নির্ম্মল অন্তরে ধর্ম্মের ভজনা করে আর মনে মন্দ ভাব আসিলে পরে লজ্জা পায়—তাহাকেই দেবধর্ম্মা বলিয়া জানিবে।"

বোধিসত্ত্বের উত্তর শুনিয়া রাক্ষস ভারি খুসী হইয়া বলিল—"তোমার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আচ্ছা, তোমার একটি ভাইকে ফিরাইয়া দিব—বল, কাহাকে চাও।"

বোধিসত্ত বলিলেন—"সকলের ছোট ভাইটিকে আন।"

রাক্ষস বলিল—"তুমি দেবধর্ম্ম জান বটে কিন্তু সে মতে কাজ কর না।"—"কেন?" "বড়কে ছাড়িয়া, ছোটকে বাঁচাইতে চাও, তবে আর বড়র মান রাখিলে কৈ?"

বোধিসত্ত বলিলেন—"আমি দেবধর্ম্ম বেশ জানি এবং সে মতে কাজও করি। ছোট ভাইটি আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই (বিমাতার সন্তান) ইহার জন্যই আমরা বনে আসিয়াছি। বিমাতা ইহাকে রাজা করিতে চাহিলে, বাবা রাজি না হইয়া আমাদের বড় দুই ভাইকে বনে পাঠান। আমরা বনে আসিতেছি দেখিয়া, ছোট ভাইটি নিজের ইচ্ছায় আমাদের সঙ্গে বনে আসিয়াছে। তা ছাড়া আমি যদি বাড়ী গিয়া বলি যে, ইহাকে রাক্ষসে খাইয়াছে—তবে সে কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাই বলি ছোট ভাইটিকে ফিরাইয়া দাও।"

বোধিসত্তের কথা শুনিয়া রাক্ষস তাঁহার কত যে প্রশংসা করিল, তাহা আর কি বলিব! তখন সে মহা খুসী হইয়া তাঁহার দুটি ভাইকেই ফিরাইয়া দিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

সূর্য্যাস্তে গঙ্গা

সন্দেশ সম্পাদক স্বর্গীয় সুকুমার রায়চৌধুরীর আঁকা অনেক মজার ছবি সন্দেশে বেরিয়েছে তোমরা সেগুলি দেখেছ। তিনি যে স্বাভাবিক দৃশ্যও অতি সুন্দর ভাবে আঁকতে পারতেন তা' বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান না। এবারের সন্দেশের প্রথম রঙ্গিন ছবিটি তাঁরই আঁকা। অসুখের সময় গঙ্গার ধারে পানিহাটীতে গিয়েছিলেন; সেখানে বিছানায় শুয়ে থাকতেন আর ঘর থেকেই গঙ্গা দেখতে পেতেন। একদিন সন্ধ্যায় মেঘ ক'রে আকাশের রং বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল; অমনি রং-তুলি নিয়ে ঐ ছবিটি আঁকলেন। শরীর বেশী অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় আর ছবি আঁকা হয়নি। তাঁর আঁকা আরও কয়েকটি সুন্দর দৃশ্য (Landscape) ছবি আছে।

ছবির মানে

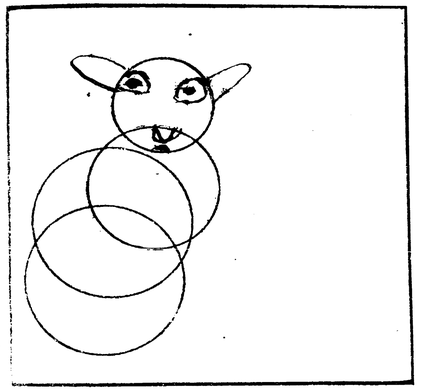

গোল গোল হিজিবিজি মিছে আঁকা কেন?

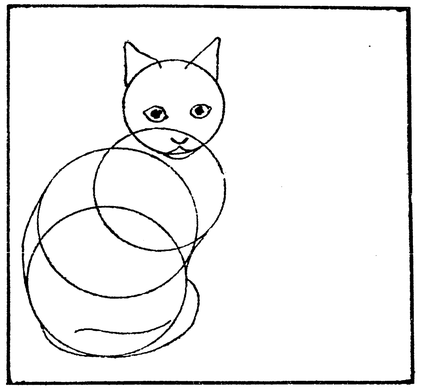

এ থেকে বেড়াল হয় তা' জানো না যেন?

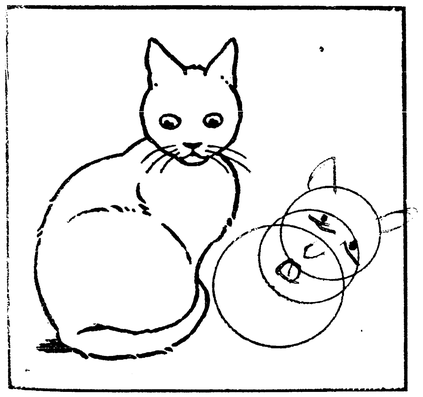

ফের্ কেন গোল গোল হিজিবিজি আঁকো?

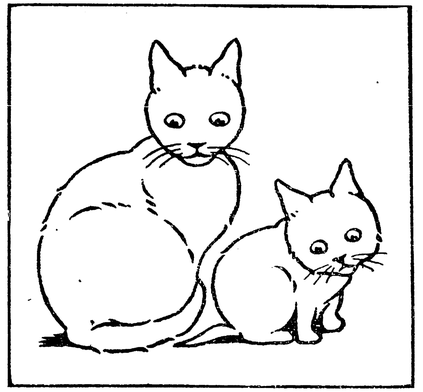

বেড়ালের ছানা আছে তা'ও জানো নাকো?

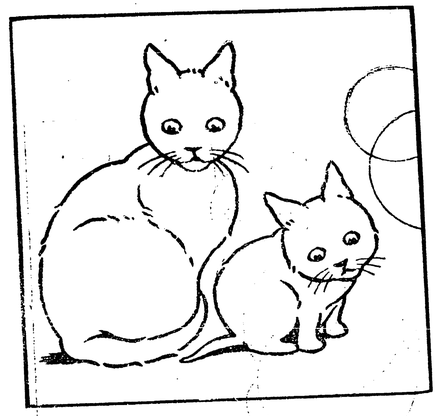

ডান কোণে এক জোড়া গোল কেন আঁকা ?

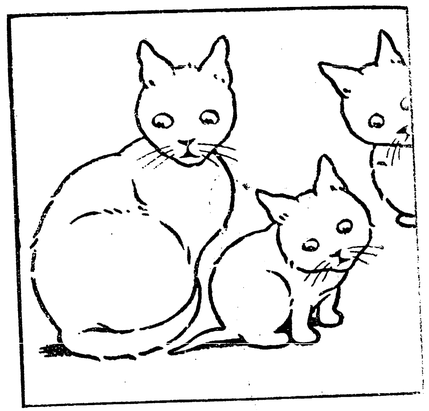

ঐ কোণে ব'সে আছে বেড়ালের কাকা।

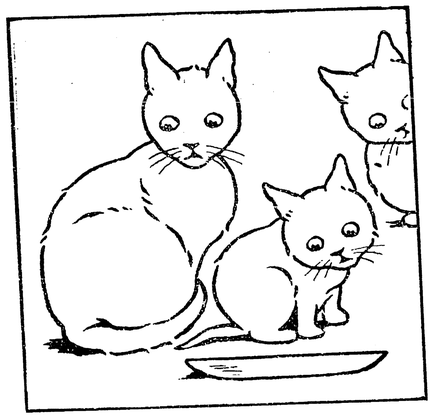

কেন সবে দুধ ফেলে ঐ কোণে চেয়ে ?

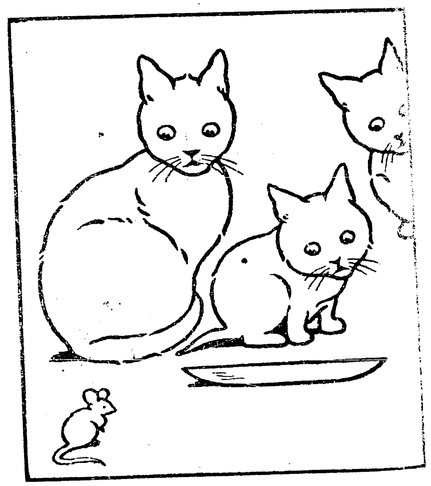

ওকোণে ইঁদুর ভায়া কেন আসে ধেয়ে ?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার



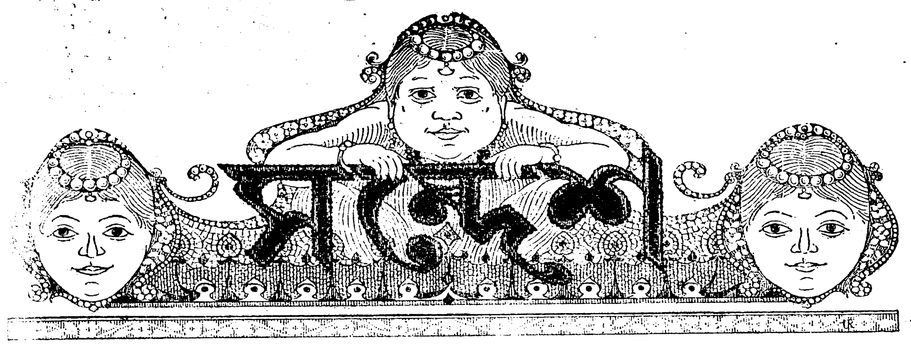

কাদশ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ ৮ম সংখ্যা

ঐ যা!

অবাক দেখি, একি বিষম টানাটানির পালা,
চীৎকারে যে পাড়ার লোকের লাগ্‌ছে কাণে তালা!
দুগাল বেয়ে ঝরণা ঝরে, হাঁ টি চমৎকার,
কোথায় গড়ায় লাট্টু পুতুল, নেই ঠিকানা তার।
বল্‌ছে খুকী 'আমিই নেব', খোকাও নিতে চাও?
টানের চোটে বইখানি যায়, দেখ্‌ছ না কি তাও?
ঝগড়া ক'রে ফেল্‌লে ছিঁড়ে, রইল কিবা আর?
থাক্‌লে পরে দুইজনেতে বুঝ্‌তে মজা তার।
জান্‌তে কেমন মিষ্টি এ বই, সন্দেশেরি মত,
পড়্‌তে মজা, শুন্‌তে মজা, দেখ্‌তে মজা কত।
মিলে মিশে যে কাজ কর, তাতেই পাবে সুখ।
ঝগড়া ঝাটি কান্না কাটি বাড়ায় কেবল দুঃখ।

COLOURED DOCUMENT.

এগ্‌বার্টের লাঞ্ছনা

দুটি ছেলে, এগ্‌বার্ট আর এড্‌ওয়ার্ড, তারা একই সহরে থাকে কিন্তু দুজনে একটুও ভাব নাই। এগ্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ডের চেয়ে লম্বা, বেশী চালাকচতুর এবং ফিট্ ফাট্। এগ্‌বার্টের মায়ের সঙ্গে এড্‌ওয়ার্ডের মায়ের খুব বন্ধুতা ছিল এড্‌ওয়ার্ডেরমা প্রায়ই তাকে বল্‌তেন—"দেখ্ দেখি এগ্‌বার্ট কেমন খাসা ছেলে—ওর মত হতে পারিস্?"

একটু বড় হয়ে যখন ছেলে দুটি স্কুলে গেল, তখন হেড্ মাষ্টার এগ্‌বার্টকে দুই ক্লাস উপরে ভর্ত্তি করলেন—কারণ তিনি দেখ্‌লেন, যে, এড্‌ওয়ার্ডের চাইতে এগ্‌বার্টের বুদ্ধি অনেক বেশী। এই সব কারণে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, এগ্‌বার্টের প্রতি এড্‌ওয়ার্ডের হিংসা রেষারেষির ভাব ক্রমেই বেড়ে গেল। কিছু দিন পরে এগ্‌বার্ট চলে গেল অন্য জায়গায়, কলেজে পড়্‌তে। সেখানে গিয়ে সে কয়েক বছরের মধ্যেই খুব নাম করে, উপাধি নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। এড্‌ওয়ার্ডের হিংসা আরো বেড়ে গেল, কিন্তু মায়ের বন্ধুতার কথা ভেবে সে এগ্‌বার্টের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে সাহস পেত না।

এই সময়ে একটি ঘটনায় এড্‌ওয়ার্ড বুঝ্‌তে পারল, যে, এগ্‌বার্ট বেঁচে থাক্‌লে তার আর সুখের আশা নাই। সেই গ্রামে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল, তার নাম ক্যাথেলিন্। ক্যাথেলিনের সঙ্গে এড্‌ওয়ার্ডের বেশ ভাব ছিল। কিন্তু এগ্‌বার্ট উপাধি নিয়ে ফিরে এলে পর, ক্যাথেলিন্ আর এড্‌ওয়ার্ডের দিক্‌ও মাড়াল না। শুধু তাই নয়, তখন এগ্‌বার্টের সঙ্গেই ক্যাথেলিনের বিয়ে হবে বলে একরকম ঠিক হয়ে গেল। এই ব্যাপারের পর থেকে এড্‌ওয়ার্ড এগ্‌বার্টকে দেখ্‌লেই গা ঢাকা দেয়, পাছে তার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যায়।

একদিন এড্‌ওয়ার্ড বাইরে কোন কাজে গিয়েছিল। সেদিন বিকালে খুব বৃষ্টি পড়ছিল, এমন সময় সে, বাড়ী ফিরবার ট্রেইন ধরবে বলে, একটা জংসন ষ্টেশনে এসে ওয়েটিংরুমে ঢুকেছে। ঢুকেই দেখে সেখানে এগ্‌বার্ট বসে আছে। ওয়েটিংরুমের এক কোণে আরো একজন ভদ্র লোক বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এগ্‌বার্টকে দেখেই ত এড্‌ওয়ার্ডের গা জ্বলে গেল। সে ঘরে ঢুক্‌বার সময় এগ্‌বার্ট

বল্‌ছিল—"আমাদের বাড়ী যাবার এই রেলটার মত এমন লক্ষ্মীছাড়া রেল বোধ করি আর দুনিয়ায় নাই।" এই কথা শুন্‌বামাত্র এড্‌ওয়ার্ড রেইলওয়ের পক্ষ নিয়ে তার সঙ্গে মিছামিছি তর্ক জুড়ে দিল। ক্রমে দুজনেই গরম হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, আর এক বিষয়ের পর অন্য বিষয় নিয়ে তর্কও আর থামল না। এগ্‌বার্ট যে বিষয় নিয়ে কথা বলে, তা সত্যি হোক, কি মিথ্যা হোক, তার প্রতিবাদ এড্‌ওয়ার্ড করবেই করবে। হয়ত বিষয়টা সম্বন্ধে এড্‌ওয়ার্ডের ও তাই মত কিন্তু তবু সে এগ্‌বার্টের কথার প্রতিবাদ করবে, কারণ তাকে জব্দ করা চাই। কিন্তু জব্দ সে নিজেই হতে লাগল। এগ্‌বার্টের জ্ঞান অনেক বেশী, বিদ্যাও ঢের—তার সঙ্গে সে পারে উঠ্‌বে কেন? তার উপর আবার এগ্‌বার্ট তাকে ঠাট্টা তামাসা, গালমন্দ করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ল। মাঝে মাঝে কোণের সেই ভদ্রলোকটি আড়চোখে এড্‌ওয়ার্ডের দিকে তাকাচ্ছিলেন,—যেন তার প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে।

এই তর্ক কেমন করে জানি ম্যাজিকে গিয়ে দাঁড়াল। এগ্‌বার্ট খুব আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল—"ছিঃ এড্‌ওয়ার্ড! তাহলে কি তুমি ম্যাজিক ট্যাজিকও বিশ্বাস কর?" এড্‌ওয়ার্ড তা কিন্তু মোটেও বিশ্বাস করে না; তবু বল্‌ল—"হাঁ, করি বই কি?"

এগ্‌বার্ট—"তাহলে গল্পের পুস্তকে যে সব যাদুকরের কথা পড়া যায়—তারা যাদু বলে চিরকাল বেঁচে থাক্‌তে পারে—সেই সব আদিম কেলে যাদুকর তবে এখনও বেঁচে আছে?"

এড্‌ওয়ার্ড—"নিশ্চয় বেঁচে আছে।" একথা বলেই সে কোণের ভদ্রলোকটির দিকে চাইল। তার অদ্ভুত উত্তর শুনে তিনি না জানি কি ভাব্‌ছেন, আর তাকে কত বড় একটা অপদার্থ লোক বলে মনে করছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ভদ্রলোকের মুখ দেখে সেরকম কিছু মনে হলো না, বরং তাঁর মুখের ভাব দেখে এড্‌ওয়ার্ডের আরো সাহস হলো।

তখন এগ্‌বার্ট বল্‌ল—"তোমার এই যাদুকরেরা কোথায় আছে?"

এড্‌ওয়ার্ড—"যেখানে সেখানে আছে, সর্ব্বত্র আছে।" এই কথাগুলো সে খুব ভরসার সঙ্গেই বল্‌ল। যেমন করে হোক্ এগ্‌বার্টকে জব্দ করা চাইত? তারপর আবার বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট, তুমি যদি ভাগ্যবলে চিরকাল বেঁচে থাক্‌বার ক্ষমতা পেতে, তবে কি সেটা তুমি সকলের কাছে গেয়ে বেড়াতে? কখনই না, বরং অন্য সাধারণ লোকদের চেয়ে যে তোমার বিশেষত্ব আছে সেটা গোপন করেই রাখ্‌তে।"

একথা শুনে এগ্‌বার্ট ভারি ঘৃণার সহিত বল্‌ল—"হায় রে মূর্খ! তোমার সঙ্গে দেখ্‌ছি তর্ক করাই ভুল। তোমার ম্যাজিক যাদুকর সবই ফাঁকা, আমি একটুও বিশ্বাস করি না।"

এই সময়ে কোণের ভদ্রলোকটি খবর কাগজখানি রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং এগ্‌বার্টের দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে বল্‌লেন—"ফাঁকা হবে কেন, এইত আমিই একজন ম্যাজিসিয়ান্।"

এগ্‌বার্ট ভারি বিরক্তির সঙ্গে বল্‌ল—"বটে, তাই নাকি?" সামান্য একজন অপরিচিত লোক, তাকে কেউ ডাকে নি তবু জোর করে এসে তর্ক যুড়ে দিল—এট এগ্‌বার্ট একটুও পছন্দ করল না। কিন্তু লোকটি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবার মত নহেন, এরূপ অবহেলার ভাব দেখে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বল্‌লেন—"দেখ বাপু! এই ছেলেটি (এড্‌ওয়ার্ড) সব কথাই ঠিক বলেছে। আমি বাস্তবিকই যাদুকর। আর তুমি অতিশয় অভদ্র, তোমার ভারি অহঙ্কার। আমি প্রায় সতে শতাব্দি যাবৎ বেঁচে আছি কিন্তু তোমার মত অসভ্য লোক আর দেখি নাই আজ তোমাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে—তুমি এখনই গণ্ডার হয়ে যাও।" এই কথ বল্‌বার্ সময় তাঁর শরীর বিশ ফুট উঁচু হয়ে গেল, আর এগ্‌বার্টের দিকে আঙ্গু দিয়ে দেখিয়ে কথাগুলি বল্‌লেন। কেন জানি এগ্‌বার্টেরও মনে তখন একটু ভ হলো। সে বুঝ্‌তে পার্‌ল—সত্যি সত্যি যেন এই শাপের সঙ্গে সঙ্গে তা ভিতরে একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে।

ততক্ষণে যাদুকর আবার সাধারণ লোকের মত হয়েছেন। তাঁর মনে যে ভারি অনুতাপ ও দুঃখ হয়েছে—বিড় বিড় করে বল্‌তে লাগলেম, "দূর ছাই তাড়াতাড়ি কি একটা অন্যায় কাজ করে ফেল্‌লাম। পাঁচ শ বছর পরে আবা দুরন্ত রাগ এসে ঘাড়ে চাপ্‌ল? যাক্, এখন এখান থেকে সরে পড়ি।" এই বলে তিনি ঘরের দরজার দিকে চল্‌লেন। এড্‌ওয়ার্ডও তাঁর পিছনে চল্‌ল, তাঁকে ফিরি আনবে ব'লে। কিন্তু দরজা পার হয়েই লোকটি ধোঁয়ার মত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন! এড্‌ওয়ার্ড প্লাট্‌ফর্ম্মে গিয়ে দেখ্‌ল, শুধু একজন রেলের কুলী দাঁড়িয়ে আছে।

তৎক্ষণাৎ সে ওয়েটিং রুমে ফিরে এল। ঘর নীরব নিস্তব্ধ,—তার মনে হলো যেন সে স্বপ্ন দেখেছে। এমন সময় টেবিলের তলা থেকে "ঘোঁৎ ঘোঁৎ" করে শব্দ হলো।

ড্‌ওয়ার্ড নীচু হয়ে দেখ্‌ল, টেবিলের তলায় এগ্‌বার্ট—অর্থাৎ ঠিক এগ্‌বার্টের মত ড় আর হুবহু তারই মুখের মত মুখ একটি গণ্ডার টেবিলের নীচে রয়েছে! বোধ হয়,

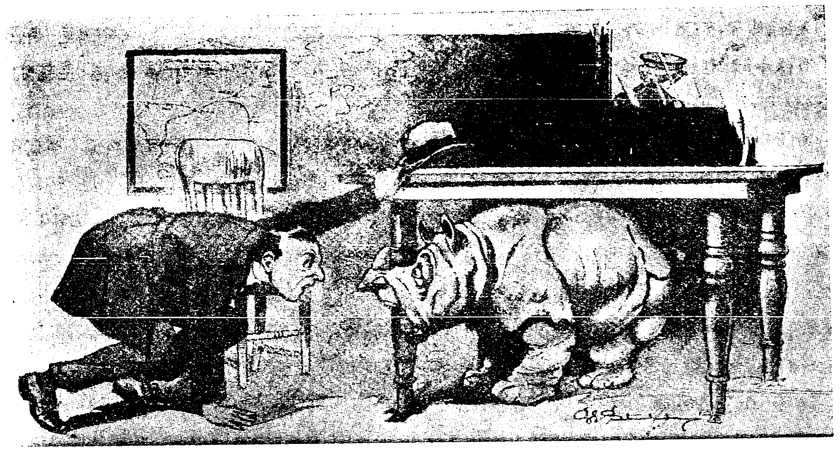

াদুকরের শাপ ফল্‌তে আরম্ভ করেছে। বুঝ্‌তে পেরেই এগ্‌বার্ট টেবিলের নীচে গিয়ে কিয়েছিল। এড্‌ওয়ার্ড বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, টেবিলের নীচে তার বেশীক্ষণ থাক্‌লে লবে না, কারণ তার শরীরটা ছেলেদের রবারের বেলুনের মত ফুল্‌তে আরম্ভ য়েছে!

এগ্‌বার্ট টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল। তা নইলে সেখানে সে আট্‌কা ড়ে যেত, কারণ, টেবিলের পা চারটা মেজের সঙ্গে মজবুৎ করে আট্‌কান ছিল—সেমন অনেক ওয়েটিং রুমে থাকে। টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এসে এগ্‌বার্ট তবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন এড্‌ওয়ার্ডেরও বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

এদিকে গণ্ডারের শরীর খালি ফুল্‌তেই লেগেছে দেখে, হঠাৎ এড্‌ওয়ার্ডের মনে একটা খেয়াল হলো আর বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! শীগ্‌গির প্লাটফর্ম্মে বেড়িয়ে পড়। শীগ্‌গির! নইলে পরে আর এই শরীর দরজা দিয়ে গলবে না।"

গণ্ডার হয়ে গিয়ে এগ্‌বার্টের বুদ্ধিই কমে গেল, না কি, এড্‌ওয়ার্ডের কথা শুনেও প্রায় ১০।১২ সেকেণ্ড সে চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। এড্‌ওয়ার্ড আবার বল্‌ল—

"শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়।" গণ্ডার তখন বেশ দরজার দিকে ছুটল বটে, কিন্তু আ· উপায় নাই, এই কয়েক সেকেণ্ডে তার শরীর প্রকাণ্ড বড় হয়েছে। সমস্ত দরজাটি ঝন্ ঝন্ করে উঠ্‌ল, কিন্তু হায়! এগ্‌বার্টের শরীর তার ভিতর দিয়ে গল্‌ল না এই সময়ে বাইরে সেই কুলী ওয়েটিং রুমের জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই দারু এক চীৎকার করে "কে কোথায় আছ, শীগ্‌গির এসো" বল্‌তে বল্‌তে ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বা ছুটেছে।

এদিকে এগ্‌বার্ট বেরুতে না পেরে ভীষণ রেগেছে, আর কাছে অন্য কারো উপর ঝাল ঝাড়্‌তে না পেরে, শেষে এড্‌ওয়ার্ডকেই করেছে তাড়া। এড্‌ওয়ার্ডে চক্ষু স্থির! বেচারি টেবিলটার আড়ালে আশ্রয় নিল। ভাব্‌ল, কোন মতে এগ্‌বার্টে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে, এক দৌড়ে গিয়ে প্লাটফর্‌মে বেরি পড়বে। কিন্তু এগ্‌বার্ট গণ্ডার হয়েও তার আগের বুদ্ধি একেবারে হারায় নাই এড্‌ওয়ার্ডের মতলব যেন বুঝ্‌তে পেরে' দরজাটি থেকে আর নড়্‌ল না। তখ এড্‌ওয়ার্ড তাকে তোয়াজ কর্‌তে লাগ্‌ল—"এগ্‌বার্ট লক্ষ্মীটি, ঠাণ্ডা হও।"

কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো। এগ্‌বার্ট আরো রেগে গিয়ে শিং দি টেবিলে ভীষণ এক গুঁতো মার্‌ল। এত বড় একটা গণ্ডারের গুঁতো, যত বড় মজবু টেবিলই হোক না কেন—কতক্ষণ আর সইবে? এই ভেবে এড্‌ওয়ার্ড দেওয়ালে একটা তাকের উপর উঠে পড়্‌ল এবং গ্যাসের একটা ব্র্যাকেট ছিল সেটা ধরে কর আশ্রয়। এদিকে এগ্‌বার্ট টেবিলটির উপরেই তার রাগ ঝাড়তে আরম্ভ করে দিল

ক্রমে এড্‌ওয়ার্ডের হাত অবশ হয়ে আস্‌ছে, একটা ব্র্যাকেট ধরে কতক্ষ শরীরের ভার রাখা যায়? তখন সে খুব তেজ করে বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! থাম শীগ্‌গি আমার কথা শোন। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, এখন আমিই হচ্ছি তোমার উদ্ধারের একমা অবলম্বন। কুলীটা লোক ডাক্‌তে গিয়েছে। লোকজন এসে হয় তোমাকে গুলি করে মার্‌বে, না হয় ধরে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখ্‌বে। কি আমি যদি তাদের বলি, যে, তুমি আমার পোষা গণ্ডার—তবে তারা তোমাকে বাড় নিয়ে যেতে দিবে। তবেই দেখ, আমাকে মার্‌লে তোমার ভারি বিপদ।"

একথা শুনে মনে হলো যেন গণ্ডারের রাগ কমেছে, যেন সে ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরেছে। তখন এড্‌ওয়ার্ড আবার বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! বইয়ে পড়েছি, শাপে কেউ কোন জন্তু হলেও, কথা বল্‌তে পারে। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখত, কথা বল্‌তে

ার কি না?" এগ্‌বার্ট চেষ্টা কর্‌ল বটে, কিন্তু শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ ছাড়া আর কোন কথা ার মুখ দিয়ে বেরুল না। এড্‌ওয়ার্ড আবার বল্‌ল—"আচ্ছা! হঁা বা না সেটা থা নেড়ে বল্‌তে পার্‌বে ত? লোকেরা এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে আমি সবাইকে বল্‌ব মি আমার পোষা গণ্ডার। তারপর তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। সেই যাদুকরকে খানে পাই খুঁজে বা'র করে আবার তোমাকে মানুষ করাব্‌। এসব আমি, প্রতিজ্ঞা রে বল্‌ছি, কর্‌বই কর্‌ব। তাহলে এখন আমি নীচে নেমে আসি?" এগ্‌বার্ট মাথা ড়ে বল্‌ল—হাঁ। ব'লে সে ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে রইল।

তখন এড্‌ওয়ার্ড তাক থেকে নেমে প্লাটফর্‌মে গেল। ততক্ষণে সেই কুলী শন মাষ্টারকে ডেকে এনে উপস্থিত, তাদের পিছনে একদল লোকও তামাসা খ্‌তে এসেছে। কুলীটা তাকে দেখিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে বল্‌ল—"এই সেই াক।" ষ্টেশন মাষ্টার খুব গম্ভীর হয়ে এড্‌ওয়ার্ডকে বল্‌ল—"বিষয়টা কি মহাশয়?" ড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"ওয়েটিং রুমের মধ্যে একটা গণ্ডার রয়েছে। একটু এগিয়ে গিয়ে ুন। ভয় নাই, ওটা দরজা দিয়ে গল্‌বে না—প্রকাণ্ড বড়।"

তখন সকলে দূর থেকে গণ্ডারের ভীষণ চেহারা দেখ্‌লে পর, ষ্টেশন মাষ্টার ওয়ার্ডকে বল্‌ল—"এটা কি আপনার গণ্ডার?"—"হাঁ, আমারই।"—"তবে ওটাকে র করে আনুন।"—"কি করে আন্‌ব? ওটা মস্ত বড়—দরজা দিয়ে গল্‌বেনা।"—া, যে রকমে পারেন বা'র করে আনুন। ওয়েটিংরুম গণ্ডারের জন্য করা হয়নি।"

এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"ওটা যদি বেরিয়ে আস্‌তেও পারে তবু আপনাদের কোন নাই—ওটা আমার পোষা গণ্ডার।"

ষ্টেশন মাষ্টার—"পোষা হোক্ আর বুনো হোক্, ওটাকে এখানে আনাটাই পনার উচিত হয়নি।"

এড্‌ওয়ার্ড—"তাইত! তা'হলে এখন কি করা যায়? আমার বাড়ী যেতে সেণ্ডারষ্টন্ ষ্টেশনে নাম্‌তে হয়। যেমন করে হোক্, গণ্ডারটাকে নিয়ে সেখানে আমাকে যেতেই হবে—আমি ৫ টা ২২ মিনিটের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি।"

ষ্টেশন মাষ্টার—"কি! প্যাসেঞ্জার ট্রেইনে আপনি গণ্ডার নিয়ে যাবেন? কিছুতেই া হবে না। রাত্রি ১২ টায় একটা মালগাড়ী যাবে সেণ্ডারষ্টন্ ষ্টেশনে সেটাতে আমি আপনার গণ্ডারেরই জন্য না হয় একটা গরুর গাড়ী যুতে দিতে পারি। ততক্ষণ আপনি অনুগ্রহ করে গণ্ডারটাকে বাইরে এনে রাখুন।"

এড্‌ওয়ার্ড—"কি বিপদ! আমিত বার বার বল্‌ছি, যে, ওটাকে বা'র করা যায় না!" এই বলেই সে ওয়েটিংরুমের দরজার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! আর একবার চেষ্টা করে দেখ দেখি, বেরুতে পার কি না। এর আমার কথা বিশ্বাস কর্‌ছে না।"

বল্‌তে বল্‌তেই এগ্‌বার্ট ভীষণ বেগে দরজার উপর এসে পড়েছে, আর সমস্ত দরজা জানালা ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠেছে। ষ্টেশন মাষ্টার, লোকজন, কুলি টুলী সব ভয়ে ছিট্‌কে একবারে প্লাটফর্‌মের নীচে! এদিকে এগ্‌বার্টের বিশাল দেহ দরজা দিয়ে কিছুতেই গল্‌ল না, কিন্তু ধাক্কার বেগে সব কাচটাচ ভেঙ্গে চুর্‌মার

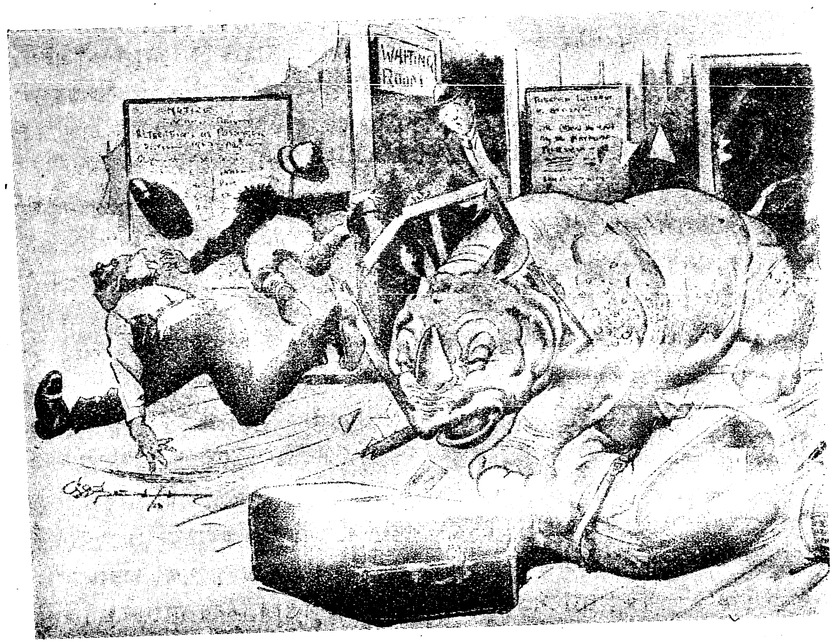

ষ্টেশন মাষ্টার প্লাটফর্‌মের উপরে মাথা তুলে এড্‌ওয়ার্ডকে বল্‌ল—"মহাশয়! এসব জিনিষের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আপনার নাম আর ঠিকানা দিন্।"

এড্‌ওয়ার্ড পকেট থেকে কার্ড বা'র করে দিল। "মিষ্টার এড্‌ওয়ার্ড হ্যালেট্—ষ্টোট্ হাউস্, সেণ্ডারষ্টন্" এই কথা জোরে জোরে পড়ে, ষ্টেশন মাষ্টার কট্‌মট্ করে কিয়ে এড্‌ওয়ার্ডকে বল্‌ল—"জেনারেল হ্যালেটকে আমি জানি। তাঁর ছেলে য় আপনি আমাদের সঙ্গে তামাসা কর্‌ছেন?—কি লজ্জার কথা!" ঠিক এই ময়ে দূরে রেলের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল। আর সঙ্গে সঙ্গে "৫ টা ২২ মিনিটের গাড়ী সছে" ব'লে, ষ্টেশন মাষ্টার তাঁর কাজে চ'লে গেলেন।

এগ্‌বার্টও গাড়ীর বাঁশী শুন্‌তে পেয়েছিল। এই গাড়ীতেই তার যাবার কথা, সুতরাং আবার সে বেরোবার জন্য ভীষণ চেষ্টা আরম্ভ কর্‌ল। ঘরের কাঠের নিষপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। দরজার কাছে গিয়ে এড্‌ওয়ার্ড কত বুঝাতে গ্‌ল কিন্তু এগ্‌বার্টের গ্রাহ্যই নাই, সে তখন বেরিয়ে আস্‌বার চেষ্টায় উন্মত্ত।



এড্‌ওয়ার্ডের ভয় হলো, যদি কোন প্যাসেঞ্জার এই গাড়ী থেকে নেমে ওয়েটিং রুমে ঢুক্‌তে যায়, তবে কি উপায় হবে?

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গাড়ী থেকে শুধু এক বুড়ী মেম নাম্‌লেন। বুড়ী নেমেই লাগেজগাড়ী থেকে তাঁর মাল নামাতে মহা ব্যস্ত হলেন; লাগেজ গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক ওয়েটিং রুমের মুখোমুখি।

লাগেজ গাড়ীটা দেখেই এগ্‌বার্ট আর একবার শেষ চেষ্টা কর্‌ল বেরোবার জন্য। এবারে আর দরজা দিয়ে চেষ্টা না করে ওয়েটিংরুমের জানালা দিয়ে বেরোতে চেষ্টা কর্‌ল। হঠাৎ ভীষণ এক হুড়মুড় শব্দ! এড্‌ওয়ার্ড ফিরে চেয়ে দেখ্‌ল, কাচটাচ ভেঙ্গে, জানালার ফ্রেমটা গলায় মালার মত ক'রে পরে, এগ্‌বার্ট প্লাটফর্‌মে বেরিয়ে পড়েছে, আর বেরিয়েই একদম লাগেজ গাড়ীর দিকে ছুট্! বুড়ী মেমের দুটো ট্রাঙ্ক মাড়িয়ে ফুটো করে, একেবারে

লাগেজ গাড়ীর মধ্যে গিয়ে ভাল মানুষটির মত বসে পড়েছে। তাও আবার বসেছে, বুড়ী মেমের যে ট্রাঙ্কটা নামাতে বাকী ছিল, ঠিক সেটার উপরে। তখন বুঝ্‌তেই পার সেটার কিরূপ অবস্থা হলো!

এড্‌ওয়ার্ড তক্ষণি গিয়ে এগ্‌বার্টকে বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! শীগ্‌গির বাক্স থেকে উঠ—দেখ্‌তে পাচ্ছ না, ভদ্রমহিলার বাক্সটির যে দফা রফা করেছ?"

চিরকালই স্ত্রীলোকের প্রতি খুব ভদ্র ব্যবহার করা এগ্‌বার্টের স্বভাব। সুতরাং "ভদ্রমহিলার বাক্স" একথা শুনেই তৎক্ষণাৎ সেই বাক্স থেকে উঠে পড়্‌ল। আর পা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল, বাক্সটাকে ঠিক কর্‌তে। এই ব্যাপার দেখে জনতার মধ্য থেকে একজন বলে উঠ্‌ল—"আরে, এটা যে দেখ্‌ছি সার্কাসে গণ্ডার! কথা বুঝ্‌তে পারে, নানা রকম কায়দাও জানে!"

এদিকে এড্‌ওয়ার্ড সেই মেমের দিকে ফিরে, দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতে গিয়েছে, তখন মেম তাকে বকুনিটা যা দিল!

বাপরে বাপ্! সে সব বকুনির অর্থ বোধ করি কোন ডিক্‌সনারিতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। গালিটালি শেষ করে মেম বল্‌লেন—"শীগ্‌গির্ তোমার নাম আর ঠিকানা দাও।" এড্‌ওয়ার্ড একখানা কার্ড বা'র করে মেমের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবে কি, তখনি ষ্টেশন মাষ্টার আর গার্ড এসে বল্‌ল—"মশায়, শীগ্‌গির্ আপনার গণ্ডার গাড়ী থেকে বা'র করুন—এক মুহূর্ত্ত দেরি কর্‌লে চল্‌বেনা।"

এড্‌ওয়ার্ড চেয়ে দেখ্‌ল, এগ্‌বার্ট নিশ্চিন্তমনে লাগেজ গাড়ীতে বসে আছে। দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়, সেখান থেকে বেরোবার ইচ্ছা তার মোটেই নাই। তখন বল্‌ল—"ওযে ওখান থেকে বেরোবে, তা ত মনে হয় না।"

গার্ড—"বেরোতেই হবে, ওটাকে শুদ্ধ আমি গাড়ী কিছুতেই নিয়ে যাব না। এদিকে আবার গাড়ী ছাড়্‌বার প্রায় ১০ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে।" এড্‌ওয়ার্ড এগিয়ে গিয়ে এগ্‌বার্টকে তোয়াজ কর্‌তে লাগ্‌ল—"লক্ষ্মীটি! বেরিয়ে এস ওখান থেকে। ওখানে থাক্‌লে আমাদের মুস্কিল আরো বেড়ে যাবে।" কিন্তু এগ্‌বার্ট বেরোবে কি, সে আরো মজবুত হয়ে বসে মাথা নাড়্‌তে লাগ্‌ল। এড্‌ওয়ার্ডের তোয়াজ দেখে ভরসা পেয়ে, গার্ডও এগিয়ে গিয়ে, তাতে যোগ দিল। তার উদ্দেশ্য ভালই ছিল কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো। এগ্‌বার্ট উঠে দরজার কাছে এসে,

াক মুখ সিট্‌কিয়ে গার্ডের দিকে এমন করে তাকাল, যে, ভয়ে বেচারি এক লাফে ছনের দিকে সরে গেল। তখন গার্ড সাহেব আর এক চাল চাল্‌লেন—"ষ্টেশন



ষ্টার! এই লাগেজ্ গাড়ীটা কাটিয়ে দিন্, ওটাকে ফেলেই আমাকে যেতে হবে।"

এই কথা বল্‌তেই, সমস্বরে ১০।১২ জন প্যাসেঞ্জার বলে উঠ্‌ল—"বটে! তাহলে আমাদের লাগেজগুলির কি উপায় হবে?"

তখন ষ্টেশন মাষ্টার এড্‌ওয়ার্ডকে দেখিয়ে বল্‌ল—"আপনাদের লাগেজের উপায় এই ভদ্রলোকটি কর্‌বেন।" এই বলেই খালাসিকে হুকুম কর্‌ল—"গাড়ী কাট্ দেও।" কিন্তু "গাড়ী কাট্ দেও" বল্‌লেই ত হবে না—কে কাট্‌বে বাপু? খালাসী লাগেজ গাড়ীর কাছে যেতেই, শিং বাগিয়ে এড্‌ওয়ার্ড এম্‌নি তেড়ে উঠ্‌ল, যে, "বাপ্ রে বাপ্" বলে খালাসী ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্!

তখন এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"গাড়ী কাটা সহজ হবে না, আমার গণ্ডার আপনাদের সমস্ত কথাই বুঝ্‌তে পারে। ও কি সেণ্ডারষ্টন্ ষ্টেশনে না গিয়ে ছাড়্‌বে? তা চাইতে এক কাজ করুন না মশাই—আমাকে লাগেজ গাড়ীতে ওর সঙ্গে যেতে দিন, তবেই ত সব গোল চুকে যাবে?" শেষে তাই স্থির হলো বটে কিন্তু প্যাসেঞ্জারের বল্‌ল—"মশায়! লাগেজ গাড়ীতে আমাদের অনেক জিনিষ পত্র আছে। আপনাকে দিয়ে ভরসা কি?" এড্‌ওয়ার্ড তার নামের বাকি কার্ডগুলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে তাদের ঠাণ্ডা কর্‌ল।

যাহোক্, এত সব হাঙ্গামার পর গাড়ী শেষে ষ্টেশন ছেড়ে চল্‌ল। এড্‌ওয়ার্ড লাগেজ গাড়ীতে এগ্‌বার্টের সঙ্গে একলাটি বসে। তখন সে খুব রাগ করে বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! এখন তুমি খুসী হয়েছ ত?" একথার উত্তর না দিয়ে এগ্‌বার্ট কাঁচুমাচু করে গড়িয়ে পড়ল, আর পড়ল ত পড়ল একটা বাক্‌সের উপরে—বাক্‌স গেল ফেটে! এড-ওয়ার্ড রেগে আগুন হয়ে বল্‌ল—"দেখ এগ্‌বার্ট! আমি তোমার অনেক উপদ্রব সহ্য করেছি। ঠেঁটামি করে তুমি আমাকে কতখানি মুস্কিলে ফেলেছ,



তা বুঝ্‌তে পারছ না? এখন তোমার ভাল-মন্দ সব আমার দয়ার উপর নির্ভর করে—সেটা ভুলে যেও না।"

এ কথার পর মনে হলো যেন এগ্‌বার্ট ভারি লজ্জিত হয়েছে। সে এড্‌ওয়ার্ডের কাছে এসে, ঠিক কুকুরের মত করে তার হাত চাট্‌তে লাগ্‌ল। তখন এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"সাবধান! সেণ্ডারষ্টন্ ষ্টেশনে পৌঁছে কিন্তু আর কোন গোলমাল বাধাতে পার্‌বে না। ঠিক আমি যেমনটি বল্‌ব, তেমনটি কর্‌তে হবে। এরূপ অবস্থায় তুমি তোমার বাড়ীতে যেতে পার না—জানইত, তোমার মা তাহলে

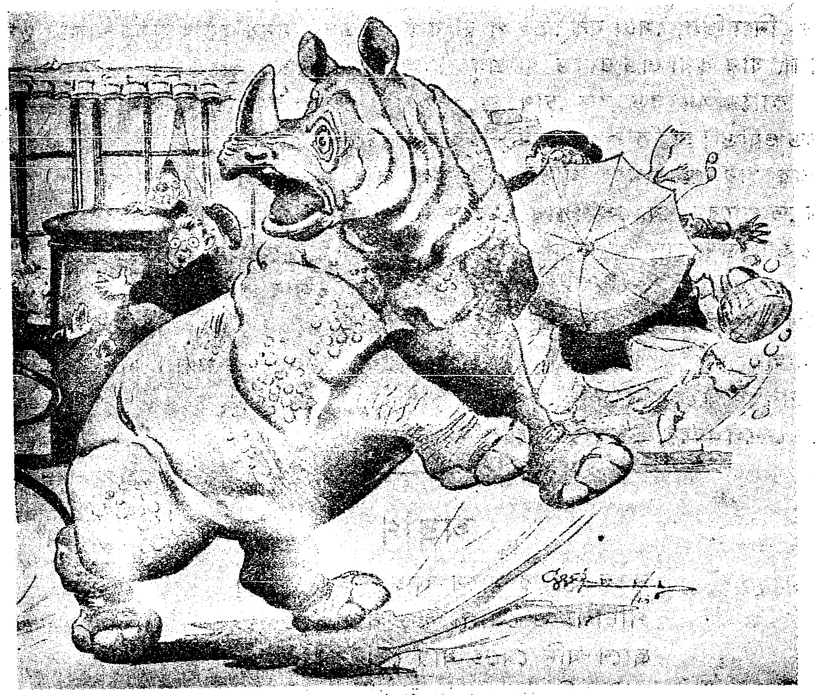

ফিট্ হয়ে মারা যাবেন। আজ রাত্রিটা তোমাকে আমাদের মটর গাড়ীর

BLEED THROUGH.

ঘরে রেখে দিব। পথে তুমি আমার আগে আগে যাবে, আর খুব ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হবে।”

এগ্‌বার্ট মাথা নেড়ে জানাল, যে, সে রাজি আছে। তখন এড্‌ওয়ার্ড, সেই মেমের ভাঙ্গা ট্রাঙ্কের একটা চামড়ার পেটি পড়েছিল সেটা নিয়ে, এগ্‌বার্টের পিছনের পায়ে সেটার একটা মাথা বেঁধে অন্য মাথাটা ধরে বসে রইল। পথে আর কোন গোল হলো না।

সেণ্ডারষ্টন্ ষ্টেশনে নিরাপদে নেমে, এগ্‌বার্টকে নিয়ে এড্‌ওয়ার্ড পথ ধরে চলেছে। ক্রমে তারা বড় রাস্তায় গিয়ে উপস্থিত, লোকজনও যে কিছু কিছু তাদের সঙ্গ নিয়েছিল, সেটা বুঝ্‌তেই পারা যায়। এমন সময় হঠাৎ এমন একটা দুর্ঘটনা হলো, যার কথা এড্‌ওয়ার্ড বা এগ্‌বার্ট আগে ভাব্‌তেও পারেনি।

ক্যাথেলিন বড় বড় চোখ করে হঠাৎ কোথা হতে এসে উপস্থিত। এসেই “এড্‌ওয়ার্ড! এ কি কর্‌ছ তুমি?” বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। এগ্‌বার্ট তার ভাবী স্ত্রীর গলার স্বর শুন্‌বামাত্র আর মাথা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ল না। পাছে ক্যাথেলিন্ বুঝ্‌তে পারেন, যে, সে গণ্ডার হয়েছে—এই দারুণ ভয়ে এগ্‌বার্টএক হ্যাঁচ্‌কা টানে এড্‌ওয়ার্ডের হাত থেকে চাম্‌ড়ার পেটিটা ছিনিয়ে নিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্!

এড্‌ওয়ার্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর শুন্‌তে লাগ্‌ল—দূরে রাস্তায় খালি চীৎকার, আর্ত্তনাদ আর অভিসম্পাত চলেছে। আর একটা ঘোড়া যেন পাগলের মত ছুটেছে, তার পায়ের খটাখট্ শব্দ শোনা যায়। তাদের গ্রামের ডাক্তার রোগী দেখ্‌তে বেরিয়েছিলেন, তাঁর তেজিয়ান্ ঘোড়া, ভয়ে তাঁকে আবর্জ্জনার টিনে ফেলে দিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে—এ তারই পায়ের শব্দ। ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

অঘ্রাণ

নূতন গুড়ের মাসে আহা কি আয়েস!
পাটালী ও ঝোলা গুড় সন্দেশ ও পায়েস।
ঘ্রাণে যদি মেতে যায় পেটুকের প্রাণ,
তাই বুঝি এ মাসের নামটি অঘ্রাণ।

আঁধারে



আঁধার হ’লে অস্তাচলে, গাছের তলে চেরাগ জ্বলে
জোনাক্ চলে সদলবলে পলে পলে ঝিলীক ঝলে।
ফুলমহলে কৌতূহলে ঘোম্‌টা খোলে ফুলের দলে।
মায়ার ছলে জলে স্থলে পুলক দোলে বনের কোলে।

BLEED THROUGH.

ভূতের গল্প

(সত্য ঘটনা)

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই ঘটনার কথা বলিয়াছেন। অনেক দিন আগে একবার সেই ভদ্রলোক ও তাঁহার কাকা এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাইতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। নির্জ্জন ঝাড় জঙ্গল আর ধানক্ষেতের ভিতর দিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন। সন্ধ্যার আবছায়ায় পথ অল্পে অল্পে ঢাকা পড়িতেছে। পথে লোকজনের আনাগোনা বন্ধ হইয়াছে; পথিক কেবল তাঁহারা দুইজন। ভদ্রলোকটি খুব নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাকার মনের অবস্থা অন্য রকম, কারণ, তিনি একটু ভীরু প্রকৃতির লোক। সামান্য কারণেই তাঁহার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিতেছে। বন বাদাড়ের আড়ালে পাখী ডাকিলে অথবা গাছের ডালে বাদুড় কিংবা চামচিকা নড়িলেই তিনি চমকাইয়া উঠিতেছেন; বাতাসে ধানক্ষেত একটু কাঁপিলেই ভয়ে তাঁহার গায়ে কাঁটা দিতেছে।

এই ভাবে তাঁহারা চলিয়াছেন, এমন সময়ে ভদ্রলোকটির কাকা হটাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওহে! ঐ ধানক্ষেতের মাঝখানে একটা শিয়াল কেমন চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখ।" ভদ্রলোকটি চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই অনেকদূরে একটা শিয়াল স্থিরভাবে একদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিলেন, "এই সব ধানক্ষেত আর ঝাড় জঙ্গলে অনেক শিয়াল থাকে। কি জানি কেন এই শিয়ালটা এমনভাবে একদিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু আমি ত ভয়ের কোন কারণ দেখি না।" এই কথায় তাঁহার কাকার ভয় কিছু কমিয়া গেল; তাঁহারা আবার চলিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি শিয়ালটার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়াও কিছুমাত্র ভয় পান নাই, কিন্তু তাঁহার কাকা একটু ভয়ে ভয়েই চলিতেছিলেন। তিনি ক্ষেতের আশে পাশের ঝুপ্সি ঝাপ্সি ঝোপঝাড়ের দিকে বারবার তাকাইতেছেন। পাতার সামান্য সর্সর্ শব্দ হইলেই তাঁহার মেরুদণ্ড শির্শির্ করিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, তাঁহার ভয়ও ততই বাড়িতেছে। তিনি বলিলেন, "ওহে! সন্ধ্যা হইয়া পড়িল যে। আমরা বড়ই একা একা চলিয়াছি; সময় মত গ্রামে পৌঁছাইতে না পারিলে নিরেট্ অন্ধকারে পথ ঘাট ছাইয়া ফেলিবে।" ভদ্রলোকটি

একটু বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "একা চলিয়াছি তাহাতে ক্ষতি কি? ভয় আবার কিসের? এই বয়সেও তোমার ভয় গেল না! এতটা পথ আসিয়াছি, গ্রামে পৌঁছাইতে দেরী হইবে কেন?" এই কথার পর তাঁহারা একটু তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া ভদ্রলোকটির কাকা হটাৎ থামিয়া গেলেন, আর সাম্নের ধান ক্ষেতের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওহে! আগে যেখানে শিয়াল দেখিয়াছিলাম, এখন সেখানে একটা শূয়র আসিয়াছে আর কেমন ভাবে তাকাইয়া আছে। শিয়ালটা শূয়র হইয়া গেল নাকি!" ভদ্রলোকটি দেখিলেন, সত্যই ধানক্ষেতে একটা শূয়র দাঁড়াইয়া আছে, আর শিয়ালটা যেমন ভাবে চাহিয়া ছিল ঠিক তেমনি ভাবে একই দিকে তাকাইয়া আছে। ইহা দেখিয়া তিনি খুব আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, কিন্তু ভয় পাইলেন না। বলিলেন, "এখানে শূয়র প্রায়ই আসিয়া থাকে। আমরা আমাদের পথে চলি; শূয়রের কথা ভাবিয়া কাজ কি?" ভদ্রলোকটি সাহসী ও ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁহার মনে কোন রকম ভয়ের কল্পনা স্থান পাইল না; কিন্তু ব্যাপারটি তাঁহার কাছে বড়ই আশ্চর্য্যজনক বোধ হইল। তাঁহার কাকার কিন্তু যথেষ্ট ভয় হইয়াছে। এলোমেলো পথ দিয়া ও ক্ষেতের সরু আলের উপর দিয়া হাঁটিবার সময় তাঁহার পা কাঁপিতেছিল। পাখীরা তখন বাসায় ফিরিতেছিল; দূর হইতে মধ্যে মধ্যে তাহাদের অস্পষ্ট কোলাহল কাণে আসিলেই তিনি ভাবিতেছেন বা, শূন্যে কাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে।

এইভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহারা হটাৎ একটি দৃশ্য দেখিয়া থম্কাইয়া দাঁড়াইলেন। ধানক্ষেতের ভিতর, আগে যেখানে শূয়র ছিল সেই খানে, এক প্রকাণ্ড মহিষ একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শূয়রটার মত মহিষটাও ঠিক একই দিকে স্থিরভাবে তাকাইয়া আছে। তাঁহারা তাহার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। নিঝুম সন্ধ্যায় নির্জ্জন ধানক্ষেতের ভিতর মহিষটাকে বড়ই বিশ্রী দেখাইতেছিল; যেন, সেইখানে অন্ধকার জমাট্ বাঁধিয়া গিয়া মহিষের আকার ধারণ করিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ভদ্রলোকটির কাকা ত ভয় পাইলেনই, ভদ্রলোকটি নিজেও চম্কাইয়া উঠিলেন। ঘটনাটি তাঁহার কাছে ধাঁধার মত বোধ হইতে লাগিল। শেষে তিনি বলিলেন, "এতদূর যখন আসিয়াছি, তখন শেষ পথটুকুও তাড়াতাড়ি পার হইয়া যাই।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার কাকাকে একরকম জোর

করিয়াই টানিয়া লইয়া খুব বেগে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, "আমি সমস্ত ব্যাপারটির রহস্য বুঝিয়াছি। এই দেখ, তোমাকেও ব্যাপারটি বুঝাইয়া দেই।" এই বলিয়া তিনি মহিষটার দিকে যাইতে লাগিলেন; তাঁহার কাকা বারণ করিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন না। মহিষটার কাছে গিয়া তিনি তাঁহার কাকাকে বলিলেন, "এই দেখ, এটি বাস্তবিক মহিষ নহে; একটি ঝোপের চারি পাশে চারিটি গাছের গুঁড়ি রহিয়াছে, তাহাই মহিষের পায়ের মত দেখাইতেছে, ঝোপটি মহিষের শরীরের মত দেখাইতেছে। একই জিনিষই পরপর শিয়াল, শূয়র ও মহিষ বলিয়া ভুল হইয়াছিল। ঝোপের সাম্‌নে দুটি গাছের ডাল বাহির হইয়াছে, তাহাই দূর হইতে একবার শূয়রের দাঁত, আর একবার মহিষের শিং বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমরা শুধু শুধু ভয় পাইয়াছিলাম।" তাঁহার কাকারও তখন ভয় কাটিয়া গেল।

তাঁহারা আস্তে আস্তে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে পৌঁছাইলেন। পরে লোকের তাঁহাদের মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়া খুব আমোদ বোধ করিল।

শ্রীসুবিমল রায়, এম-এ

অভিমান

দুপুর হ'লে পরে,
খুকুর খেলা ঘরে
ফিসির ফিসির করে,
পুতুল গোটা ছয়।

গাল ফুলিয়ে আর
মুখটি ক'রে ভার,
কাঁচের পুতুল তার
মনের কথা কয়,—

"ফুরিয়ে এল বেলা,
রইল পড়ে খেলা,
এমন হেলা ফেলা
জন্মে দেখি নাই।

সকাল থেকে আজ
হয়নি মোদের সাজ,
এতই কি তার কাজ,
ভেবেই নাহি পাই।"

দুচোখ ভ'রে জলে,
কাঠের পুতুল বলে
"ভুলিয়ে কোন ছলে
কেউ নিয়েছে সাথে।

দেখ্‌লে নাকি হায়,
পালিয়ে যেতে তায়,
নূতন জুতা পায়,
বইটি নিয়ে হাতে?"

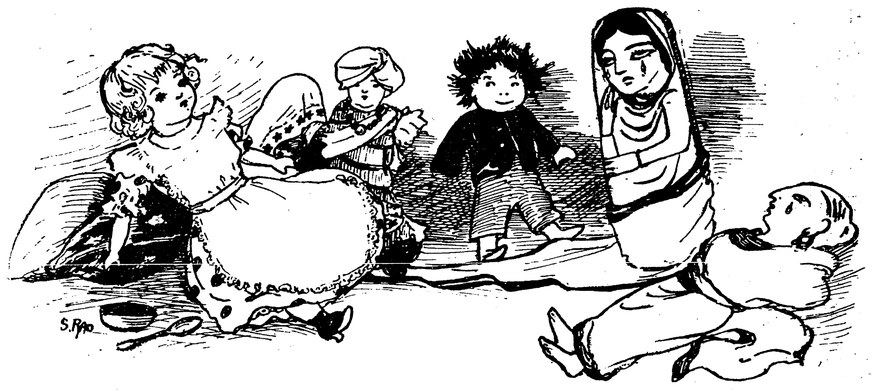

এম্‌নি সময় এসে,
কতই ভালবেসে,
বল্‌ল খুকু হেসে
তাদের দশা হেরি,—

"ছোট্ট ত আর নাই?
হয়েছি বড়, ভাই,
ইস্কুলেতে যাই,
তাইতে এত দেরী!"

শ্রীসুখলতা রাও।

বশীকরণ-বিদ্যা

(ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে লিখিত ঘটনা হইতে)

সাপুড়েরা ভয়ানক বিষাক্ত সাপকেও বশ করতে পারে। অনেকে বলেন, তাদের কাছে নাকি "বিষমারী" আর "সর্পমারী" নামে একরকম গাছের শিকড় থাকে, তাই দিয়ে তারা কেউটে, গোক্ষুরের মত ভীষণ বিষাক্ত সাপকেও বশ করে। এই গাছ নাকি উইএর ঢিপির গোড়ায় জন্মায়। আবার কেহ কেহ বলেন,

সাপুড়েদের চক্ষুর দৃষ্টিতে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি থাকে, যে, যত বড় বিষাক্ত সাপ হউক না কেন, একবার সেই দৃষ্টির মাঝে পড়লে তার আর কোন অনিষ্ট করবার ক্ষমতা থাকে না।

এগুলি বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন অনেক যাদুকর আছে, যাদের ক্ষমতা আরো অদ্ভুত। এদের অনেকে বশীকরণ (hypnotism) বিদ্যার বলে, অতি অদ্ভুত সব কাজ করতে পারে—এই বিদ্যায় তারা একেবারে সিদ্ধহস্ত। দর্শকদিগকে আশ্চর্য্য উপায়ে বশ করে, তারা কত রকমে তাদের কাজ উদ্ধার করে নেয়। অনেক সন্ন্যাসী, এবং যাদুকর আছে তারা নাকি ভৌতিক বিদ্যার বলে নানারকম অদ্ভুত ঘটনা দেখাতে পারে—এটাই হচ্ছে দেশের লোকের সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যাঁরা এই সব লোকের কার্য্যকলাপ দেখেছেন, তাতে তাঁদের মনে হয়—এরা বশীকরণ বিদ্যার বলেই যত সব অদ্ভুত কাজ করে থাকে। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বল্‌ছি—এক সন্ন্যাসী একবার খুব বড় একজন সাহেব রাজ-কর্ম্মচারীর বাড়ীতে গিয়ে, মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তখন বিকাল বেলা, মেম সাহেব উপরের ঘরে শুয়েছিলেন। সন্ন্যাসী একদল চাকরের সাম্‌নেই বাড়ীতে ঢুকেছিল। চাকরেরা মহা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠ্‌ল কিন্তু সন্ন্যাসীকে বাধা দিবার কারো ক্ষমতা ছিল না।

গোলমাল শুনে মেম সাহেব উপর থেকে নেমে এলেন। আর তখনই সন্ন্যাসী একেবারে তাঁর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। সাম্‌নে গিয়েই বল্‌ল,—"এখনই আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিন্।" আশ্চর্য্যের বিষয়, মেম সাহেবও তখনই, যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে উপর থেকে পঞ্চাশ টাকা এনে সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন—সন্ন্যাসী চক্ষের নিমেষে উঠান পার হয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে পড়ল। খানিক পরেই চাকরদের তন্দ্রার ভাব দূর হলো বটে, কিন্তু তখন আর সন্ন্যাসীকে খুঁজে পাবে কোথা? এরূপ ঘটনা বিরল নয়—ভণ্ড সন্ন্যাসীরা এরূপভাবে স্ত্রীলোককে মন্ত্র-মুগ্ধ ক'রে, কত সময় কত কিছু নিয়ে যায়।

মান্দ্রাজের এক সহরে একবার এক সাধুকে কয়েদ করা হয়েছিল। এই সাধুর নাকি ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত; তাই তার বিদ্যার পরীক্ষা দেখ্‌বার জন্য, জেলখানার কর্ত্তা অনেক মান্যগণ্য লোকদের একদিন নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। সাধুকে জেলখানার বাড়ীর চার তালায় একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ঘরটার তিনদিকে মোটা লোহার

রাদ, চতুর্থ দিকে দরজা—সেটাতেও মজবুত লোহার রেলিং দেওয়া। দরজা না খুলে দিলে ঘর থেকে বেরোবার কোন উপায় নাই।

সন্ন্যাসীর ক্ষমতার পরীক্ষা কর্‌তে গেলে, সে ভারি বিনয়ের সহিত বল্‌ল, যে, তার ক্ষমতার সম্বন্ধে যে সব কথা রাষ্ট্র হয়েছে, সে সব বাজে কথা। যাহোক্, অনেক পীড়াপীড়ি করার পর, সে বল্‌ল—"আচ্ছা, দেখি একবার চেষ্টা করে।" দর্শকেরা সকলেই খুব ব্যস্ত হয়ে সাধুর সম্বন্ধে নানারকম কথা বার্ত্তা বল্‌ছে, এমন সময়, হটাৎ কারাগৃহের ছাদের দিক্ থেকে মহা এক গণ্ডগোল শুনা যেতে লাগ্‌ল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মস্ত বড় একটা মাটির হাঁড়ি এসে ধুপ্ করে, একেবারে দর্শকদের মধ্যখানে মাটিতে পড়েছে! আর সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পাথর, ইট পাট্‌কেল সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল! কারাগৃহে কি করে যে এই হাঁড়িটা গেল, তার রহস্য ছুতেই বুঝা গেল না। সকলে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল।

তখন সন্ন্যাসী বল্‌ল—"যতই হুঁশিয়ার হয়ে আমাকে পাহারা দেওয়া হোক্ না, এবং যেমন করেই আমাকে বন্ধ করে রাখা হোক্ না কেন, আমি ইচ্ছা কর্‌লেই যেখানে খুসী বেরিয়ে যেতে পারি। যাই না শুধু এই ভেবে, যে, তাহলে নির্দ্দোষ প্রহরী বেচারাদের সাজা হবে।" একথা দর্শকদিগের কেহ বিশ্বাস কর্‌ল না। সন্ন্যাসীও সেটা বুঝ্‌তে পার্‌ল। দর্শকেরা তখন এ সম্বন্ধে খুব আলোচনা কর্‌ছে, এমন সময় একজন হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—"আরে, সন্ন্যাসীকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না—কোথা গেল?" তখন সকলে চেয়ে দেখে সত্যি—সন্ন্যাসী ঘরের ভিতর নাই! সর্ব্বনাশ! কোথা গেল? খোঁজ, খোঁজ কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এমন সময় কারাঘরের অপর পাশের মজবুত গরাদের বেড়াটা হঠাৎ ভীষণ ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে গিয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেয়ে দেখ্‌ল, সন্ন্যাসী ঠিক আগের মত ঘরের মধ্যখানে তার আসনটিতে গম্ভীর হয়ে বসে আছে!!

ট্রেভাঙ্কোর পর্ব্বতমালার নীচে এমন সব সাংঘাতিক উপত্যকা আছে, যে, সেখানকার গ্রামে রাত্রে মারাত্মক গ্যাস্ উঠে। বাইরের কোন লোক সেখানে গিয়ে একরাত্রি ঘুমালেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। একবার একজন রাজকর্ম্মচারীকে খুব জরুরি কাজে সেখানে যেতে হয়েছিল। কথা ছিল, যে, কাজ টাজ সেরে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি সে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি হয়ে, পার্ব্বত্য নদী ও ঝরণাগুলিতে এমনি জল হলো, যে, কর্ম্মচারীটি কিছুতেই চলে

আস্‌তে পার্‌লেন না। সুতরাং তাঁকে রাত্রে সেই গ্রামেই থাক্‌তে হলো। গ্রামের মোড়লের দারুণ ভাবনা হলো, কি করে তাঁকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বে। কর্ম্মচারীটি ফিরে এসে বলেছিলেন:—"রাত্রে বসে থেকে থেকে শেষে আমি যখন বুঝ্‌তে পারলাম, যে, কিছুতেই আর না ঘুমিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না, তখন হঠাৎ শুন্‌লাম—বিদ্‌ঘুটে গান আর ঢাকের শব্দ হচ্ছে, আর সেটা ক্রমে আমার বাংলোর দিকে আস্‌ছে—বড় বড় মশালের আলোয় চার্‌দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

একটু পরেই মোড়ল এসে উপস্থিত, বল্‌ল—"হুজুর! আজ আপনাকে এখানকার বুনো লোকদের নাচ দেখাব, নিশ্চয় আপনার খুব ভাল লাগ্‌বে।" এই বলেই মোড়ল লোকদের ইঙ্গিত কর্‌ল, তারা আমার সাম্‌নে এসে, গোল হয়ে, নানা রকম অদ্ভুত বিদ্‌ঘুটে বাজনা বাজিয়ে, নাচ্‌তে আরম্ভ করে দিল। যাদের হাতে মশাল ছিল তারাও নাচ্‌তে লাগ্‌ল। লোকদের অনেকে আবার রাক্ষস সেজেছে, কেউ কেউ সেজেছে যমরাজা, কেউ কেউ ভূতপ্রেত—এমন বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

নাচ শেষ হলে, মোড়ল দলকে বিদায় করে দিল, আর তাদের মধ্য থেকে ভীষণ চেহারার দুজন লোক, হাতে হাড়ের বালা পরা, তাদের কাছে ডেকে কাণে ফিস্ ফিস্ করে কি বল্‌ল, আর তখনই তারা অন্ধকারে সরে পড়ল। তারপর মোড়ল আমার কাছে মাটিতে বসে গল্প কর্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ দূরে বন্যজন্তুর ভীষণ ডাক শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম। মোড়লের দিকে চাইতেই সে বল্‌ল—"আমার মনে হয়, দুটো বাঘ খাদ্য নিয়ে লড়াই আরম্ভ করেছে—এটা তাদেরই গর্জ্জন। গর্জ্জন যেন নিকটে আস্‌তে লাগ্‌ল—ক্রমেই আরো পরিষ্কার, আরো ভীষণ। আমি ত লাফিয়ে উঠ্‌লাম ঘরে ঢুক্‌ব বলে। এমন সময় চেয়ে দেখি, বাংলোর সাম্‌নেই একটা খোলা জায়গায় দুটো বাঘে ভয়ানক কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি আরম্ভ করেছে। ব্যাপার দেখে আমি ঘরে রিভলভার আন্‌তে যাব, এমন সময় মোড়ল বল্‌ল—"পিস্তল এনে কি হবে, ভয়ের কোন কারণ নাই।" ততক্ষণে চেয়ে দেখি, বাঘ দুটো অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে; তারপর রাগে গড় গড় কর্‌তে কর্‌তে, দুটো দুদিকে চলে গেল।

মিনিট দশেক বাদে সেই ভীষণ বুনো লোক দুটি ফিরে এসে উপস্থিত। মোড়ল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"হুজুর! এরা দুজনই সেই দুটো বাঘ। মন্ত্রবলে

বাঘ হয়ে আপনাকে তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তন্ত্রমন্ত্রের রহস্য যারা জানে এবং যাদের কাছে মায়া বিদ্যার শিকড় আছে, তারা সেই শিকড়ের গুণে ইচ্ছামত যা কিছুর রূপ ধর্‌তে পারে। ঐ দুজন লোকের হাতে দুটো হাড়ের বালা দেখেছিলেন ত? ঐ বালার ভিতরে যাদুবিদ্যার শিকড় রয়েছে।"

ঐ লোক দুটো পরে আবার মহিষ, ভাল্লুক, বাঁদর প্রভৃতির রূপ ধ'রে আমার সাম্‌নে এসেছিল। আমি অবশ্যি এসব যাদু টাদু বিশ্বাস করি নাই। লোক দুটির হয়ত বশীকরণ বিদ্যা খুব ভাল রকম জানা ছিল, এবং সেই বিদ্যার বলে আমাকে এমনি বশ করেছিল, যে, তারা যখন মনে মনে ইচ্ছা করেছিল—আমি যেন তাদের বাঘের মতন দেখি, তখন আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত হ'য়ে তাদের সেই রকমই দেখেছিলাম।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বন্য-জন্তুর ছবি তোলা

বন্দুক দিয়ে শিকার তো অনেকেই ক'রে থাকেন। আজকাল যে সব বন্দুক বেরিয়েছে তার সাহায্যে বহুদূর থেকে গুলি ক'রেও বন্য-জন্তুকে—এমন কি প্রকাণ্ড হাতী এবং বাঘকেও অনায়াসে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু বন্য-জন্তুর ছবি তোলা এর থেকে অনেক শক্ত রকমের শিকার; তার জন্য অনেক সময় প্রাণটি হাতে ক'রে চল্‌তে হয়। ক্যামেরা হাতে ক'রে জঙ্গলের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুকিয়ে ব'সে থাক্‌তে হয়—কখন জন্তু আস্‌বে। কখনও হয় তো ছুটে গিয়ে কোন পাহাড়ের আড়াল থেকে টপ্ ক'রে ছবি তুলে নিতে হয়। কখনও হয় তো সাম্‌নে গিয়ে জন্তুর ছবি তুলেই চোঁ-চা দৌড় দিতে হয়। তা'ছাড়া, কখনও জন্তুতে তাড়া করলে, এক হাতে ক্যামেরা নিয়ে অন্য হাতে দুড়ুম্ ক'রে গুলি ছেড়ে দিতে হয়।



ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।



বুনো জেব্রার পাল। পিছনে যে তিনটি অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যাচ্ছে, তারা অনেকটা ঘোড়া-আর গরুর মাঝামাঝি। দেখ্‌তে মুণ্ডু-ভারি গোছের হ'লেও এরা খুব দৌড়াতে পারে।



বুনো জিরাফের দল। এরা বড় সাবধানে চলে। বেচারাদের শরীরের গড়নটাই বড় অসুবিধার। জঙ্গলের মধ্যে চলাফেরা করা এদের নিরাপদ নয়;—গলা সাম্‌লান মুস্কিল হয়। কোন ঢালু জায়গায় নেমে এরা জল খায় না, মাটিতে ছোট গর্ত্তে জল পেলে মুখ ডুবিয়ে খায়। জিরাফের গলায় আওয়াজ নাই!



ভালুকভায়ার গাছে চড়া।

আগেকার ছবিতে দেখ, একটি সাহেব আর তাঁর স্ত্রী একটা বুনো মহিষ শিকার ক'রে তার উপর ব'সে আছেন। এঁরা গিয়েছিলেন এক পাল মহিষের ছবি তুলতে; কিন্তু, মহিষের পাল দেখতে পেয়ে ভীষণ বেগে তাঁদের তাড়া করল। প্রায় শত খানেক বুনো মহিষে তাড়া করলে পালাবার যে কোন উপায় থাকে না সেটা বলাই বাহুল্য। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তাঁরা পালের সর্দ্দারকে গুলি করলেন। সর্দ্দারকে পড়্‌তে দেখে অন্যেরা কেন জানি থতমত খেয়ে অন্য দিকে পালিয়ে গেল;—সাহেব মেমও প্রাণে বেঁচে গেলেন।



'ওকাপি'র বাচ্চা।

এই জাতীয় জন্তু পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এইটি ছাড়া জীবিত 'ওকাপি'-বাচ্চা আর কখনও ধরা যায়নি। এ বাচ্চাটিকে বহু চেষ্টা ক'রেও বাঁচানো যায়নি।

এঁরা অনেক সুন্দর ছবি তুলে এনেছেন। তার থেকে দুটি ছবি দিলাম (জেব্রা ও জিরাফ)। এ ছাড়া আরও দুটি ছবি দিলাম। 'ওকাপি'র বাচ্চার ছবিটা জঙ্গলে তোলা না হ'লেও, এটা আশ্চর্য্য জন্তুর ছবি বলে দিয়ে দিলাম। এটি ছাড়া একটিও ওকাপির বাচ্চা দেখা যায় নি।

"সন্দেশ"

১

সন্দেশের মিষ্ট স্বাদ গিয়েছে চলিয়া,
"সুকুমার" দুটি হাতে
যে মিষ্টান্ন দিত পাতে,
আজ তাহা হেলা ভ'রে গিয়াছে ফেলিয়া।

২

উপাদেয় "রাজভোগ" সুধারসে ভরা,
মাসে মাসে থালা ভ'রে
পাঠাইত ঘরে ঘরে,
বালবৃদ্ধ বনিতার চিত্ত "মনোহরা"।

৩

এমন সুস্বাদ মিঠে কে দিবে আবার?
ক্ষীর সর ছানা ননী
অকৃত্রিম সুধা খনি,
ভেজাল নাহিক তায় সব নব তার।

৪

কত রকমের ছাঁচে সে "সন্দেশ" গড়া
বিচিত্র নবীন সাজে
আসিত সে গৃহমাঝে,
ভাইবোনে টানাটানি কে লইবে ত্বরা।

৫

দুরন্ত বালকগণ বসি একাসনে,
দাপা দাপি আব্দারে
ভুলে যায় একেবারে,
"সন্দেশ" পাইলে হাতে আনন্দিত মন।

৬

দাদা দিদি ভাই বোন হেঁয়ালীর তরে,
কলরবে পূরি গেহ
অর্থ যদি বোঝে কেহ,
নাচানাচি লাফালাফি উচ্ছ্বাসের ভরে।

৭

সুনিপুণ কারিকরে গড়িবে না আর,
আজি সে মিষ্টান্ন থালি,
পড়িয়া রহিল খালি,
স্বজন বান্ধবগণে দিতে উপহার।

৮

অশ্রুজলে ভাসাইয়া সন্দেশ মিঠাই;
চলে গেছে সুরপুরে,
পুনঃ না আসিবে ঘুরে,
অমৃত বিলা'তে গেছে দেবতার ঠাঁই।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

উৎসর্গ

জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত ধীর
হে বিশ্বাসী মুক্ত বীর,
সুমঙ্গল জয়শ্রীর—
মূর্ত্তি প্রতিভার
তুমি সুকুমার।

হে শিশু বৎসল কবি
বিমল হরষ ছবি
গৌরব কিরিটি রবি
প্রীতি উৎসধার
তুমি নাই আর?

লহ অর্ঘ্য ভার
গভীর বিয়োগ ব্যথা
শোক অশ্রুধারে গাঁথা
মুকুতার হার।

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

কাকের জাত

কাকের সঙ্গে আমাদের খুব পরিচয়। ভোর বেলা কাকের ডাকেই এক রকম ঘুম ভাঙ্গে। তারপর সারাদিন তাদের অনেক অত্যাচারও সহ্য কর্‌তে হয়। বাড়ীর পাশে বড় গাছ থাক্‌লে তাতে দু একটা কাকের বাসা প্রায়ই দেখা যায়; যেন কতগুলো ডালপালা হিজিবিজি ক'রে গুঁজে রেখেছে। বাসার বাইরেটা নোংরা হলেও ভিতরটা বেশ গোল আর নরম, যাতে ছানাদের কষ্ট না হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, একটা গাছে অনেক কাক এক সঙ্গে থাকে। দিনের বেলা তারা ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যা হলেই সেই গাছটিতে এসে জড় হয়। সন্ধ্যার সময় দলে দলে কাক আকাশে উড়ে যেতে তোমরা দেখে থাক্‌বে। আমার মনে হচ্ছে ছেলে বেলায় আমরা বল্‌তাম, 'এই কাকগুলো বোধ হয় এক বোর্ডিংএ থাকে'। রোজ বোর্ডিংএর মেয়েদের সঙ্গে খেলা কর্‌তাম, সেই জন্য বোর্ডিংএর কথাই মনে হ'ত।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন রকম কাক দেখা যায়। পাতি কাক, দাঁড় কাক আর জংলি কাক। সাধারণ পাতি কাক খুব কাল নয়, ছেয়ে মত; মাথা ডানা আর ল্যাজ বেশ কাল। দাঁড়কাকের সবটাই কাল। পাতি কাকের চেয়ে দাঁড়-কাক বড়, তার গলার স্বরটাও বেশী কর্কশ। জংলি কাক আরও বড় হয়, প্রায় জঙ্গলেই থাকে।

আমরা কাককে কাল বলেই জানি। কিন্তু ইংলণ্ডে এবং অন্য কোন কোন দেশে শাদা কাকও দেখা যায়। সমস্তটা শাদা না হোক, শরীরের অনেকটাই শাদা। তোমরা "দাঁড়কাক ও ময়ুর পুচ্ছ"র গল্প প'ড়ে থাক্‌বে। দাঁড়কাক বেচারার ময়ূরের সুন্দর রং দেখে, তার মত সুন্দর হবার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই সে নিজের গায়ে ময়ূরের পালক গুঁজেছিল। যখন ময়ূরেরা ঠুক্‌রে তার পালক কেড়ে নিল, আর অন্য দাঁড়কাকেরাও ঘৃণা করে তাকে তাড়িয়ে দিল, তখন তার মনে খুব দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সে যদি জান্‌ত যে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর পাখী যে "স্বর্গের পাখী" তার সে জাত ভাই, তবে হয়ত সে মনে কিছু সান্ত্বনা পেত।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিসিয়া এই সব দেশে এবং আমাদের দেশেও কাক-জাতীয় অনেক রকম পাখী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। "স্বর্গের পাখী"র কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া "জে", "ম্যাগ্‌পাই", "রুক্" এরাও সব কাকের জাত। এদের কারো রং

সুন্দর নীল, কারো ঠোঁট লাল, কারো গায়ে শাদা পালক ; কেউ দলবেঁধে থাকতে ভালবাসে, কেউ একলা থাকতে ভালবাসে। সকলেই প্রায় পোকা মাকড় ইঁদুর, ছোট ছোট পাখী মেরে খায়, রুটি, বিস্কুট, ভাত ডাল যা পায় খায়। কারো কারো আবার এমন বিদ্‌ঘুটে রুচি, তারা মরা জন্তু খেতেই ভালবাসে। কিন্তু এই রকম নোংরা জিনিষ সব খেয়ে ফেলে কাক আমাদের উপকার করে। এগুলি জমা হতে থাকলে ত বিপদের কথাই ছিল। এক রকম কাক আছে, পোষমানালে তারা নাকি বেশ গান করে। এইটাই কাকের পক্ষে সব চেয়ে আশ্চর্য্য মনে হয়। আমাদের দেশেও জঙ্গলে



শাদা-গলা কাক

'ম্যাগ্‌পাই' দেখা যায়। কাক জাতির মধ্যে ইংরাজিতে যাকে 'বাওয়ার বার্ড' (bower bird) বলে, তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বেশ আছে। তারা অনেকেই নুড়ি পাথর, রঙ্গিন পালক, চকচকে হাড় এই সব দিয়ে বাসা সাজায়। সেগুলি পুরাণ হয়ে গেলে, নূতন পাথর, নূতন রংএর পালক খুঁজে নিয়ে আসে।



এই পাখীরা লতাপাতা ঘিরে একটি কুঞ্জের (bower) মত তৈরী করে তাই তাদের ঐ নাম। কোন কোন বাওয়ার বার্ড সেই কুঞ্জটিকে আবার নানা রকম করে ফুল পাতা দিয়ে সাজায়। ফুল শুকিয়ে গেলে, শুকনো ফুল ফেলে দিয়ে নূতন ফুল আনে। এই কুঞ্জে পাখীরা অনেকে মিলে নানা রকম খেলা করে।

কাকের মধ্যে সকলের সেরা কিন্তু হ'ল "স্বর্গের পাখী"। তার নাম শুনলেই বুঝতে পার সে কেমন সুন্দর। স্বর্গের পাখী অনেক রকমের হয়। দু এক রকম

তোমরা আলিপুরের চিড়িয়া খানায় দেখে থাকবে। যদিও জঙ্গলে তারা যেমন সুন্দর থাকে, খাঁচার ভিতরে তেমনটি আর থাকে না। স্বাভাবিক অবস্থায়, জঙ্গলে, স্বর্গের পাখী যখন নেচে বেড়ায়, তখন নাকি তাকে আশ্চর্য্য সুন্দর দেখায়। তাদের গায়ে যে কত রকম রং হয় তা বলাই যায় না। কারো গায়ের রং চকচকে বেগুণী পাটকিলে, কারো ঠোঁটটি নীল, পা গোলাপী, দামী সবুজ পাথরের রংএর ঝুঁটি; দুই পাশ দিয়ে লম্বা লম্বা তারের মত সরু পালক, তার আগায় ময়ূর পাখার চন্দ্রের মত উজ্জ্বল চন্দ্র। কারো ডানার দুই পাশ টকটকে লাল। কারো রং একেবারে সোণালী; সে যখন সূর্য্যের আলোয়



পালক ছড়িয়ে আনন্দে নাচে, তখন তাকে দেখে মনে হয় যেন একটি ছোট সোণার ঝরণা।

শ্রীসুখলতা রাও।

নূতন ধাঁধা

দুই অর্থের কথা

কোনও কোনও কথার দুইটা একেবারে ভিন্ন রকম মানে থাকে। যেমন 'কুল' মানে এক রকম ফলও হয়, বংশও হয়। এই রকম একটি একটি কথার দুইট করিয়া মানে দেওয়া হইল। কথাগুলি বাহির করত ?

১। প্রথম—প্রধান কারণ সেই বিবাহ সভায়।
দ্বিতীয়—দান রূপে লভে নর দেবতা কৃপায়।

২। প্রথম—সে নহিলে সঙ্গীতের স্বাদ নহে মিঠে।
দ্বিতীয়—ভাদ্রে পড়ে পাকা ফল ধরণীর পিঠে।

৩। প্রথম—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, ধরে রূপ তার।
দ্বিতীয়—অন্য রূপ, কোলাহল বেসুর চীৎকার।

৪। প্রথম—নবীন বয়স তার, শিশু যুবা নয়।
দ্বিতীয়—দ্বিতীয় সে প্রথমের মনিবন্ধে রয়।

শ্রীসুখলতা রাও।

আছি জলে, আছি স্থলে,
আছি ফুলে ফলে।
নীলিমায় আছি আর
অনিলে, অনলে॥
জলের মাঝখানে,
পল্লব লতায়।
পলকে পুলকে ফিরি
সলিলের গায়॥
প্রলয় মাঝারে আমি
আসিব আবার।
বলিতে কি পার শিশু
কি নাম আমার॥

শ্রীনীরদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

দুখিয়ার সুখ

তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু বাঁকা পথ তার দুধারে ঝোপ্ জঙ্গল; দূরে দূরে এক একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাড়ী মানে ইঁটের বাড়ী নয়। খড় কিম্বা পাতা দিয়ে ছাওয়া মাটির ঘর, চারটা কি পাঁচটা নিয়ে বাড়ী। একটি আঠার উনিশ বছরের ছেলে, পাতলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে তীর ধনুক নিয়ে সেই বাঁকা পথ ধরে যাচ্ছিল—তার কোমরে একটা হরিণের ছাল জড়ান। অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে দেখে সে একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌ল, পায়ের তালে তালে তার ঝাঁকড়া চুলগুলি দুল্‌তে লাগ্‌ল। তখনও মাঠে লোক চলাচল বন্ধ হয়নি। একজন পথিক তাকে ডেকে বল্‌ল, "ওরে দুখিয়া! আজ কি শিকার করেছিস্?" দুখিয়া হাস্‌তে হাস্‌তে মাথা নেড়ে বল্‌ল, "এই দেখ!" বলে বাঁ হাত তুলে দেখাল—এক জোড়া জংলি হাঁস, তাদের গলায় জড়ান একছড়া শঙ্খের মালা। পথিক জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আরে, এ মালা কোথা পেলি?" দুখিয়া, "সর্দ্দার দিয়েছে"। পথিক তার পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বল্‌ল, "বেশ, বেশ, তুই বড় হ'লে তোর বাবার মত ভাল শিকারী হবি।"

বাবার নাম কর্‌তে দুখিয়ার মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল, তার চোখ জলে ভরে এল। অল্প দিন হ'ল তার বাবা তাদের ছেড়ে গেছেন। ছোটবেলা যে জঙ্গলের ধারে তাদের বাড়ী ছিল সেই ছোট্ট বাড়ীখানি, তার আশেপাশের বড় বড় গাছ-পালা; তার নীচের ঘাস কাটা সমান জমি; সেখানে তারা পাঁচ ছয়টি ছেলে মিলে দুপুর রোদের সময় ছাওয়ায় বসে খেলা কর্‌ত, আর সেখানে সন্ধ্যার আগে দলের সব শিকারী তাদের শিকার এনে জমা কর্‌ত—সে সমস্ত যেন এখনও অস্পষ্ট মনে তার মনে হ'ত। মনে হ'ত, তার বাবার শিকারের বোঝা সর্ব্বদাই সকলের চেয়ে বড় হ'ত। মনে হ'ত তার বাবা সেই শিকারের বোঝা নামিয়েই আগে এসে তাকে কোলে নিতেন। তখন তার মুখে হাসি লেগেই থাক্‌ত, তিনি তখন কত আনন্দে সারাদিন খাট্‌তেন। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সব শিকারীর বাড়ীর দরজা বন্ধ হ'য়ে যেত। কেবল যাদের উপর পাহারা দেবার ভার থাক্‌ত, তারা সারা রাত শুক্‌নো কাঠের প্রকাণ্ড বড় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাক্‌ত। তা না হলে যে বাঘে নিয়ে যাবে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাঘের ডাক শুনে, দুখিয়া ভয়ে মাকে জড়িয়ে

ধর্‌ত। হঠাৎ একদিন তার ছোট ভাইটি কোথায় গেল! তারপর তারা সেই বনের ধারের ঘর বাড়ী ছেড়ে আরও দক্ষিণে ফাঁকা যায়গায়, অন্য একদল শিকারীর কাছাকাছি এসে ঘর বাঁধ্‌ল। এই সকল নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে, দুখিয়া ঘরের দরজার কাছে এসে পড়্‌ল। দরজা ফাঁক করে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেখ্‌ল, ঘর অন্ধকার, এক কোণে তার মা একটা হাঁড়িতে ফুঁ দিয়ে আগুন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। দুখিয়া তাড়াতাড়ি মার হাত থেকে হাঁড়িটা নিয়ে বল্‌ল, "দে আমাকে দে, তুই পার্‌বি না।" খানিক ফুঁ দিয়ে আগুন বার করে, কয়েকটা শুক্‌নো ডাল পালায় সেই আগুন ধরিয়ে, দুখিয়া মাকে সেই হাঁস দুটো দিয়ে বল্‌ল, "ভারি খিদে পেয়েছে। ভালকরে রেঁধে দে। আর এই দ্যাখ্ সর্দ্দার কি দিয়েছে; কেমন সুন্দর মালা। জানিস্ মা! আজ আমি গাছের আগ ডালের ছোট্ট একটি বুল্‌বুল্ পাখী বিঁধেছি।" মা বল্‌ল, "শিকার যে তোর ধর্ম্ম বাপ, না শিখ্‌লে চল্‌বে কেন?"

ঘরের কোণে খড়ের বিছানা, তার উপর হরিণের আর বাঘের চামড়া পাতা। সেই বিছানায় দুখিয়া লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌ল। মা হাঁস ছাড়িয়ে, একটা লোহার শিকে বিঁধিয়ে আগুনের উপর ঝুলিয়ে রেখে, তার কাছে এসে বসে তার ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কালও শিকারে যাবি?" দুখিয়া—"হাঁ! কাল যে ভারি শিকার। কাল সর্দ্দার বড় জঙ্গলে শিকার কর্‌তে যাবে। আমাকেও নিয়ে যাবে বলেছে"। মা—"তুই ছেলেমানুষ, বড় জঙ্গলে গিয়ে কি করবি?"

দুখিয়া—"হুঁ, ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়? জানিস্, সর্দ্দারের যত শিকারী আছে, তারা কেউ আমার চেয়ে ভাল তীর ছুড়তে পারে না। তাইত জংলা আমাকে এত হিংসা করে। সে বলে আমি নাকি ওদের দলের লোক নই; আমাকে সর্দ্দারের এত সুনজর করা অন্যায়। হাঁ মা, বড় জঙ্গলে নাকি ভালুক থাকে?"

ভালুকের কথা শুনে দুখিয়া দেখ্‌ল, তার মার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

মা—"কেন, কে বলেছে?"

দুখিয়া—"ভালুক শিকার কর্‌তেই ত আমরা কাল যাচ্ছি। বিকাল বেলা গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকব। রাত্রে শিকার হবে।"

মা—"না, না, তুই যাবিনা; যেতে পাবি না।"

দুখিয়া—কেন মা? ভেবে দ্যাখ্, যদি একটা ভালুক মার্‌তে পারি, তোর ছেলের কত নাম হবে।"

মা—"না রে বাপ্, নাম করে কাজ নাই। তোকে আমি কিছুতেই ভালুকের মুখে দিতে পার্‌ব না।"

দুখিয়া—"কি যে পাগলের মত বকিস্ মা। ভালুকের মুখে কেন পড়্‌তে যাব? আমরা কুড়ি পঁচিশ জন লোক আছি, সঙ্গে তীর ধনুক বল্লম সব থাক্‌বে। ভয় কিসের?"

মা—"ভয় কিসের তা যদি জান্‌তি, তবে আর ও কথা বল্‌তি না। ভালুক থেকেই যে আমাদের সর্ব্বনাশ! ঐ বড় বন পার হয়ে এক নদী আছে, সেই নদীর ওপারে আর এক আরও বড় বন। তুই যখন ছোট ছিলি, তখন আমরা সেই নদীর ধারে থাক্‌তাম, জানিস্ ত?"

দুখিয়া—"একটু একটু মনে আছে।"

মা—"সেখান থেকে কেন চলে এলাম তা তোকে এতদিন বলিনি। আজ বলি শোন্।" দুখিয়ার মা বল্‌তে লাগ্‌লেন—"নদীর ধারে যখন ছিলাম, তখন আমাদের কোন্ অভাব ছিল না। শিকারের মাংসে পেট ভর্‌ত, তার চাম্‌ড়ায় কাপড় হ'ত, ঘর হ'ত, দড়ি হ'ত, আর বিক্রী করে কড়ি হ'ত। বনে কত রকম ফল, পেড়ে খেলেই হ'ল। বেশ সুখে আছি আমরা, তোকে আর তোর ছোট ভাইটিকে নিয়ে। সকালে সবাই শিকারে চলে যায়, সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরে। আমরা ঘর দেখি, রান্না করি, চাম্‌ড়া শুকিয়ে জামা তৈরী করি, কোন কোন দিন দুপুরবেলা তিন চার জনে মিলে ছেলে পিলে নিয়ে বনে মহুয়া কুড়াতে যাই, সঙ্গে বড় ছেলেরাও দুএকজন থাকে; ঘরের কাছেও বড় বড় মহুয়া আর জাম গাছ ছিল। ভালুক মহুয়া খেতে ভালবাসে। রাত্রিবেলা বাইরে আগুন জ্বেলে রাখা হয় আর পাহারা দিতে হয়।

সেদিন হ'ল কি, হঠাৎ বিকালে ভয়ানক ঝড় উঠ্‌ল। শিকারীর দল যারা বনে গিয়েছিল, তারা ঘরে ফির্‌তে পার্‌ল না। কোথায় গাছের উপর রাত কাটাবে, কি বিপদ হবে, ঝড়েতে কত কষ্ট হবে এই ভেবে ঘরে যারা আছে তারা অস্থির হচ্ছে। আমি একলা আছি তোদের দুজনকে দুইপাশে শুইয়ে নিয়ে। ভয়ে ভাবনায় ঘুম আস্‌ছে না। ভারি অন্ধকার রাত, তাতে ঝড় উঠেছে। এক একবার এমন বাতাস দিচ্ছে যে, চালের চাম্‌ড়া ফাঁক হ'য়ে যাচ্ছে। বাইরে ছেলেরা আগুন রাখ্‌তে পার্‌ছে না। সারারাত জেগে জেগে ভোরের দিকে সবে একটু চোখ লেগে এসেছে, এমন সময় ঝুপ্ করে একটা শব্দ হ'তে লাফিয়ে উঠে বস্‌লাম; দেখি দরজাটা পড়ে

গেছে। দুই পাশে হাত্‌ড়ালাম, দেখ্‌লাম এক পাশ খালি। একটা মস্ত বড় কাল ভালুক ছুটে পালিয়ে গেল।"

পরদিন সকালে উঠে দুখিয়া আবার শিকারে যাবার জন্য জেদ কর্‌তে লাগ্‌ল। তার মা বল্‌ল, "নেহাৎ যদি যাবি ত চল্, আমি তোর সর্দ্দারকে বলে কয়ে আসি।"

তাদের বাড়ী থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সর্দ্দারের বাড়ী। খুব উঁচু আর বড় বড় মাটির ঘর, আট দশটা ঘর নিয়ে একটা মহল, এই রকম চার মহল বাড়ী। বাইরের মহলে কেবল বাইরের কাজ হয়, বিচার ঘর, খেলা ঘর, শিকার রাখ্‌বার ঘর, অস্ত্রশস্ত্রের ঘর। পরের মহলে সর্দ্দারের লোকজন থাকে, জিনিষ পত্র সম্পত্তি যা আছে থাকে। তার ভাণ্ডারে, হাতীর দাঁত, হরিণের শিং, মহিষের শিং, বাঘের নখ, চাম্‌ড়া একেবারে বোঝাই। ভাল ভাল কাঠ, মশলা, শঙ্খ, মুক্তা এ সবও আছে। তার পরের মহলে সর্দ্দার নিজে থাকে। পিছনের মহলে চাকর বাকর থাকে।

দুখিয়ার মা দুখিয়াকে নিয়ে সর্দ্দারের বাড়ী গেল। তখন জঙ্গলে যাবার আয়োজন হচ্ছে। কেউ ধনুকের ছিলা মজবুত করে বাঁধ্‌ছে, কেউ তূণের মধ্যে তীর ভর্‌ছে, কেউ বা বল্লমের মুখে ধার দিচ্ছে। দুখিরামকে দেখে সর্দ্দার হেসে বল্‌ল, "কি রে, তোর মা বুঝি যেতে দিচ্ছে না?" তার মা এগিয়ে এসে বল্‌ল, "ও ত যাবার জন্য জিদ কর্‌ছে। তুমি যদি ওর ভার নাও ত আমি ছেড়ে দিতে পারি।" সর্দ্দার—"আচ্ছা, আমি তোর ছেলের ভার নেব কিন্তু তুই যে যাবি দুখিয়া, আমরা কবে ফির্‌ব তার কিন্তু ঠিক নাই। তোর ডর লাগ্‌বে না ত?" এই কথা শুনে জংলা উৎসাহ ক'রে বলে উঠ্‌ল, "এ ত আর বাড়ীর গাছের পাখী মারা নয়, এ সব ভালুকের সাথে লড়াই। ভালুক দেখে কাঁদ্‌বি না ত?"

জংলা হ'ল সর্দ্দারের ভাইয়ের ছেলে। দুখিয়া সব বিষয়েই তার চেয়ে ওস্তাদ, তাই তার ভারি হিংসা। তার কথায় দুখিয়া রেগে বল্‌ল, "কাঁদ্‌ব কেন রে? আমি কি খোকা?"

সর্দ্দার—"বেশ, বেশ। দেখ্‌ব জঙ্গলে গিয়ে কেমন তীর ছুড়্‌তে পারিস্। যা, তবে ঠিক হয়ে নে"।

মাকে বিদায় ক'রে, দুখিয়া মহা উৎসাহে তীর ধনুক ঠিক কর্‌তে লেগে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুখলতা রাও।

সন্দেশ

'সন্দেশ', 'সন্দেশ' আনে কত রসে ভরা,
সাদা সে ছানার মত মিলিত শর্করা,
বারো মাসে তেরো পর্ব্ব জানে সে রাখিতে
হেয়ালিতে প্রাণ ভরা পুলক আঁকিতে।
পৌষ পার্ব্বণের পিঠা দেয় মিঠা করি,
পুলি রসে হাবু ডুবু চলেছে সন্তরি,
ফুল দোলে দেয় রথ চিনি দিয়ে গড়া,
রথে এলাচের দানা মুকুতার ছড়া।
রাঙা রেশমের রাখী বাঁধি দিয়া হাতে,
অমৃতি সমুখে ধরে ভরিয়া পরাতে!
রাসে রসমুণ্ডি দেয়, মুণ্ডু ভ'রে রসে,
মাথায় গজায় গান জাগিয়া হরষে;
চৈত্র যায় পত্র শেষে অন্নপূর্ণা পূজা—
চড়কে সন্ন্যাস কেন, শক্ত নয় বুঝা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

এগ্‌বার্টের লাঞ্ছনা

(পিয়ার্সন্‌স্ ম্যাগেজিন হইতে)

পূর্ব্ববারে বলেছি:—

সেণ্ডারষ্টন্ ষ্টেশনে নেমে এড্‌ওয়ার্ড চলেছে। এগ্‌বার্ট আগে আগে, তার পিছনে তার পায়ে বাঁধা চামড়ার পেটিটি ধরে এড্‌ওয়ার্ড। রাস্তায় গিয়ে পড়্‌তেই হঠাৎ ক্যাথেলিন্ এসে উপস্থিত। এড্‌ওয়ার্ডকে দেখেই—"টেডি! (এড্‌ওয়ার্ডের ডাকনাম) কি সর্ব্বনাশ! তুমি এ কি কর্‌ছ?" বলে ক্যাথেলিন্ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই, পাছে তিনি তাকে চিনে ফেলেন সেই ভয়ে, এগ্‌বার্ট উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্ দিল। এড্‌ওয়ার্ড খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে এগ্‌বার্ট ছুটে গিয়ে একেবারে এড্‌ওয়ার্ডের বাড়ীতে উপস্থিত! আর একজন তাদের গ্যারেজে (মটর থাক্‌বার ঘরে) চুপ্‌টি করে বসে রয়েছে। এড্‌ওয়ার্ডের বাবার অতি যত্নের মটরক্ষেতটি মাড়িয়ে আর কিছু রাখেনি, তাই তিনি রেগে,

হাতিমারা প্রকাণ্ড বন্দুকটি নিয়ে চলেছেন, গণ্ডারের দফা রফা কর্‌বেন বলে। ঠিক এই সময়ে এড্‌ওয়ার্ড হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। বাবাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে—"আমার এক বন্ধুর পোষা গণ্ডার, তাঁর বিশেষ অনুরোধে কথা দিয়েছি আমাদের গ্যারেজে রাখ্‌ব"—ইত্যাদি ভীষণ মিথ্যা কথা বলে ঠাণ্ডা কর্‌ল। তারপর সে গ্যারেজে গিয়ে, কতগুলো বিছালি আর এক বাল্‌টি জলের ব্যবস্থা করে দিয়ে, এগ্‌বার্টকে বল্‌ল—"গণ্ডারেরা নিরামিষ খায় বলেই শুনেছি। তা'হলে এখন খেয়ে দেয়ে চুপ্ করে শুয়ে থাক, আর কোন গোল করোনা—গুড্ নাইট্।" এই বলে সে বাড়ীর ভিতর গেল খেতে।

খাবার সময় নানা কথাবার্ত্তার পর এড্‌ওয়ার্ডের মা বল্‌লেন—"বার্টি (এগ্‌বার্টের ডাকনাম) বড় দুষ্টু ছেলে।"

এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"কেন মা?"—"দুষ্টু নয়ত কি? সে তার মাকে বলেছিল, যদি প্যারিসে না যায় তবে রাত্রেই বাড়ী ফিরে আস্‌বে। আর প্যারিসে গেলে টেলিগ্রাম কর্‌বে। কিন্তু টেলিগ্রামও আসেনি আর সেও বাড়ী ফির্‌ল না!"

এড্‌ওয়ার্ড তাড়াতাড়ি বল্‌ল—"সে নিশ্চয় তাহলে প্যারিসেই গিয়েছে। তার মা কি তার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন?"—"ব্যস্ত-টেস্ত বিশেষ হন্‌নি, কিন্তু বার্টিত কখন এমন অবিবেচনার কাজ করে না!"

এড্‌ওয়ার্ড—"বোধ করি তাকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছে, তাই সংবাদ দিতে পারেনি।"

"যাক্, উপস্থিত বিপদ কেটে গেল, অন্ততঃ দুই তিন দিনের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যাবে"—এই ভেবে এড্‌ওয়ার্ড খাওয়ার পর আবার গ্যারেজে গিয়ে এগ্‌বার্টকে সব কথা বল্‌ল। তাতে এগ্‌বার্ট বিশেষ কাণ দিল বলে মনে হলো না। সে যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে বসে ভাব্‌ছে। কিন্তু এদিকে আবার বিছালিগুলিও শেষ করে দিয়েছে। তখন তাকে আরো কিছু বিছালি আর জল দিয়ে এড্‌ওয়ার্ড চলে এল।

এই সব ঘটনা হয়েছিল শনিবার, ১৫ই আগষ্ট। সোমবার দিন এড্‌ওয়ার্ড নিয়ম মত আপিষে গিয়ে কাজ কর্ম্ম কর্‌তে লাগ্‌ল—যেন মোটেই কোন দুর্ঘটনা হয়নি। কিন্তু আপিষের অন্য কর্ম্মচারিদের রকম সকম দেখেই সে বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, তারা সব খবরই রাখে। খানিক বাদে একজন এসে বল্‌ল—"আপনাকে বড় সাহেব ডেকেছেন।"

বড় সাহেব "মিষ্টার ডিকিন্" এড্ওয়ার্ডের আপন মামা—তাঁর প্রকৃতি উগ্র, বেজায় লম্বা চেহারা আর তাঁর মেজাজটি ভারি কড়া। তাঁরই আপিষ, এড্ওয়ার্ড সেখানে কাজ করে—ঘর বাড়ী তৈরি কর্বার কারবার (architectural firm) মামার অহ্বান শুনে এড্ওয়ার্ড ভয়ে ভয়ে তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে ঘা দিয়ে ভিতরে ঢুক্ল। মামা বসে বসে লিখ্ছেন, মুখ তুলে চাইলেনও না—যেন কেউ তাঁর ঘরে ঢুকেইনি। যাহোক্, লেখা টেখা শেষ হলে তিনি তার দিকে চেয়েই বল্লেন—"এই মাত্র তোমার বাবা টেলিফোঁ করেছেন—'তোমার সাধের গণ্ডারটি নাকি গ্যারেজ ট্যারেজ ভেঙ্গে শেষ করে দিল, তুমি শীগ্গির বাড়ী যাও।"

এড্ওয়ার্ডের ত চক্ষু স্থির! না জানি এগ্বার্ট আবার কি কাণ্ড বাধিয়েছে! মামাকে জিজ্ঞাসা কর্ল—"তা হলে আমি যেতে পারি কি?"

মামা—"হাঁ, পার বৈকি। কিন্তু আর ফিরে আস্বার দরকার নাই।"—"কি সর্ব্বনাশ! কেন মামা? আর কোন দিনই কি আস্ব না?"

মামা—"যখন তোমার আবার সুবুদ্ধি হবে, আর গণ্ডারটিকে বিদায় করে দিবে —তখন আবার এসে কাজ কর্তে পার।"

এড্ওয়ার্ড—"মামা! গণ্ডারটা যে বড় মূল্যবান্, এক বন্ধুর অনুরোধে ওটাকে রেখেছি। ওটা পোষা গণ্ডার।"

মামা—"গণ্ডার কখন পোষা হতে পারে না। আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা কর্ছ? জন্তু পুষ্তে হয় ত ক্যানারি পাখী পোষ।"

এড্ওয়ার্ড—"এ গণ্ডার যে মামা ক্যানারির মত নিরীহ, শান্ত শিষ্ট।"

মামা—"বটে! তুমি ত ভারি মিথ্যাবাদী! জান, শনিবার দিন আমিও সেণ্ডার ষ্টন্ ষ্টেশনের পিছনের রাস্তায় ছিলাম—গণ্ডারের কাণ্ড সব দেখেছি। যাক্, তোমাকে এক সপ্তাহ সময় দিলাম, যদি এই সময়ের মধ্যে তোমার এসব পাগ্লামি দূর না হয়, তবে আমার আপিষে আর আস্বার দরকার নাই। এখন শীগ্গির বাড়ী যাও গিয়ে গ্যারেজটি বাঁচাও।"

এড্ওয়ার্ড ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত ছুটে বাড়ী এল। দূর থেকেই শুন্তে পেয়েছে, গ্যারেজের দরজায় এগ্বার্টের লাথির দমাদম্ শব্দ। তার মা বাগানের দরজায় অপেক্ষা কর্ছিলেন, তাকে দেখেই কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লেন—"বাবা! শীগ্গির তোমার গণ্ডারের একটা ব্যবস্থা কর। চাকর বাকর ভয়ে জিনিষ পত্র বাঁধ্ছে—

কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। প্রতিবেশীরা বাড়ীতে আস্তে ভরসা পায় না, কিন্তু তাদের 'ফোনের' জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছি। তোমার বাবা ত বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত —গণ্ডারকে নাকি মেরেই ফেল্বেন।"

এড্ওয়ার্ড তখনই ছুটে গ্যারেজের দরজায় গিয়ে, এক চীৎকার—"কি কর্ছ? শীগ্গির থাম।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মুহূর্ত্তে দরজার লাথি থেমে গেল! তখন এড্ওয়ার্ড পিছনের দরজা দিয়ে গ্যারেজে ঢুক্লে পর, এগ্বার্ট তার দিকে চেয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর মনে হলো যেন চোখ্ দিয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা কর্ছে।

এড্ওয়ার্ড একটু রেগে বল্ল—"এগ্বার্ট! এটা আবার কি আরম্ভ করেছ?" উত্তরে এগ্বার্ট দরজা ছেড়ে তখন সিমেণ্ট্ করা মেঝেতে পা দিয়ে ধপাধপ্ ঘা দিতে আরম্ভ করে দিল। যাহোক্, "সর্ব্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা"—এড্ওয়ার্ড তখন হাঁপ ছেড়ে বল্ল—"তবু ভাল। কিন্তু খবরদার! আর কিন্তু দরজায় লাথি মেরো না। আমি এখন গিয়ে বাড়ীর চাকরদের ঠাণ্ডা করে আবার ফিরে আস্ছি। দোহাই দিয়ে বল্ছি, আর গোল করো না, চুপ করে থাক। আমার বাবা কিন্তু বন্দুক নিয়ে এসে আছেন, কখন এসে তোমাকে গুলি কর্বেন তার ঠিক নাই।"

এর পর এগ্বার্টের টুঁ শব্দটি নাই—একেবারে চুপ্-চাপ্। এড্ওয়ার্ডও নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ীতে গেল। গিয়ে চাকরদের কত মিনতি কর্ল কিন্তু কোন কাজ হলোনা —সকলে একবাক্যে বল্ল, যে, গণ্ডার না বিদায় করে দিলে, এক মুহূর্ত্ত কেউ এ বাড়ীতে থাক্বে না।

এড্ওয়ার্ড ভারি দুঃখিত হয়ে গ্যারেজে ফিরে গেল। এগ্বার্ট এক কোণে চুপ্ করে বিছালির উপর শুয়ে ছিল। এড্ওয়ার্ডকে দেখেই লাফিয়ে উঠে আবার মেঝেতে ধপাধপ্ কর্তে লেগেছে। এড্ওয়ার্ড চুপ্ করে দাঁড়িয়ে ভাব্ছে, কি কর্বে—এমন সময় এগ্বার্ট তার কাছে এসে আস্তে তার পাঁজরে এক গুঁতো মেরেছে। এড্ওয়ার্ড হঠাৎ চম্কে উঠে, রেগে বল্ল—"খবরদার! আবার যদি গুঁতো টুঁতো মার, তবে তোমাকে কিন্তু কারোর কাছে বিক্রী করে ফেল্ব। কেন গুঁতো মার্লে?"

এগ্বার্ট আস্তে আস্তে ঘরের মাঝ্খানে গিয়ে, আবার মেঝেতে ঘা দিতে আরম্ভ কর্ল। তখন এড্ওয়ার্ড স্পষ্ট বুঝ্তে পার্ল, যে, এই ঘা দেওয়ার মধ্যে একটা

অর্থ আছে, এবং সেটাই তাকে এগ্‌বার্ট বুঝাতে চায়। তখন মন দিয়ে শুনে দেখ্‌ল —ঘাগুলি এলোমেলো নয়, আর একটু জটিল হলেও তার মধ্যে বেশ শৃঙ্খলা আছে। এড্‌ওয়ার্ড আরো মন দিয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল। তখন তার মনে ভারি একটা কুতূহল হয়েছে।

এই সময়ে এড্‌ওয়ার্ডর মা এসে, গ্যারেজের দরজার বাইরে থেকে বল্‌লেন—"টেড্! রেলওয়ে থেকে একজন লোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে এখনই দেখা কর্‌তে চান—বড্ড জরুরি দরকার।"

ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে এড্‌ওয়ার্ডের দেরি হলো না, এগ্‌বার্টকে বল্‌ল—"দেখ এগ্‌বার্ট! সত্যি করে বল্‌তে গেলে, এই লোকের সঙ্গে তোমারই দেখা করা উচিত। যাহোক্, খানিক স্থির হয়ে থাক, আমি দেখা করে ফিরে আস্‌ছি।"

লোকটি শুধু রেলের নয়, সব প্যাসেঞ্জারেরও প্রতিনিধি হয়ে এসেছে। সে দিন ষ্টেশনে যে সকল জিনিষ পত্র এগ্‌বার্ট নষ্ট করেছিল, তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এড্‌-ওয়র্ডের কাছ থেকে টাকা নিতে এসেছে। বাধ্য হয়ে এড্‌ওয়ার্ডকে সব চুকিয়ে দিতে হলো। টাকা বড় কম নয়—সবশুদ্ধ মোট আড়াইশ পাউণ্ড।

লোকটি চলে গেলে পর, গ্যারেজে ফিরে এসে এড্‌ওয়ার্ড সব কথা বলে, এগ্‌-বার্টকে বল্‌ল—"দেখ, এই আড়াইশ পাউণ্ড তোমারই দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি ত চেক্ সই কর্‌তে পার্‌বে না, তাই আমিই দিয়েছি। তুমি যখন আবার মানুষ হবে, তখন আমার টাকাটা ফিরিয়ে দিও। আমি গরীব মানুষ, অনেক কষ্টে এই আড়াইশ পাউণ্ড জমিয়েছিলাম।"

ততক্ষণে এগ্‌বার্ট আবার মেঝেতে পা দিয়ে ঘা দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে এড্‌ওয়ার্ড খানিকক্ষণ মন দিয়ে শুনে বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! আমাকে কি সঙ্কেত করে কিছু বল্‌তে চাচ্ছ তুমি?"

এই কথা বল্‌তেই এগ্‌বার্টের আনন্দ দেখে কে! তার চোখ, মুখ এমন কি শিংটা দিয়েও যেন আনন্দ ফুটে বেরোতে লাগ্‌ল। আর মাথা নেড়ে বল্‌ল—"হাঁ।"—"তবে আবার ঘা দিতে থাক।"

এড্‌ওয়ার্ড দেখ্‌ল—প্রথম একটা জোরে ঘা, তারপর ফাঁক, তারপর ছোট্ট একটি ঘা, আবার ফাঁক, তারপর আবার বড় ঘা, আবার পর পর দুটি ছোট্ট ঘা, আবার ফাঁক—ঠিক এই ভাবে ক্রমাগত চলেছে! এড্‌ওয়ার্ড ত ভেবে অস্থির, কিছুই ঠিক

কর্‌তে পার্‌ছে না। হঠাৎ তার মাথায় একটা খেয়াল হলো—"এগ্‌বার্ট না বিনা তারে টেলিগ্রাফ (wireless telegraphy) কর্‌বার একটা কল বসিয়েছিল? পা দিয়ে মেঝেতে সে সেই টেলিগ্রাফের সঙ্কেত কর্‌ছে না ত?" এই খেয়াল হতেই সে বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! একি তুমি টেলিগ্রাফের "মর্স" সঙ্কেত কর্‌ছ?" যেই এই কথা বলা, আর অম্‌নি মনের আনন্দে লাফিয়ে উঠে, এগ্‌বার্ট মাথা নেড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল —"'হাঁ', 'হাঁ', 'হাঁ'।" কিন্তু তা হলে কি হবে, এড্‌ওয়ার্ড "মর্স" সঙ্কেতের বিন্দু বিসর্গও জানে না—বুঝ্‌বে কি করে? বল্‌ল—"তবে একটু সবুর করে থাক, আমি এখনই গিয়ে বাজার থেকে মর্স সঙ্কেতের বই কিনে নিয়ে আস্‌ছি।"

বাজারে গিয়ে এড্‌ওয়ার্ড যে বইএর দোকানে জিজ্ঞাসা করে, সেখানেই বলে—"এ রকম বইএর নামও শুনিনি। আর থাক্‌লেও তোমাকে দিতাম না—তুমিই না বাপু সেই গণ্ডারওয়ালা?"

এড্‌ওয়ার্ড ভারি বিরক্ত হয়ে, শেষে একটা দোকানে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌ল—মর্স কোড্ (টেলিগ্রাফের সঙ্কেতের বই) আছে?" দোকানি বল্‌ল—"ছিল, বিক্রী হয়ে গিয়েছে।" ঠিক এই সময়ে এড্‌ওয়ার্ডের পিছন থেকে কে বলে উঠ্‌ল—"বা-রে, তুমি আবার "মর্স কোড্" চাচ্ছ কেন?" এড্‌ওয়ার্ড পিছন ফিরে দেখে ক্যাথেলিন্! এখন ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল—"এই যে, তুমি কখন এলে? হাঁ, আমি মর্স কোড্ খুঁজ্‌ছি—ভয়ানক দরকার, একখানা বই চাইই চাই।"

ক্যাথেলিন্—"তবে চল আমার বাড়ীতে, আমার কাছে একখানা "মর্সকোড্" আছে।" এড্‌ওয়ার্ড ত অবাক্!—"তোমার কাছে আছে? তুমি মর্স দিয়ে কি কর?"

ক্যাথেলিন্—"অবাক্ হচ্ছ কেন—বার্টি আমাকে বিনা তারের সংবাদ পাঠান শেখাচ্ছিল; সে-ই একখানা "মর্সকোড্" কিনে আমাকে দিয়েছিল—সঙ্কেতগুলি শেখ্‌বার জন্য।"

ক্যাথেলিনের বাড়ীতে গেলে, তিনি মর্সখানি বা'র করে দিলেন। দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"টেড্! বার্টি কোথা গেল বল্‌তে পার কি? তোমার কি মনে হয়।" এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"বোধ করি সে প্যারিসে গিয়েছে।"

ক্যাথেলিন্—"হাঁ, তার মাও তাই মনে করেন বটে, কিন্তু এগ্‌বার্ট আমাকে যে চিঠিখানি লিখেছিল, সে কথা ত আর তিনি জানেন না! শুক্রবার সকালে এগ্‌বার্ট আমাকে লিখেছিল, ষ্টেশনে গিয়ে তাকে আন্‌তে। তুমি যে ট্রেইনে এলে, সেই ট্রেইনে

সেও আস্‌বে। আমিও তাই ষ্টেশনে গিয়েছিলাম, আর পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল —তুমি তোমার গণ্ডার নিয়ে যাচ্ছ। এগ্‌বার্টের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কি?"

এড্‌ওয়ার্ড অনেক চেষ্টা করে উত্তর দিল—না। তখন ক্যাথেলিন্ বল্‌লেন—"যাক্, আর ভেবে কি হবে—আশা করি কাল পরশু এগ্‌বার্টের চিঠি পাব।"

এড্‌ওয়ার্ড মর্সকোড্ নিয়ে গিয়ে দেখে, এগ্‌বার্ট গ্যারেজের মধ্যে পাইচারি করে বেড়াচ্ছে। বইখানি তাকে দেখিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"আর ভাবনা নেই এখন তোমার সঙ্কেত বুঝ্‌তে পার্‌ব। কিন্তু একটা কথা বলে রাখ্‌ছি—ক্যাথেলিন্‌কে সব কথা না বল্‌লে আর চল্‌ছে না। আমি তাকে ডেকে এনে বল্‌ব, আর তুমি মর্সের সাহায্যে আমার কথা সমর্থন কর্‌বে।"

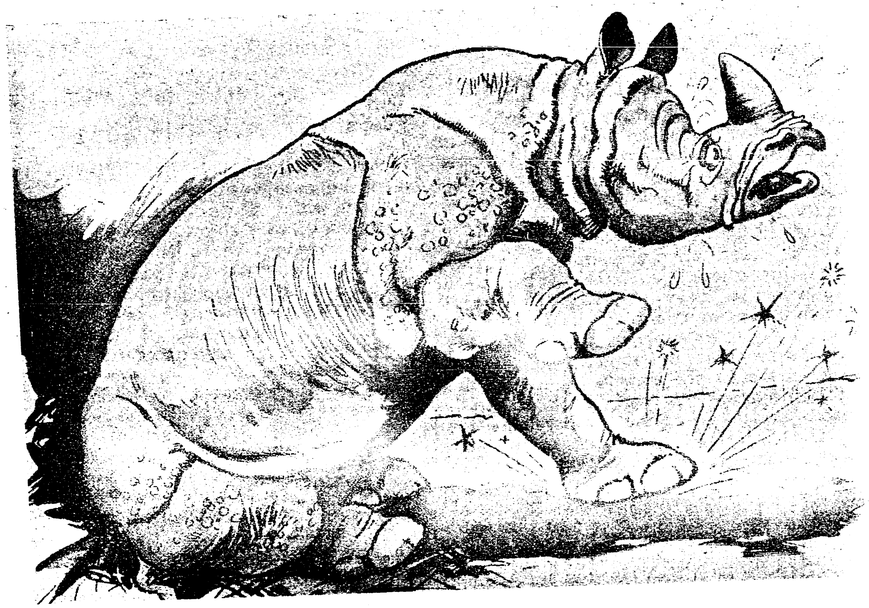

একথা শুনেই এগ্‌বার্ট বিদ্যুদ্বেগে এক লাফ! তারপর ভীষণ মাথা নেড়ে বল্‌ল—"না।" এড্‌ওয়ার্ড অনেক বুঝিয়ে বল্‌ল—"ক্যাথেলিন্‌কে সব কথা বল্‌তেই

হবে। তুমি যে তাকে চিঠি লিখেছিলে, ষ্টেশনে যেতে—মনে আছে ত? কাজেই সে তোমার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছে। এখন এই চিঠির কথা যখন সে তোমার মাকে বল্‌বে, তখনই ত পুলিষের একটা হাঙ্গামা লেগে যাবে। সুতরাং ক্যাথেলিন্‌কে এখনই ডেকে সব কথা বলা চাই।"

এই সময়ে এগ্‌বার্ট আবার মেঝেতে তার মর্স্ সঙ্কেত আরম্ভ করে দিয়েছে। এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"আমি মর্স্‌কোডের বিন্দু বিসর্গও জানি না; তুমি খুব ধীরে ধীরে আঘাতগুলি না দিলে আমি বই দেখেও কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ব না।" এগ্‌বার্ট তখন খুব আস্তে আস্তে ঘাগুলি দিতে লাগ্‌ল! তাতেও কি এড্‌ওয়ার্ড সহজে ধর্‌তে পারে? যাহোক্, অনেক ভুল টুল করে, শেষে সঙ্কেতের অর্থ দাঁড়াল গিয়ে —"আমি যদি বলি তবে যেন জাহান্নমে যাই।" এড্‌ওয়ার্ড তবু নানা রকমে বুঝাতে লাগ্‌ল। অনেক চেষ্টার পর এগ্‌বার্ট রাজি হলো বটে কিন্তু কথা রইল, যে, ক্যাথেলিন্ ছাড়া আর কাউকে বলা হবে না। এই সব হাঙ্গামায় রাত হয়ে গিয়েছিল, ক্যাথেলিন্‌কে ডাক্‌বার সময় ছিল না। এড্‌ওয়ার্ড তখন এগ্‌বার্টের খাবার দাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে, নিজেও খেতে গেল।



খাওয়া শেষ হলে পর, এড্‌ওয়ার্ডের বাবা, তাকে বস্‌বার ঘরে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—"এড্‌ওয়ার্ড! তুমি কি তাহলে গণ্ডারটাকে রাখ্‌বে বলেই স্থির করেছ?"

এড্‌ওয়ার্ড—"হাঁ বাবা, ওটাকে আমায় রাখ্‌তেই হবে।"—আমি যদি রাজি না হই।"—"তাহলে গণ্ডারের সঙ্গে আমাকেও বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সত্যি বল্‌ছি বাবা! গণ্ডারটাকে বাড়ীতে রাখ্‌তে আমার একটুও ইচ্ছা নাই। কিন্তু ব্যাপার এ রকম দাঁড়িয়েছে, যে, ওটাকে রাখ্‌তেই হবে, এবং তার কারণটাও তোমাকে বল্‌তে পার্‌ব না।"

বাবা—"এড্‌ওয়ার্ড! তুমি যা বল্‌ছ, মেনে নিলাম সব সত্যি, কিন্তু তাতে ত আর কোন মীমাংসা হলো না। তুমি যখন কারণটাও আমাকে বল্‌তে পার না তখন দেখ্‌ছি, আমাকেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হবে। কাল সকালে তোমার মাকে নিয়ে আমি কিছু দিনের জন্য ইষ্টবোর্ণে বেড়াতে যাব। তুমি তার মধ্যে গণ্ডারের একটা ব্যবস্থা করে ফেল। দেখো যেন বেশী দিন বাড়ী ছেড়ে আমাদের না থাক্‌তে হয়।"

এই ব্যবস্থায় এড্‌ওয়ার্ডের প্রাণে আঘাত লাগ্‌ল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে একটু সোয়াস্তিও পেল—অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌বে।

পরদিন সকালে মা বাবা চলে গেলেন। এড্‌ওয়ার্ড তখনি ক্যাথেলিন্‌কে ফোন্ কর্‌ল—"ক্যাথেলিন্! শীগ্‌গির আমাদের বাড়ী এস—এগ্‌বার্টের সন্ধান পেয়েছি; ফোনে সব কথা বল্‌তে পার্‌ব না।" খানিক পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যাথেলিন্ এসে উপস্থিত! এড্‌ওয়ার্ডকে দেখেই বল্‌ল—"টেড্! ব্যাপার কি শীগ্‌গির বল।" এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট এখানে এসেছে। আমাদের গ্যারেজে আছে—তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্ছে।"



একথা শুনেই ক্যাথেলিন্ ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্যারেজের দিকে ছুট্‌ল, এড্‌ওয়ার্ডও গেল পিছনে পিছনে। গ্যারেজের

দরজা খুলেই ক্যাথেলিন্ ডাক্‌তে লাগ্‌ল—"বার্টি! বার্টি! কোথায় তুমি?" তার গলার স্বর শুনে এগ্‌বার্টও লাফাতে লাফাতে তার দিকে ছুটে এসেছে। গণ্ডার দেখেই ক্যাথেলিন্ ভীষণ এক চীৎকার দিয়ে দরজার দিকে ছুটেছে। কিন্তু পালাবে কি করে? এড্‌ওয়ার্ড দরজা আগ্‌লিয়ে দাঁড়াল। তারপর আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বল্‌ল ক্যাথেলিন্‌কে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যারেজের মেঝেতে এগ্‌বার্টেরও মর্স সঙ্কেত আরম্ভ হলো। সে সঙ্কেতের অর্থ বুঝ্‌তে ক্যাথেলিনের বেশী মুস্কিল হলোনা। কারণ সে মর্সকোড্ অনেকটা শিখেছিল। সঙ্কেতের অর্থ হলো—"ক্যাথেলিন্! আমি সত্যি সত্যি এগ্‌বার্ট—যাদুকর আমাকে গণ্ডার বানিয়ে দিয়েছে।" তখন ক্যাথেলিনের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। মনের দুঃখে সে এগ্‌বার্টের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বল্‌ল—"হায় বেচারি এগ্‌বার্ট! কেন ভগবান্ তোমার এমন দুর্দ্দশা কর্‌লেন? কবে তুমি আবার মানুষ হবে?"

খানিক পরে একটু স্থির হয়ে, ক্যাথেলিন্ বল্‌ল—"আমি এখনি বার্টির মায়ের কাছে যাচ্ছি। তাঁকে গিয়ে বল্‌ব—প্যারিস্ থেকে বার্টি আমাকে চিঠি লিখেছে, সে সেখানে দিন পনর কুড়ি থাক্‌বে। ভয়ানক কাজে ব্যস্ত, তাই চিঠি লিখ্‌তে সময় পায় না। তারপর যেমন করে হোক্, সেই ম্যাজিসিয়ান্‌কে খুঁজে বার কর্‌তে হবে।"



ম্যাজিসিয়ান্‌কে খুঁজে বার কর্‌তে হবে বলাটা সহজ কিন্তু কার্য্যতঃ কঠিন। যাহোক্, ম্যাজিসিয়ান্ এখন যেখানেই থাকুক, হয়ত এগ্‌বার্টকে শাপ দিয়ে তার মনে খুব অনুতাপ হয়েছে, এবং এখন সহজেই সে শাপের প্রতিকার কর্‌তে রাজি হবে। এই সব ভেবে এড্‌ওয়ার্ড আর ক্যাথেলিন্ পরামর্শ করে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিল—"গত ১৫ই আগষ্ট শনিবার, যে ভদ্রলোকটি

যাদুবলে অতি অদ্ভুত আকার পরিবর্ত্তন করেছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করে ২৫৬ন বিজ্ঞাপনদাতার নিকট চিঠি লিখ্‌বেন।" এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়ে এড্‌ওয়ার্ড ও ক্যাথেলিন্ অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। তাদের মনে আরো আশা ছিল, যে——

(ক) ক্রমে একটু একটু করে হয় ত এগ্‌বার্টের শাপ আপনি দূর হতে পারে।

(খ) কিংবা দৈবাৎ ম্যাজিসিয়ানের সঙ্গে যদি দেখাই হয়ে যায়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল—কোথায় বা যাদুকর আ কোথায় বা তার উত্তর! এড্‌ওয়ার্ডের মামা সাত দিনের যে সময় দিয়েছিলেন, ত পার হয়ে যাওয়ায় বেচারির কাজটি গেল। হাতে টাকা কড়িও বিশেষ কিছু নাই– মা বাবাও বাড়ী ফির্‌লেন না। বেচারি এড্‌ওয়ার্ডের মনে দারুণ দুর্ভাবনা।

এড্‌ওয়ার্ড দেখ্‌ল, কিছু দিন থেকে যেন এগ্‌বার্ট ভারি বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে তার মনে যেন কিসের ভাবনা। ব্যাপার কি? ব্যাপার এগ্‌বার্ট নিজেই বলে দিল একদিন সকাল বেলা গ্যারেজে যেতেই, এগ্‌বার্ট আবার কি জানি সঙ্কেত কর্‌ আরম্ভ করে দিল। এড্‌ওয়ার্ড খাতা পেন্‌সিল আর মর্সকোড্ এনে বিষয়টা বা কর্‌ল—"এগ্‌বার্ট একসারসাইজ কর্‌তে চায়।" এড্‌ওয়ার্ড জান্‌ত, যে, দি একবার করে বেড়ান এগ্‌বার্টের চির কালের অভ্যাস—সুতরাং এখনও তার ম একসারসাইজের ইচ্ছাটা থাকা আশ্চর্য্য নয়। আর সেটা দরকারও বটে। কি কি করে কর্‌বে? কোথায় কর্‌বে? আর কখন করবে? দিনের বেলা তাকে নি পথে বা'র হওয়া অসম্ভব। তবে এক কাজ করা যেতে পারে—বেশী রাত্রে চুপি চু তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আস্‌লে হয়। সহরটা ছোটখাট, প্রায় পল্লীগ্রামেরই ম বেশী রাত্রে রাস্তায় লোকজন কমই থাকে। এই সব ভেবে এড্‌ওয়ার্ড এগ্‌বার্টে সঙ্গে স্থির কর্‌ল, যে, সেই রাত্রেই সে তাকে নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে আন্‌বে।

রাত্রে এড্‌ওয়ার্ড এগ্‌বার্টকে নিয়ে বেড়াতে গেল। অন্ধকার রাত, চারিদিক কা মিশ্‌মিশে। সঙ্গে একটা ইলেক্‌ট্রিক্ ল্যাম্প নিল, যদি পথে কোন দুর্ঘটনা হয় এগ্‌বার্টের গলায় মোটা দড়ি বেঁধে, সেই দড়ি ধরে এড্‌ওয়ার্ড পিছনে পিছ চলেছে। ক্রমে তারা সহর পার হয়ে গ্রামের ধারে গিয়ে উপস্থিত। তখন একটা সরু গলি, তার দুই ধারে ঝোঁপ ঝাপ, সেই গলি দিয়ে তারা যাচ্ছিল। এখানে এসেই হঠাৎ এগ্‌বার্ট চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, আর দড়ির টান মানে না; একটু তাড়াতাড়ি চলেছে। গণ্ডারের পক্ষে সেটা একটু তাড়াতাড়ি বটে কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের পক্ষে

সেটা হলো—ঘণ্টায় প্রায় দশ বার মাইল। দড়ির টানে সে যেন প্রায় উড়েই চলেছে! প্রাণ যায় যায়!

তখন এড্‌ওয়ার্ড এগ্‌বার্টকে বল্‌ল—"থাম। এত তাড়াতাড়ি চল যদি, তবে আমি হেঁটে পার্‌ব না, তোমার পিঠে চড়ে নিচ্ছি—দাঁড়াও।" এগ্‌বার্ট দাঁড়াল। এড্‌ওয়ার্ড দড়িটা তার গলায় লাগামের কায়দায় খুব মজবুত করে বেঁধে, তার পিঠে চড়ে বস্‌লে পর, এগ্‌বার্ট আবার চল্‌ল। এবার তার গতি আরো দ্রুত। প্রথম হ্যাঁচ্‌কা টানেই এড্‌ওয়ার্ড একেবারে রাস্তার পাশের খানায়। খানা থেকে উঠে এসে, খুব মজবুত হয়ে আবার বস্‌ল বটে কিন্তু এক একবার লাগামের হ্যাঁচ্‌কা টানে সে এগ্‌বার্টের পিঠ থেকে শূন্যে উঠে পড়ে! ক্রমে এগ্‌বার্ট ফিরে বাড়ীর দিকে চলেছে। খানিক দূর গিয়ে একটা মোড় ঘুর্‌তেই, সাম্‌নে প্রায়

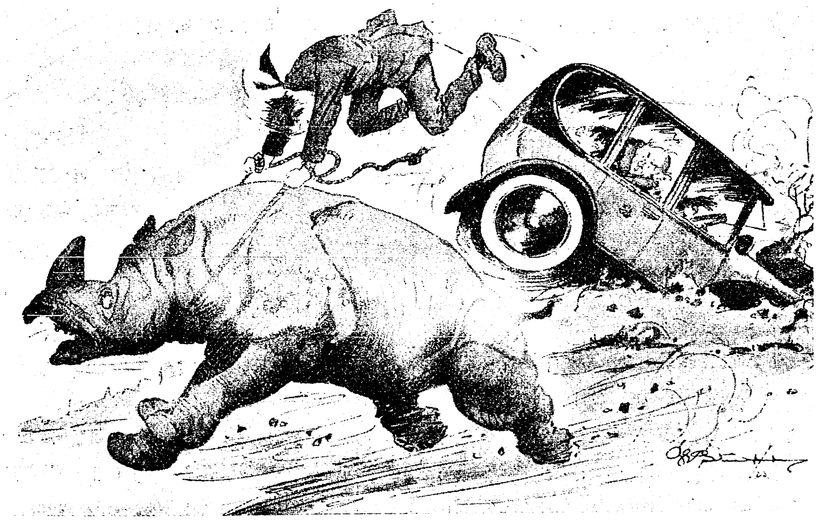

গাড়ীর জানালা দিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকটি কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছেন।

পঞ্চাশ গজ দূরে, দেখা গেল, একটা মস্ত বড় মটরগাড়ী তাদের দিকে আস্‌ছে। সফেয়ার (মটরচালক) বোধ করি ইতিপূর্ব্বে কাউকে রাত্রে গণ্ডারের পিঠে চড়ে

যেতে দেখেনি। তাই, গাড়ীর উজ্জ্বল আলোতে সোয়ার-পিঠে একটা গণ্ডারকে ছুটে আস্‌তে দেখে, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে, সফেয়ার মটর চালাবার চাকাটি দিয়েছে ছেড়ে। মটর গাড়ীখানাও সেই মুহূর্ত্তে একেবারে রাস্তার বাঁ পাশের খানার মধ্যে! শুধু পিছনের চাকা দুটো শূন্যে বন্ বন্ করে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। ব্যাপার দেখে এগ্‌বার্ট মুহূর্ত্তের জন্য দারুণ ভয়ে থেমেছিল, তার পরেই আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্!

ঠিক এই সময়ে এড্‌ওয়ার্ড দেখ্‌ল, যে, গাড়ীর জানালা দিয়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোক তাদের দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছেন। দেখেই ত এড্‌ওয়ার্ডের চক্ষুস্থির! চিন্‌তে পার্‌ল—ভদ্রলোকটি মিডিল্‌সায়ারের ডিউক স্বয়ং, তিনি সেণ্ডারষ্টন প্রাসাদের মালিক এবং সমস্তটি জেলার জমিদার। তাঁর সঙ্গে এড্‌ওয়ার্ডের পরিচয় ছিল, তার মামার আপিষে তিনি অনেকবার গিয়েছেন। আর ডিউকের চোখ দেখে মনে হলো, যেন, তিনিও তাকে চিন্‌তে পেরেছেন!!

এগ্‌বার্টের কথা আগামী বারে আরো কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

উৎসবের রাজা

"খৃষ্ট-মাস্" বা যীশুখৃষ্টের জন্মদিন (২৫শে ডিসেম্বর) খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। এ সময়ে খৃষ্টানেরা খুব ধূমধাম করে উৎসব করেন—আমাদের দেশে লোকে তাকে বলে "বড়দিন"। বিলাতে সে সময়ে দারুণ শীত—চারিদিক বরফে ঢাকা—তারি মধ্যে আলো জ্বালিয়ে ঘর সাজিয়ে, নূতন পোষাক পরে, সবাই উৎসবের আনন্দে মেতে যায়।

খৃষ্ট মাসের আগের দিন রাত্রে, সব ছেলেপিলেরা শুতে যাবার সময় এক্‌পাটি করে মোজা খাটের পায়াতে ঝুলিয়ে রেখে দেয়—সকাল বেলায় উঠে দেখে, অবাক্ কাণ্ড! মোজা ভর্ত্তি কত খেল্‌না, পুতুল, লজঞ্চুষ—যে যা ভালবাসে, তার ভাগ্যে ঠিক তাই রয়েছে! তাদের মা-বাবা চোখটিপে হাসেন, আর বলেন, "দুপুর রাত্রে 'স্যাণ্টা-ক্লস্' বুড়ো এসে দিয়ে গিয়েছে।" এই বুড়োকে কেউ কখনো চোখে দেখ্‌তে পায় না কিন্তু তার ছবি অনেক দেখা যায়—লম্বা লম্বা সাদা চুল দাড়ি গোঁফ, গালভরা হাসি, পিঠে থলে ভরা খেল্‌না—লাল পোষাক পরে, হরিণটানা গাড়ি চড়ে, সে যে কখন চুপি চুপি এসে খেল্‌না রেখে যায়, কেউ জানে না। শুধু সকালবেলা তার

দেওয়া উপহার দেখে বোঝা যায় যে, সে নিশ্চয়ই এসেছিল। তখন ছেলেপিলের দলে আনন্দের ধূম লেগে যায়।

এমনি এক উৎসবের দিনে একটি ছোট মেয়ে তাদের বাড়ির সিঁড়ি আর রোয়াক থেকে বরফ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার কর্‌ছিল—শীতে তার হাতের আঙ্গুলগুলি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, পা দুটি নীল হয়ে গিয়েছে, ছেঁড়া ময়লা জামাতে কিছুতেই শীত মান্‌ছে না—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে অতি কষ্টে সে কাজ কর্‌ছে। হঠাৎ ভিতর থেকে কর্কশ স্বরে কে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "হ্যাঁরে জিনি! বলি, আজ কি সারা সকাল সিঁড়িতেই কাটাবি নাকি? অন্য কাজ কর্ম্ম নেই? রসো, দুঘা না লাগালে চল্‌ছে না দেখ্‌ছি!" চম্‌কিয়ে উঠে জিনি তাড়াতাড়ি ঝাঁটা বাল্টি ন্যাতা তুল্‌তে যাবে, ততক্ষণে এক বুড়ি বেরিয়ে এসে তাকে বক্‌তে বক্‌তে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। বকুনী থাম্‌লে এক ধাক্কা দিয়ে বল্‌ল, "যা, শিগ্‌গীর উঠোন ঝাঁট দিয়ে দে—দেরী কর্‌বি, তো দেখ্‌বি 'ঝেঁটাপেটা' কাকে বলে।"—জিনি ঘাড় হেঁট করে উঠোন ঝাঁট দিতে লাগ্‌ল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বুড়ি সেজেগুজে এসে বল্‌ল, "আমি দোকানে যাচ্ছি—উনানে আলুসিদ্ধ চড়ানো রইল, দেখিস্।"

বুড়িও বেরিয়ে গেল, অম্‌নি পাঁচিলের ওধার থেকে সুন্দর একখানি হাসিমুখ উঁকি মেরে বল্‌ল, "খৃষ্টমাস আস্‌ছে—কি মজা, না?" জিনি অবাক্ হয়ে বল্‌ল, "আস্‌ছে নাকি?" "হাঁ, বুড়ো আস্‌বে, কত খেল্‌না দিয়ে যাবে—তোমাদের বাড়ীতে বুড়ো আসে?" "বুড়ো? গয়লা বুড়ো তো রোজ আসে—তার কথা বল্‌ছ কি?" মেয়েটি হো-হো করে হেসে বল্‌ল, "আরে না—ঐ যে স্যাণ্টা-ক্লস্ বুড়ো খেল্‌না দিয়ে যায়, তার কথা বল্‌ছিলাম। সেই তো উৎসবের রাজা—যত খেল্‌না সেই তো দেয় —তোমাকে সে খেলনা দেয় না? তুমি বুঝি মোজা ঝুলিয়ে রাখ না?" "আমার তো মোজাই নেই ভাই!" "মোজা নেই! ওমা শীত করে না? তোমার মার কাছে কেন চাও না?" "আমার মাও নেই, বাবাও নেই—ঐ বুড়ি আমাকে মানুষ করেছে—ও বলে মা বাবার মত আমিও মরে গেলে ও বাঁচে। আচ্ছা ভাই, বুড়ো কেন আমাকে কিছু দেয় না? সে বুঝি আমাদের বাড়ী চেনে না? আমাকে যদি একটা পুতুল দিত, কি মজাই হ'ত! আমার একটাও পুতুল নাই। একবার একটা ভাঙ্গা বুরুষকে পুতুল বানিয়ে খেল্‌তাম, তাই দেখ্‌তে পেয়ে বুড়ি আমাকে মেরে—" বল্‌তে বল্‌তে জিনি কেঁদে ফেল্‌ল, তার বন্ধুর চোখদুটিও ছল ছল করে উঠ্‌ল—

এমন সময় বুড়ির পায়ের শব্দ শুনে বন্ধুটি ছুটে পালাল, জিনিও একমনে ঝাঁট দিতে লাগ্‌ল। আলুর কথা সে ভুলেই গিয়েছিল, কাজেই বুড়ি যখন এসে দেখ্‌ল যে আলু পুড়ে গিয়েছে, তখন জিনির কি দশা হ'ল বুঝ্‌তেই পার।

দুপুরে রুটি আন্‌তে বাজারে গিয়ে, একটা দোকানের সাম্‌নে জিনি হঠাৎ থম্‌কিয়ে দাঁড়াল—কত রকমের সুন্দর সুন্দর খেল্‌না যে সাজানো রয়েছে! সব চেয়ে তার চোখে পড়্‌ল একটি পুতুল—সাটিনের পোষাক পরা, পুঁতির মালা গলায়, সোণালী চুল, নীল চোখ—ঠিক যেন তার দিকেই চেয়ে হাস্‌ছে। অনেকক্ষণ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে পুতুলটির দিকে চেয়ে থেকে, সে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এল—লাভের মধ্যে দেরী করার জন্য বুড়ির কাছে মার খেতে হ'ল।

সেদিন সারাদিনের মধ্যে জিনির যে কত কাজে গোল হ'ল, আর কত মার খেতে হ'ল তার আর ঠিক নাই। বেচারার মনে কেবল ঐ পুতুলটির মুখখানি জাগ্‌ছে, আর সব কাজ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার সময় বুড়ি যখন গির্জ্জায় চলে গেল, তখন জিনি আর থাক্‌তে পার্‌ল না—দৌড়ে সেই দোকানের সাম্‌নে আবার গিয়ে হাজির হল। সারি সারি বিজলীর আলোতে দোকানটি একেবারে ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে, পুতুলের গায়ের গহনা, পোষাকের জরী আর নীলার মত চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌ছে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে জিনি তাই দেখ্‌ছে। একবার যদি সে উৎসবের রাজার দেখা পেত, তবে ঐ পুতুলটি চেয়ে নিত কিন্তু উৎসবের রাজা কোথায় থাকে সে ত জানে না! কাকেই বা জিজ্ঞাসা কর্‌বে? রাস্তায় কত লোক যাচ্ছে-আস্‌ছে, কেউ বা তাকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, জিনি ভয়ে ভয়ে সবাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে—কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে তার সাহস হয় না। হঠাৎ একটা দুষ্টু ছেলে এক ঠেলাতে তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। অম্‌নি কোথা থেকে একটি মেম দৌড়িয়ে এসে তাকে ধরে তুলে বল্‌লেন, "আহা, বেশী লেগেছে কি? তোমার নাম কি বাছা?" জিনি বল্‌ল, "আমার নাম ভার্জ্জিনিয়া, কিন্তু সবাই আমাকে জিনি বলেই ডাকে।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" "আমি উৎসবের রাজাকে খুঁজ্‌তে যাচ্ছিলাম।" "উৎসবের রাজা কে, বল তো?" "সেই যে বুড়ো সবাইকে খেল্‌না দিয়ে যায়, সেই তো উৎসবের রাজা।" "তা নয়, বুড়ো তোমাদের উৎসবে অনেক আনন্দ দেয় বটে কিন্তু আসল উৎসবের রাজা হচ্ছেন ঈশ্বর—যিনি আমাদের সব সুখ দেন।" "ঈশ্বর

কে?" "তুমি ঈশ্বরের নাম শোননি? তিনি তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবী, আকাশ, চাঁদ, সূর্য্য সবই তিনি করেছেন, আমাদের সবাইকে তিনি ভালবাসেন।" "আমাকেও কি তিনি ভালবাসেন? তাঁকে ত আমি কখনো দেখিনি—তিনি কোথায় থাকেন?" "তিনি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। তুমি যদি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হও, তবে যত বড় হবে ততই তাঁকে নিজের প্রাণের মধ্যে বুঝ্‌তে পার্‌বে।" "আচ্ছা, যারা খুব দুষ্টু—লোককে মারে আর কষ্ট দেয়, তাদেরও কি ঈশ্বর ভালবাসেন? তিনি বোধ হয় মিসেস্‌ টাইকের প্রাণে থাকেন না।" "মিসেস্‌ টাইক কে?" "সে একজন বুড়ি—আমি তার কাছে থাকি, আমার কিনা কেউ নেই।" "ঈশ্বর তো সকলের প্রাণেই আছেন, তবে সবাই তাঁকে জান্‌তে পারে না। যে জান্‌তে পারে সে আর দুষ্টু থাক্‌তে পারে না—মিসেস্‌ টাইক্‌ও হয়তো একদিন তাঁকে জান্‌বে।"

এই রকম গল্প কর্‌তে কর্‌তে তারা মিসেস্‌ টাইকের বাড়ীতে এসে পড়্‌ল। বুড়ি তখন দরজায় দাঁড়িয়েছিল—জিনিকে দেখেই চীৎকার করে গাল দিতে আরম্ভ কর্‌ল। জিনির সঙ্গে ভদ্রমহিলাটিকে দেখে বুড়ি একটুও অপ্রস্তুত হ'ল না—তাঁকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়ে, জিনির কান ধরে বাড়ীর ভিতর টেনে নিয়ে, দরজা বন্ধ করে দিল। সেই ভদ্রমহিলাটি হচ্ছেন সেখানকার পাদরী সাহেবের স্ত্রী—তিনি বাড়ী ফিরে গিয়ে তাঁর স্বামীকে সব কথা বল্‌লেন।

সেদিন রাত্রে জিনির ভাগ্যে কীল চড়, কানমলা ছাড়া আর কিছুই খাবার জুট্‌ল না—এ রকম প্রায়ই হ'ত—সেই পুতুলটির কথা, "উৎসবের রাজা"র কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। সকালে চোখ মেলেই দেখ্‌ল, কে একজন তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ধড়্‌মড়িয়ে উঠে জিনি বল্‌ল, "তুমি কি উৎসবের রাজা?" "না মা, আমি 'উৎসবের রাজা'র সামান্য দাস মাত্র—তোমার দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।" এই বলে তাঁর গরম কোটটি দিয়ে জড়িয়ে জিনিকে কোলে তুলে নিয়ে, তিনি একেবারে বাইরে গিয়ে গাড়িতে চড়ে বস্‌লেন। জিনি ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগ্‌ল—ঐ বুঝি বুড়ি তাড়া করে আসে! কিন্তু বুড়ির কোনো সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না।

গাড়ি যখন একটি সুন্দর ছোট্ট বাগান বাড়ীতে থাম্‌ল, তখন জিনি দেখ্‌ল পাদ্‌রী সাহেবের স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। জিনিকে আদর করে তিনি বল্‌লেন, "আজ থেকে

আমরাই তোমার বাবা-মা হ'লাম। তোমার মত একটি মেয়ে আমাদের ছিল, তাকে ভগবান্ নিয়ে গেছেন, আবার সে দুঃখ কতকটা ভোলাবার জন্য তিনিই তোমাকে আমাদের কাছে এনে দিলেন।"

সে দিনটা যে জিনির কত আদর যত্নে ও আরামে কাট্‌ল তা বল্‌বার নয়—স্নান করে নতুন পোষাক পরে, তাকে যেন আর সেই জিনি বলে চেনাই গেল না। সে অবাক্ হয়ে খালি ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "এ কি স্বপ্ন না সত্যি?" রাত্রে সে তার নতুন মোজার একপাটি খাটের পায়ায় ঝুলিয়ে রেখে দিল, আর সকালে উঠে দেখ্‌ল সেই সুন্দর পুতুলটি মোজার ভিতর থেকে মুখ বের করে হাস্‌ছে!

পুতুলটিকে বুকে নিয়ে জিনি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময়ে পাদ্‌রী সাহেব তাকে বাইরের ঘরে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকেই জিনি ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল. কারণ, এক কোণে বুড়ি মিসেস্ টাইক্ বসে ছিল। পাদ্‌রী সাহেব জিনিকে কোলে নিয়ে বল্‌লেন, "এই দেখ জিনি, মিসেস্ টাইক্‌কে আমি ধরিয়ে আনিয়েছি—এখন তুমি ইচ্ছা কর্‌লে আমি ওকে ছেড়েও দিতে পারি, কিম্বা জেলেও দিতে পারি—কি কর্‌বো, বলতো?" জিনি তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে বল্‌ল, "ওকে ছেড়ে দাও। 'উৎসবের রাজা' তার ছোট প্রাণটিকে স্পর্শ করেছেন, তাই আজ তার মনে রাগ অভিমান নাই। জিনির কথা শুনে বুড়ি ছুটে এসে তার হাত দুখানি ধরে, ঝরঝর করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—এতদিনে বোধ হয় তার ঐ শুখ্‌নো, কঠিন প্রাণেও "উৎসবের রাজা"র পরশ লেগে গিয়েছে!

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী

বেবুনের বুদ্ধি

(উয়াইড্ ওয়ার্লড্ ম্যাগেজিন হইতে)

জে, ই, উয়াইড্ সাহেব দক্ষিণ-আফ্রিকা-রেলে গার্ডের কাজ কর্‌ত। হঠাৎ একদিন রেল গাড়ীর নীচে পড়ে গিয়ে, তার দুটি পা হাঁটুর কাছে কেটে যায়। এরূপ অবস্থায় গার্ডের কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব তাই, তখন তাকে দ্বারোয়ানের কাজ দেওয়া হলো। ক্রমে এই কাজ থেকে তার উন্নতি হলো সিগ্‌নেলারের কাজে। প্রত্যেক ষ্টেশন থেকে দুই দিকেই প্রায় ৩ পোয়া মাইল দূরে, একটা থামের ডগায় একখানা

কাঠের ছোট তক্তা এড়ো ভাবে থাকে। কোন ট্রেইন্ এলে পর, ষ্টেশন মাষ্টারের হুকুমে এই তক্তাখানা নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন ট্রেইন ষ্টেশনে ঢুকে। এই তক্তা নামান না থাক্‌লে গাড়ী দূরে দাঁড়িয়ে থাকে—তখন ষ্টেশনে ঢুক্‌বার হুকুম নাই। ষ্টেশন মাষ্টারের হুকুমে যে লোক এই কাজ করে, তাকেই বলে "সিগ্‌নেলার"।

উয়াইড্ ত সিগ্‌নেলার হলো। তার ঘরখানি ছিল সিগ্‌নেল-ক্যাবিন্ থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে। দুটি পাই তার কাটা, সুতরাং বাড়ী থেকে সিগনেল-ঘরের কাছে যেতে বেশ কষ্ট হতো, আর সময়ও লাগ্‌ত অনেকটা। তখন সে কর্‌ল কি, নিজেই একটা ঠেলাগাড়ী (trolley) বানিয়ে নিল, তাতে চড়ে রেলের লাইনের উপর দিয়ে সে সিগ্‌নেল ক্যাবিনে যাতায়াত কর্‌ত। গাড়ীটা টান্‌বার জন্য একটা কুকুর রেখেছিল। এই সময়ে উয়াইড্ একটা বেবুনের বাচ্চা কিন্‌ল। ভাব্‌ল, এই বাচ্চাটা বড় হলে তার সঙ্গী হবে, তখন আর একা একা থাক্‌তে তার কষ্ট হবে না।

বেবুনটার নাম রাখল জ্যাক্। জ্যাক্ বড় হয়ে তার প্রভুর ভারি ভক্ত হয়ে পড়্‌ল, আর দেখা গেল, যে, তার অসাধারণ বুদ্ধি—প্রায় মানুষেরই মত। জ্যাক্ রোজ খুব মন দিয়ে তার প্রভুর সিগ্‌নেলের কাজ দেখ্‌ত। একদিন সে, তার অসাধারণ বুদ্ধির একটা আশ্চর্য্য প্রমাণ দিয়ে ফেল্‌ল।

সিগ্‌নেল ঘরের কাছেই একটা কয়লা থাক্‌বার জায়গা ছিল। সেখানে যাবার জন্য মেইন লাইন থেকে অন্য লাইন বেরিয়ে গিয়েছে। যেখানটায় অন্য লাইন বেরিয়েছে, সেখানটায় দুই লাইনের জোড়—সেই জোড়টা তালা শিকল দিয়ে বন্ধ থাকে। কয়লা নেবার জন্য এঞ্জিন্ এসে সেই জোড়ার (point) আগে দাঁড়িয়ে ৪ বার বাঁশি বাজায়, তা শুনে উয়াইড্ গিয়ে, সিগ্‌নেল-ঘরের দেয়ালের পেরেকে যে চাবি ঝুলান থাকে সেই চাবি নিয়ে, এঞ্জিন ড্রাইভারের হাতে দেয়। তখন ড্রাইভার লাইনের জোড়া খুলে কয়লার আড্ডায় যায়—উয়াইড্ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। কয়লা নিয়ে ফিরবার পথে, চলন্ত এন্‌জিন থেকে ড্রাইভার সেই চাবি দেয়, উয়াইড্ হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে আবার পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে।

বেবুন জ্যাক্ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রভুর এই চাবি দেওয়া ব্যাপার খুব মন দিয়ে দেখ্‌ল। তারপর একদিন, কয়লা নিতে এসে এঞ্জিন ৪ বার বাঁশি ফুঁক্‌তেই, জ্যাক্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্! আর সিগনেল ঘরে গিয়ে, পেরেক থেকে চাবি নিয়ে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়লা নিয়ে ফির্‌বার সময়ে ড্রাইভারের হাত

থেকে চাবিটি নিয়ে, আবার ঠিক পেরেকটিতে ঝুলিয়ে রেখে দিল! তখন থেকে এই কাজ আর উয়াইড্‌কে কর্‌তে হতো না—জ্যাক্‌ই কর্‌ত।

এই ঘটনার পর, উয়াইড্ জ্যাক্‌কে আরো অনেক কাজ শিখাল। ক্রমে জ্যাক্ হয়ে গেল, সব কাজে, ঠিক যেন তার প্রভুর এসিষ্টাণ্ট।

জ্যাক্ ঘুম থেকে উঠ্‌ত খুব সকালে। জল টল এনে ঘরের কাজ কর্ম্ম সেরে তারপর সে তার প্রভুর সঙ্গে খেতে বস্‌ত। খাওয়ার পরই আবার প্রভুর সঙ্গে কাজ করা। কাজে বেরোবার আগে ঠেলাগাড়ীটি লাইনের কাছে এনে, প্রথম সাম্‌নের চাকা দুটো লাইনের উপর তুলে দিত। তারপর সজোরে ঠেলে, টেনে সমস্ত গাড়ীটাকে লাইনের উপর তুলে—বাস একেবারে প্রস্তুত, প্রভু গাড়ীতে চড়লেই হয়। উয়াইড্ ট্রলির সাম্‌নে এসে বস্‌লে, জ্যাক্ ট্রলির পিছন দিক্ থেকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে সিগ্‌নেল বাক্‌সের কাছে গেল। উয়াইড নাম্‌লে পর, আবার ট্রলিটাকে লাইন থেকে নামিয়ে সিগ্‌নেল ঘরের পাশে প্লাটফর্‌মের নীচে নামিয়ে রেখে দিত। ট্রলি টানার কাজ এখন কুকুরের বদলে জ্যাক্‌ই করে। জ্যাকের গায়ে জোর ছিল কতখানি তা এই ব্যাপার থেকেই বুঝা যায়—ট্রলি লাইনে তোলা এবং নামান একজন লোকের পক্ষে বড় সহজ নয় কিন্তু জ্যাক্ একাই সমস্ত কর্‌ত।

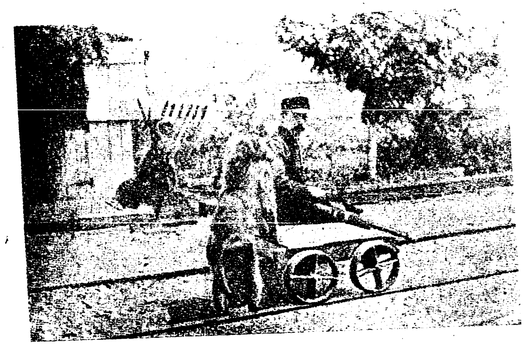

জ্যাক্ ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

সিগ্‌নেলের চেইন চাকার মধ্যে জড়ান থাকে। প্রত্যেক চাকার একটা করে হাতোল, তা ধরে টান্‌লে, দূরে সিগ্‌নেল উঠে। সিগ্‌নেল পোষ্ট প্রায় ৩ পোয়া মাইল দূরে, হাতোল টেনে এত দূর থেকে সেটাকে খাড়া করা ভীষণ ব্যাপার! শুধু টান্‌লে হবে না, টেনে হাতোল ধরে রাখ্‌তে হবে—ট্রেইন পার হয়ে গেলে পর, হাতোল ছেড়ে দিতে হয়। এই সব কাজ জ্যাক্ শুধু যে ঠিক ঠিক মতই কর্‌ত, তা নয়, খুব সহজেই কর্‌তে পার্‌ত।

দিনের কাজ শেষ হয়ে গেলে, আবার ট্রলি এনে লাইনে বসাবে। প্রভু চড়ে বস্‌লে আবার ঠেলে নিয়ে চল্‌বে বাড়ীতে। লাইন যেখানে নীচের দিকে গিয়েছে, সেখানে ট্রলি জোরে ঠেলে দিয়ে জ্যাক্ নিজেও চড়ে বস্‌ত। ট্রলি আপন জোরে আপনি ছুটে চলেছে—এই ব্যাপারটি দেখে জ্যাকের আর আনন্দের সীমা নাই।



জ্যাক্ সিগ্‌নেল চেইনের হাতোল টেনে ধরে রয়েছে।

উয়াইড্ তার ঘরের পাশেই খানিকটা জমিতে তরি তরকারি, শাক শব্জি কর্‌বে। জ্যাক্ তখনও প্রভুকে সাহায্য না করে ছাড়্‌বে না। জল এনে ছড়ান, মাটি খুঁড়ে পরিষ্কার করা, আগাছা আবর্জ্জনা ফেলে দেওয়া—সবই কর্‌বে জ্যাক্। পাম্প্ করে সে জল তুল্‌ছে, উয়াইড্ সেই জল জমির সর্ব্বত্র চালান করে দিচ্ছে। জ্যাক্ তার প্রভুকে যতখানি ভালবাস্‌ত কোন মানুষ চাকর তার মুনিবকে ততখানি ভালবাস্‌তে পার্‌বে কিনা সন্দেহ। ট্রলিতে চাকর মুনিব দুজনে বসে আছে;—জ্যাকের একখানি হাত তার প্রভুর গলায় জড়ান, অন্য হাতখানি প্রভুর মুখে বুলিয়ে আদর কর্‌ছে। উয়াইডের জামায় ধূলা মাটি লাগ্‌লে জ্যাক্ যত্ন করে হাত দিয়ে ঝেড়ে দেয়। এই সব দৃশ্য যে দেখেছে, তারই মনে বিস্ময় লেগেছে।

একদিন উয়াইড্ লাইনের উপর থেকে একটা পাথর সরাতে গিয়ে, হঠাৎ পড়ে যায় এবং তার হাতে বেশ আঘাত লাগে। সিগ্‌নেলার পড়ে থাক্‌লে ব্যাপার

শুরুতর হয়। কিন্তু পীড়িত উয়াইডের ইঙ্গিত মত, জ্যাক্ তার প্রভু যতদিন না ভাল হলেন ততদিন তাঁর কাজগুলি খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে করে দিল।

একবার রেলের অন্য এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে উয়াইডের ঝগড়া হয়। লোকটা শেষে উয়াইড্‌কে গালাগালি দিতে লাগ্‌ল। এই ব্যাপার দেখে জ্যাক্ লোকটাকে এম্‌নি এক ধাক্কা দিল, যে, সে একেবারে প্লাট্‌ফরমের নীচে! তাকে ফেলে দিয়েই জ্যাক্ বুক্‌ফুলিয়ে এম্‌নি কট্‌মট্ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল, যে, তার আর প্লাট্‌ফরমের উপরে উঠ্‌তে ভরসা হলোনা—তখনই তার রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল।



একদিন দেখা গিয়েছিল—জ্যাক্ ট্রলিটাকে লাইনে তুলেছে, উয়াইড্‌ও তার উপরে বসেছে; এমন সময় জ্যাক্ দেখ্‌ল, প্রভু ভুলে লাঠিটা ঘরে ফেলে এসেছেন। সে ঘরের দরজা খুলে লাঠি বা'র করে আন্‌ল; আবার তালাটি বন্ধ করে লাঠি এবং চাবিটি এনে প্রভুর হাতে দিল। এরূপ ঘটনা আর কত বলব?

প্রথম যখন জ্যাক্ তার প্রভুর হয়ে তাঁর কাজগুলি কর্‌তে আরম্ভ করে, তখন অনেক প্যাসেঞ্জার দারুণ আপত্তি করেছিল—পাছে কোন্ দিন না কোন্ য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ হয়ে বসে। কিন্তু য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ হওয়া ত দূরের কথা, ৯ বৎসর যাবৎ জ্যাক্ কিরূপ অদ্ভুত কৌশলে তার কাজগুলি করে গিয়েছিল, তা বুঝিয়ে বল্‌বার ভাষা নাই। বেবুনজাতির সাধারণ বুদ্ধি কতখানি প্রখর সে বিষয় যাঁরা জানেন, তাঁরাই কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

হায় বেচারি জ্যাক্! এত বৎসর মন প্রাণ দিয়ে প্রভুর কাজ করে, শেষে দারুণ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হলো। ক্রমাগত ছয় মাস যাবৎ উয়াইড্ অক্লান্ত পরিশ্রম করে কত যে তার সেবা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা—জ্যাক্ মারা গেল! উয়াইড্ যতদিন বেঁচে ছিল—তার ভৃত্য, সঙ্গী, বন্ধু প্রাণপ্রিয় জ্যাকের শোক ভুল্‌তে পারেনি।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বড় দিন

এই ডিসেম্বর মাসে তোমাদের বড় দিনের ছুটি। ২৫শে ডিসেম্বর Christmas Day, বাংলায় তাহাকে বড় দিন বলে। বৎসরের মধ্যে এই দিনটিকে বড় বলিয়া বলা হয় কেন? এই দিনে যিশুখৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার শিষ্যেরা ইহাকে বড় দিন বলেন ও এই দিনে বিশেষ ভাবে আমোদ করেন। তোমরা 'খৃষ্টাব্দ' কথা শুনিয়াছ। যিশুখৃষ্টের পর হইতে, তাঁহারই নামে, খৃষ্টাব্দ (খৃষ্টের অব্দ) আরম্ভ হইয়াছে। এখন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ চলিতেছে, তার মানে খৃষ্টের মৃত্যুর পর ১৯২৩ বৎসর চলিয়া গেল। তিনি সামান্য এক ছুতারের ছেলে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বর ভক্তি, সাধুতা, ও মহাপ্রাণতার গুণে তিনি কোটি কোটি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং পূজা পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। খৃষ্টের শিষ্যদের খৃষ্টিয়ান বলা হয়। আমাদের দেশে এবং বিদেশেও সাধু মহাপুরুষদের সম্বন্ধে অনেক গল্প লোকে বলিয়া থাকে। যিশুর বিষয়ে এই রকম অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সেই সকল অলৌকিক ঘটনা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন।

জুডিয়া দেশে, বেথ্‌লেম নগরে এক আস্তাবলের খড়ের গাদায়, যিশুখৃষ্টের জন্ম হয়। ছেলেবেলা হইতেই তিনি খুব ভাবুক ছিলেন, এবং ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করিতেন ও ঈশ্বরের ভালবাসার কথা সকলকে বলিতেন। ক্রমে বড় হইয়া, যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন, সেই ধর্ম্ম প্রচার করেন। "ভগবান এক; তাঁহাকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাস, স্বর্গরাজ্য পাইবে।" এই ছিল তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান কথা। তিনি অনেক ভাল ভাল উপদেশ দিয়াছেন। নিজের মনকে পবিত্র রাখিতে, মানুষকে ভালবাসিতে, এমন কি শত্রুকেও ভালবাসিতে, ক্ষমা করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। কেবল যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে, নিজের জীবনে এই ক্ষমা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে, অন্য গালটি তাহার দিকে ফিরাইয়া দিও।"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তাই বলিতেন, "শিশুদের আমার কাছে আসিতে দিও, কারণ, স্বর্গরাজ্য এই রকমই।" যত দুষ্ট লোক হউক না কেন, যে রকম খারাপ রোগে আক্রান্ত রোগী হউক, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না।



যিশুখৃষ্ট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া শত শত নরনারী তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিতে লাগিল। সেই সময়ের লোকেরা ইহুদী ধর্ম্ম



"শিশুদের আমার কাছে আসিতে দিও, কারণ, স্বর্গরাজ্য এই রকমই।"

মানিত; তাহাদের মন্দিরকে 'সিনাগগ্' বলিত। যিশুর শিষ্যরা তাঁহাকে 'ইহুদীদের রাজা' বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। এই সব নানা কারণে ইহুদী পুরোহিতেরা তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেল, এবং তাঁহাকে মারিবার ফন্দি করিতে লাগিল।

যিশু যখন জেরুজেলাম নগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান, তখন ইহুদী পুরোহিতদের মন্ত্রণায়, জুডাস্ নামে যিশুর একজন শিষ্য তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। শাসনকর্ত্তা পাইলেটের হুকুমে, যিশুখৃষ্টকে মাথায় কাঁটার মুকুট পরাইয়া, ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করিয়া

মারিয়া ফেলা হয়। ক্রুশের উপর যিশুখৃষ্টের অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ও মূর্ত্তি আছে, তোমরা দেখিয়া থাকিবে। যখন তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে এত কষ্ট দিতেছিল, তখন তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছিলেন, "ইহারা জানে না যে কি অন্যায় কাজ করিতেছে, তুমি ইহাদের ক্ষমা করিও।"

শ্রীসুখলতা রাও

উড়ুক্কু জানোয়ার

তোমরা "সত্য মিথ্যা খেলা" জান কি?—একজন মাঝখানে বসে আর তার চারদিকে আর কয়েকজনে ঘিরে ব'সে 'সত্য মিথ্যা' খেলে। মাঝের লোকটি নানা রকমের কাজ করার কথা ব'লে যায়, যেমন—'সন্দেশ খাবো', 'রসগোল্লা খাবো', 'জুতো পর্‌ব', 'গাড়ী চড়্‌ব'—ইত্যাদি। মাঝে মাঝে একটা মিথ্যাও বলে যেমন,—'ইঁদুর ওড়ে'! যতবার সত্যি কথা বলে, ততবার কথা শেষ হওয়া মাত্র অন্য সকলে হাতে তালি দিয়ে ওঠে। কথাটা মিথ্যা হ'লে কেহ তালি দেয় না। যদি মিথ্যা কথায় কেউ তালি দেয় তার এক নম্বর কাটা যায়। তিন নম্বর কাটা গেলেই সে হেরে গিয়ে মাঝখানে বস্‌বে এসে।



একদিন এই 'সত্য মিথ্যা' খেলায় একজন বল্‌ল, 'কাঠবেড়াল ওড়ে'—আর অমনি একজন হাত তালি দিয়ে উঠ্‌ল। সকলে বল্‌ল—'এই নম্বর কাটা গেল', কিন্তু, প্রথম লোকটি বল্‌ল—'কখনই না; এক জাতের কাঠবেড়াল আছে তারা ওড়ে।' কথাটা এক হিসাবে সত্যিই বটে। ঐ জাতের কাঠবিড়ালী আমাদের দেশেও আছে। এরা ঠিক ওড়ে না। এদের সামনের পা আর পিছনের

পায়ের মাঝে একটা পর্দ্দার মত আছে। সেই পর্দ্দার সাহায্যে এরা লাফিয়ে, ঠিক ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার মত, পা ছড়িয়ে শূন্যে বহুদূরে চ'লে যায়। পর্দ্দাটায় এদের 'উড়্‌বার' পক্ষে সাহায্য করে। এরা নীচে থেকে উড়ে উপরে উঠ্‌তে পারে না,—কেবল উঁচু থেকে নীচে নাম্‌তে পারে।



এক জাতের ব্যাঙ আছে তাদের পায়ের আঙ্গুল খুব লম্বা আর আঙ্গুলের মাঝে পর্দ্দা দিয়ে জোড়া। এরা যখন পা ছড়িয়ে লাফ মারে, তখন আঙ্গুলের পর্দ্দাগুলি ছড়িয়ে রাখে। তার দরুণ শরীরটা অনেক হাল্কা হয় আর খুব বেশী দূর লাফাতে পারে। এই ব্যাং বর্ম্মাদেশে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

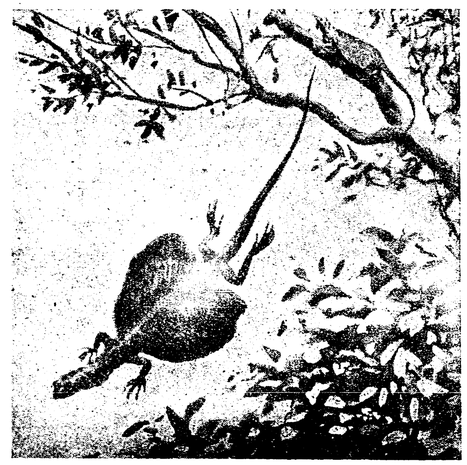

আরেক জাতের গিরগিটি আছে, তাদের গলার কাছে পাখার মত একটি পর্দ্দা থাকে। এরা গাছের উপর চ'ড়ে ঐ পাখাটি মেলে তিড়িং ক'রে লাফ দেয় আর এক লাফেই বহুদূর চ'লে যায়। এদের শরীর বেশী ভারি নয়, আর লম্বা গড়ন হওয়াতে সহজেই বেশী লাফাতে পারে।

উড়ুক্কু মাছের কথা তোমরা অনেকেই বইএ পড়েছ। যারা পুরীতে কিম্বা সমুদ্রের ধারে অন্য কোন জায়গায়

গিয়েছ, তাদের মধ্যে কেউ হয় তো উড়ুক্কু মাছ দেখেছও। এক জাতের উড়ুক্কু মাছের ছবি দিলাম; এদের ডানাটা খুবই বড়, প্রায় শরীরের সমান।

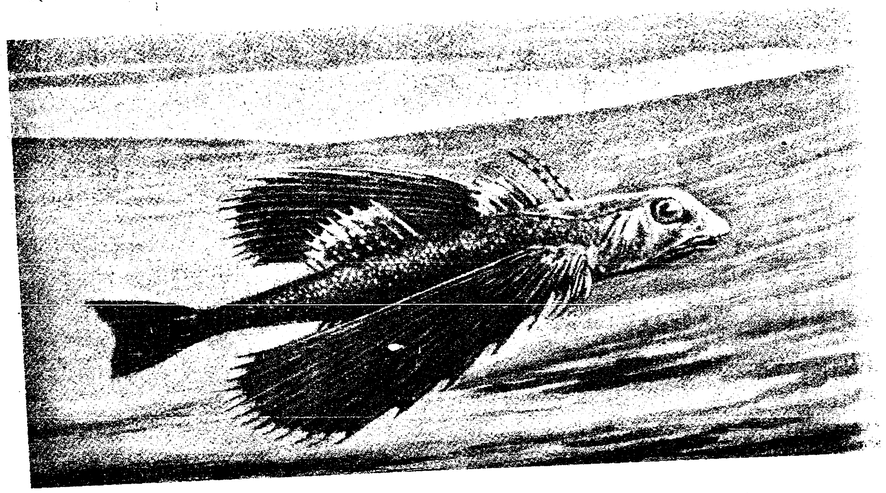

সমুদ্রের বড় বড় মাছেদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওরা উড়্তে পারে; না হ'লে এদের বংশ হয়তো লোপই পেয়ে যেতো।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর এবং উত্তরদাতাদিগের নাম মাঘ মাসের সন্দেশে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং



"কখন নদী বুকে, বিহরে মন সুখে"

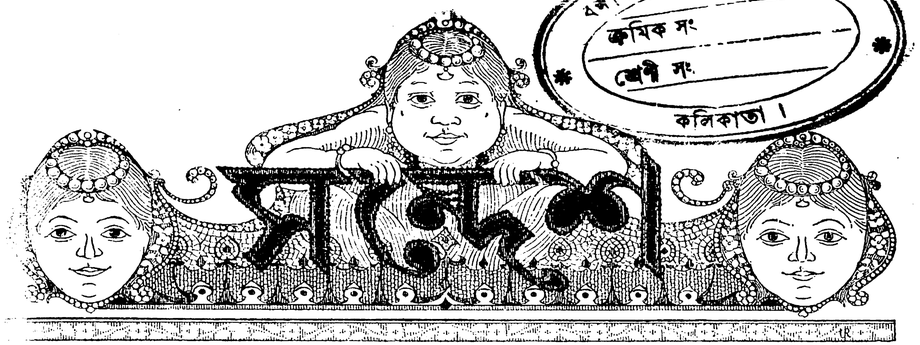
সন্দেশ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

একাদশ বর্ষ মাঘ, ১৩৩০ ১০ম সংখ্যা

কুশ্রী

গরবে মাথা তুলে, সরবে হেলেদুলে
চলেছে পাতি হাঁস।
পিছনে সারি সারি চলেছে ছানা তারি,
পুকুরে যেতে আশ।
একটি প'ড়ে পিছু, মাথাটি ক'রে নীচু,
মরমে ম'রে যেন।
সকলে ঘৃণা করি, তফাতে যায় সরি,
কুশ্রী সে যে হেন।
বেয়াড়া গলা আর বিপুল দেহ তার,
বেসুর বলে বুলি।
জন্মাবধি হায়, এমনি দিন যায়,
কেমনে রহে ভুলি?
একদা অবশেষে পলায়ে দূর দেশে,
হ'ল সে বনচর;
ছাড়িয়া সুখ আশা, মায়ের ভালবাসা,
ছাড়িয়া নিজ ঘর।

বিজনে কাটে দিন, একেলা সাথী হীন,
ভুলিয়া অপমান।
সহসা কোথা হ'তে, মলয় মৃদু স্রোতে
ভাসিল কলগান।
চমকি চাহি আর, আঁখি না ফিরে তার,
মোহন হেরি রূপ;
মেঘের পথ জুড়ে, হাঁসের ঝাঁক উড়ে,
ধবল অপরূপ।
নামিল তারি পাশে, মধুর কলভাষে
সকল দুখ হ'রি,
আপন জন প্রায় চিনিয়া নিল তায়,
লইল সাথে করি।
কখন নদী বুকে বিহরে মন সুখে,
কখন সরোবরে;
কুসুম চুমি যায়, মৃণাল তুলি খায়,
কতই খেলা করে।
মুকুর সম জল, করিয়া টলমল,
দেখাল কার মুখ?
কুশ্রী পাখী তায় অবাক হয়ে চায়,
হরষে কাঁপে বুক।
কুরূপ কোথা তার? কি লীলা বিধাতার,
অমল শোভা এ যে!
হাঁসের রাজা নামে বিদিত ধরাধামে,
অতুল রূপ সে যে।

শ্রীসুখলতা রাও।

অদ্ভুত ফল

এবার বড়দিনের ছুটিতে আমরা মহানন্দা নদীর ধারে, একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঝরঝরে বালির উপর দিয়ে নদীটি এঁকেবেঁকে চলেছে—তার জল যেমন মিষ্টি, জলের মাছ তেমনি সুস্বাদু। ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের পাখী মাছের লোভে জলের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছোট-বড় কুমীরেরও অভাব নাই। দুধারে খোলা মাঠ আর ক্ষেত—কোথাও সর্ষে ফুলের উজ্জ্বল সোনালী, কোথাও চোখ জুড়ানো স্নিগ্ধ সবুজ। চাষাদের ঘরে ঘরে ধান ঝাড়ার ধুম লেগেছে, আর ঘরের চাল ভরে ভরে লাউ কুমড়ো ফলে রয়েছে। চাল-কুমড়োর লতাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে, শুধু ধপ্‌ধপে সাদা পাকা চালকুমড়োগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডিমের মত ঘরের চালে ঝুলছে। আমাদের দলের একটি ছোট্ট মেয়ের একটু বুদ্ধি কম—সে বেচারাকে সবাই বুঝিয়ে দিল যে, ওগুলো হচ্ছে "ঘোড়ার ডিম।"

মাঝে মাঝে আম কাঁঠালের বাগান আর ঝোপ জঙ্গল রয়েছে, তার ভিতরে ঢুকে গাছে চড়ে আর নানারকম ফল ফুল তুলে, ছেলেপিলেদের ভারি আমোদ হচ্ছে—বিশেষতঃ যখন একেকটা গাছ ভরা লাল লাল টোপাকুল দেখা যাচ্ছে, তখন কি মজা হচ্ছে বুঝতেই পার! এই রকম করে বেড়াতে বেড়াতে একটা গাছে আমরা গোল আলুর মত একটা ফল দেখতে পেলাম—ঠিক আলুর মত রং, আবার আলুর গায়ে যেমন "চোখ" থাকে তেমনি কয়েকটা "চোখ" রয়েছে—একটা মাঝারি টোপাকুলের মত বড় হবে। ফলটাকে হাত দিয়ে ডাল থেকে ছিঁড়তে না পেরে, আমি একটা শক্ত কাঠি দিয়ে যেমনি খুঁটে তুলতে গিয়েছি, অমনি সেটা একেবারে আট্‌টা পা তুলে উঁচু হয়ে এসে কাঠিটাকে আক্রমণ করলো! আমি হঠাৎ ভয়ানক চমকিয়ে গিয়েছিলাম, তারপর বুঝলাম যে ওটা ফল নয়—এক রকম মাকড়সা।

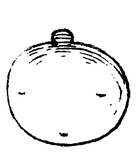



ভালকরে দেখবার জন্য মাটিতে ফেল্‌তেই, সেটা আবার ফলের রূপ ধারণ করলো—নেড়েচেড়ে কিছুতেই বুঝবার সাধ্য নেই যে একটা মাকড়সা! খানিকক্ষণ ধরে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে

দেখলাম, তার শরীরটি বেশ বড় আর একেবারে গোল—সাধারণ মাকড়সা তুলনায়, শরীরের পক্ষে মাথা ও পাগুলি ছোট। যখন চ'লে ফিরে বেড়ায়, তখন ঠিক মাকড়সার মতই দেখায়, কিন্তু যেমনি কোনো কারণে ভয় পায়, অমনি পাগুলি মুড়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় আর তার উপরে মাথাটি কেমন করে গুঁজে দেয়—তখন তাকে বোঁটাশুদ্ধ একটি গোল ফল ছাড়া আর কিছু বলে বিশ্বাসই হয় না! পাগুলো তো দেখাই যায় না, কিন্তু মুখের কাছে ছোট্ট ছোট্ট যে শুঁয়োর মত আছে, তাই দিয়ে এত জোরে গাছের ডাল আঁকড়িয়ে থাকে যে সহজে টেনে ছাড়ান যায় না। মাটিতে ফেলতেই সে শুঁয়োগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেল। গড়গড় করে কত গড়িয়ে দিলাম, তবু একটুও নড়ল না—ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে যেতেই, আস্তে আস্তে মাথা তুল্‌ল, তারপর পা মেলে চলতে আরম্ভ করল।

তোমরা সন্দেশে নানারকম পোকা-মাকড়ের কথা পড়েছ—কারো চেহারা কাঠির মত, কেউ পাতার মত, কেউ বা ফুলের মত, এও তেমনি ফলের রূপ ধরেছে। এই রকম ছদ্মবেশে এরা গাছের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে, আর ছোট ছোট পোকা না জেনে কাছে এলেই, হঠাৎ নিজ মূর্ত্তি ধরে তাদের শিকার করে। তাছাড়া এই রকমে পাখী ও অন্যান্য কীটভোজী জন্তুদের হাত থেকে এরা আত্মরক্ষা করে—গায়ের জোরে যেখানে পারা সম্ভব নয়, সেখানে কৌশলে রক্ষা পাবার এই বিচিত্র উপায় ভগবান্ তাদের করে দিয়েছেন।

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী

খেলা

কাকা। ও টেঁপি ও বেচু এদিকে আয়।

টেঁপি ও বেচু। কি কাকা, কেন ডাক্‌লে?

কাকা। নূতন খেলা শিখ্‌বি, বস্।

নেপাল, বিপিন। আমরাও শিখ্‌ব।

কাকা। আচ্ছা এস। কিন্তু, এ কিন্তু ছেলেমানুষী খেলা। এর নাম 'জল, মাটি, আকাশ' খেলা। তাহ'লে টেঁপি বেচু নেপাল আর বিপিন আমার সাম্নে বস। তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে আমি, 'জল' 'মাটি' 'আকাশ' এই তিনটার মধ্যে একটার নাম ক'রে তাড়াতাড়ি এক থেকে দশ পর্য্যন্ত গুণে যাব। এই দশ গণার মধ্যে তাকে যে জিনিষের নাম করেছি, সেইখানে থাকে এমন একটা জন্তুর নাম বল্‌তে হবে। মনে কর আমি বল্‌লাম 'মাটি, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ।' যার দিকে দেখিয়ে বল্‌লাম, সে অমনি 'গরু' কি 'হাতী' কি 'মানুষ' কি 'বাঘ', যা মাটিতে থাকে, এমনি একটা কিছু বল্‌বে। যদি না বল্‌তে পারে, তবে তাকে আবার আমার মত অন্যদের জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে, 'জল' 'মাটি' কি 'আকাশ' ব'লে। এইবার মন দাও, আরম্ভ করি।

(বেচুর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) 'আকাশ এক দুই···দশ?'

বেচু। বাঃ, ভাব্‌তে দেবে না?

কাকা। হাঃ হাঃ, ভাব্‌তে ত সময় দিলাম; ওই দশ গুণবার মধ্যেই বল্‌তে হবে। আচ্ছা, তোমরা সকলে মনে মনে কয়েকটা নাম ঠিক ক'রে রাখ।

নেপাল। 'জল' জিজ্ঞাসা কর্‌লে 'মাছ' বল্‌লে হবে?

কাকা। না, তা হবে না। 'আকাশ' জিজ্ঞাসা কর্‌লে 'পাখী' বল্‌লেও চল্‌বে না। মাছের নাম, যেমন রুই কাতলা পুঁটি চিংড়ি এই সব বল্‌তে হবে; পাখীর নাম, যেমন কাক চিল চড়াই এই সব বল্‌তে হবে। এবার আবার জিজ্ঞাসা করি।

বিপিন বল—'আকাশ এক দুই তিন—?'

বিপিন। টিয়া।

কাকা। বেশ বেশ। টেঁপি—'মাটি এক দুই তিন চার পাঁচ—।'

টেঁপি। গণ্ডার।

কাকা। বাঃ রে, চালাক মেয়ে! তোরা দেখি আমাকে ঠকিয়ে দিলি। তাহ'লে আবার বল্‌ছি। বেচু—'আকাশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত—?'

বেচু। এ—এ—এই গরু! (সকলের হাসি)

কাকা। কত বড় গরু আকাশে উড়তে দেখেছিস্ রে? নে, এবার তুই জিজ্ঞাসা কর্‌বি। কিছুক্ষণ খেল্‌লেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আমরা এক চালাকি কর্‌তাম। আমাদের 'জল মাটি আকাশ' জিজ্ঞাসা কর্‌বা মাত্র আগে 'চি' ব'লে ফেল্‌তাম; তারপর ভেবে নিয়ে, আকাশ জিজ্ঞাসা করা হ'লে বল্‌তাম 'ইল্' (অর্থাৎ চিল), মাটি হলে বল্‌তাম 'ইতা' (অর্থাৎ চিতা), আর জল হ'লে বল্‌তাম 'ইংড়ি' (অর্থাৎ

চিংড়ি)। একটা নিয়ম আছে যে একজন একটা নাম উপরি উপরি তিনবারের বেশী বল্‌তে পার্‌বে না। অবশ্য যে জিজ্ঞাসা কর্‌বে সে 'মাটি' বা 'জল' বা 'আকাশ', উপরি উপরি অনেকবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারে। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে সে যদি, যতবার 'মাটি' জিজ্ঞাসা করা হবে, ততবারই বলে 'মানুষ', তাহ'লে চল্‌বে না।

(শচি ও সুধীশের প্রবেশ)

শচি, সুধীশ। বাঃ, আমাদের খেল্‌তে ডাকলেন না কাকা?

কাকা। তোমরা ছেলেমানুষী খেলা খেল্‌তে চাও না। আচ্ছা এবার আর একটা বুদ্ধির খেলা বলি শোন। তোমার যে যে 'ভূগোল' (Geography) পড়েছ, সে সে খেল্‌তে পার্‌বে। গোল হয়ে সবাই বস। নেপাল, তুমি একটা কোন নদী বা সহর বা পর্ব্বত বা দেশের নাম কর।

নেপাল। বালিগঞ্জ।

কাকা। না, ও রকম ছোট খাটো যায়গার নামে হবে না। এমন নাম বল্‌তে হবে, যা একটু বড় ভূগোলের বইএ আছে, যা তোমরা সচরাচর পড়ার মধ্যে পাও।

নেপাল। তবে, কলিকাতা।

কাকা। এবার বিপিন 'ত' দিয়ে আরম্ভ, এমন একটা নাম কর, নদী বা হ্রদ বা প্রণালী বা সহর যাই হোক।

বিপিন। তমলুক।

কাকা। শচি বল 'ক' দিয়ে।

শচি। 'ক'এ ইকার উকার এসব থাক্‌তে পারে ত?

কাকা। পারে। 'শ' দিয়ে যদি একটা নাম শেষ হয়, তাহ'লে যে পরের জন তালব্য 'শ' দিয়েই আরম্ভ করবে তার কোন কথা নেই, যে কোন 'স' বলতে পারে।

শচি। কৃষ্ণা।

সুধীশ। আমি তাহ'লে কি দিয়ে আরম্ভ করব?

কাকা। এটা একটু গোলমেলে কথা বটে। 'ন' দিয়ে আরম্ভ করাই সুবিধা।

সুধীশ। নায়াগারা। এবার নেপাল বল 'র' দিয়ে।

নেপাল। রাশিয়া। তাহ'লে বিপিন কি দিয়ে বলবে কাকা?

কাকা। 'য' দিয়ে বলতে পারে। এবার ত তোমরা খেলা বুঝলে, আমি যাই।

তিনবার যে ঠেকে যাবে, নাম বলতে পারবে না, সে হেরে যাবে। মানুষের নাম দিয়েও এ খেলা খেলা যায়, তাতে আর ভূগোল জানবার দরকার হয় না। এই ধরণের হবে আরকি। প্রথম জন যেন বল্‌ল 'নলিনী' দ্বিতীয় 'নবদ্বীপ' তৃতীয় 'পরেশ' চতুর্থ 'শচি'; এই রকম।

শ্রীসুখলতা রাও।

এগ্‌বার্টের লাঞ্ছনা

গতবারে বলেছি;—মোটর গাড়ীর সোফেয়ার গভীর রাত্রে, নির্জ্জন রাস্তায় হঠাৎ গণ্ডারের পিঠে মানুষ চড়ে যাচ্ছে দেখে, ভয়ে গাড়ী চালাবার চাকাটি ছেড়ে দেওয়াতে, আরোহী শুদ্ধ মোটর খানি একেবারে খানায়! এড্‌ওয়ার্ড চেয়ে দেখ্‌ল, যে, গাড়ীর জানালা দিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক তার দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছেন। দেখেই সে চিন্‌তে পার্‌ল। বৃদ্ধটি মিড্‌ল্ সায়ারের ডিউক স্বয়ং। আর তাঁর চোখ দেখে মনে হলো, যেন, তিনিও এড্‌ওয়ার্ডকে চিন্‌তে পেরেছেন:—

এই মোটর দুর্ঘটনায় যে একটা দারুণ বিপদের সূত্রপাত হয়েছে—এটা এড্‌ওয়ার্ড স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারল। আর তার ভয় হলো, যে, এবারে তাকে গণ্ডার নিয়ে সেণ্ডারষ্টন্ ছেড়ে বা চলে যেতে হয়। ডিউক যেমন কড়া মেজাজের লোক, তিনি যে সহজে এড্‌ওয়ার্ডকে ছেড়ে দিবেন তা মনে হয় না। এড্‌ওয়ার্ড ভেবেই অস্থির, কখন জানি তার নামে সমন এসে হাজির হয়!

এদিকে অর্থাভাবে তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীগ্‌গির একটা কিছু ব্যবস্থা না কর্‌তে পারলে, তাদের না খেয়ে মর্‌তে হবে। হায়! এগ্‌বার্ট যদি চেক্ সই কর্‌তে পারত, তবে আর টাকা পয়সার ভাবনা ছিল কি?

ক্যাথেলিন্ আর এড্‌ওয়ার্ড একদিন গ্যারেজে বসে এই সব কথা ভাব্‌ছিলেন। ক্যাথেলিন বল্‌লেন, "আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে হয় না? একজন উকিল ডেকে আনা যাক্, তার কাছে এগ্‌বার্ট, আমাকে যেমন সব কথা বলে পরিচয় দিয়েছিল, তেম্‌নি করে পরিচয় দিক্। তাহলে উকিলের সাহায্যে ব্যাঙ্ক থেকে এগ্‌বার্টের টাকা আন্‌তে পারা যাবে। তখন খাওয়া দাওয়ার জন্য ভাব্‌না কর্‌তে হবে না, আর টাকার সাহায্যে যাদুকরের সন্ধানে পুলিষও লাগান যাবে।"

এই যুক্তি এগ্‌বার্টকে জানালে পর, সে ভীষণ জোরে মর্স সঙ্কেত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। আর সেই সঙ্কেতের অর্থ হলো "কিছুতেই না।" এড্‌ওয়ার্ড বুঝ্‌তে পারল, যে, এরূপ উত্তর দেওয়ায় এগ্‌বার্টের কিছু দোষ নাই। "এগ্‌বার্ট পন্‌সন্‌বি থুয়েট্‌ (এগ্‌বার্টের পূরো নাম) যাদুবলে গণ্ডার হয়ে গিয়েছে" একথা ক্যাথেলিন্‌কে বুঝান যেমন সহজ হয়েছিল, অন্যের সম্বন্ধে তেমন সহজ হবে না। আজকাল লোকে যাদু টাদু বড় একটা বিশ্বাস করে না। এড্‌ওয়ার্ড বাইরের কাউকে এগ্‌বার্টের কথা বল্‌তে গেলে, হয়ত তাকে পাগ্‌লা গারদে দেবার ব্যবস্থা কর্‌বে, আর তা হ'লেইত এগ্‌বার্টেরও বাসস্থান হবে তখন 'জু'-তে।

মীমাংসা কিছুই হলো না। আবার ভয়ও আছে, না জানি কখন ডিউকের লোক এসে পাক্‌ড়াও করে। এড্‌ওয়ার্ড বাইরে যেতে ভরসা পায় না, ফোন্‌ করে খাবার টাবার আনায়। হোটেল থেকে এক জন রোজ খাবার দিয়ে যায়, আর সন্ধ্যার পর ক্যাথেলিন্‌ এগ্‌বার্টকে একবার করে দেখ্‌তে আসেন—এই ভাবে দিন যাচ্ছে। অন্য জনপ্রাণীও এ বাড়ীর পথ মাড়ায় না।

এরূপ অবস্থায় দিন আষ্টেক পরে, হঠাৎ একদিন বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। এড্‌ওয়ার্ড দরজা খুল্‌তেই দেখ্‌ল, তার মামা ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঘরে ঢুক্‌লেন বটে কিন্তু বস্‌লেন না, দাঁড়িয়ে থেকেই বল্‌লেন—"আর চুপ করে থাক্‌লে চল্‌ছে না, এড্‌ওয়ার্ড! তোমার এ বদ্‌ খেয়াল থামাতেই হবে।"

এড্‌ওয়ার্ড—"আমারও ত তা-ই ইচ্ছা। থামাবার যদি উপায় থাক্‌ত, তবে ত বেঁচে যেতাম।"

ভীষণ গর্জ্জন করে মামা বল্‌লেন—"চুপ কর। তোমার সাধের গণ্ডারের কাণ্ড আমি শুন্‌তে পেয়েছি—ডিউক কিন্তু বেজায় রেগেছেন।"

এড্‌ওয়ার্ড—"মামা! ডিউকের দুর্ঘটনা কারো ইচ্ছায় হয়নি—হঠাৎ হ'য়ে পড়েছে।"

মামা—"আর যাতে হঠাৎও এরূপ না হ'তে পারে তাই আমি কর্‌তে এসেছি। কি সর্ব্বনাশ, এড্‌ওয়ার্ড! তুমি কি জাননা, যে, ডিউক আমার একজন খুব ভাল খরিদদার, তাঁরটা খেয়েই ত আমি বেঁচে আছি। তিনি যখন শুন্‌বেন, যে, তুমি আমার আপন ভাগ্নে, তখন ত আমার দোকানের দিক্‌ও আর মাড়াবেন না!

আর তা হলেই ত আমার একেবারে দফা রফা! কাজেই একবার ভেবে দেখ—তোমার আদরের জানোয়ারটিকে বিদায় কর্‌তেই হবে, আর সেই সঙ্গে তুমিও যাও কিংবা থাক সেটা তুমিই স্থির কর। আমি বলি, তুমিও সরে পড়—সেণ্ডারষ্টন্‌ ছাড়া তোমার পক্ষে বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। ভেবনা, যে, তোমাকে আমার আপিষে আর যেতে দিব।"

এড্‌ওয়ার্ড—"মামা! আমি সবই বুঝ্‌তে পারছি, আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন, কিছুদিন সময় দিন, আমি যাবার সব ব্যবস্থা করে নি।"

মামা—"যত শীগ্‌গির সম্ভব তা করে নাও।" বলেই তিনি ধড়াম্‌ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

এড্‌ওয়ার্ড তখনি গিয়ে ক্যাথেলিন্‌কে ফোন্‌ কর্‌ল—"ক্যাথেলিন্‌! শীগ্‌গির এসো, ব্যাপার গুরুতর। সেণ্ডারষ্টন্‌ না ছাড়লে আর চল্‌ছে না।"

ক্যাথেলিন্‌ এলে পর, দুজনে গ্যারেজে বসে ঘণ্টা দুই ভেবেও বিশেষ কিছু মীমাংসা কর্‌তে পারল না। তবে এটা বুঝ্‌তে পারা গেল, যে, লণ্ডনে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল। কারণ, সেখানে লোকেরা পোষা গণ্ডার টণ্ডার দেখে তেমন কিছু একটা হৈ চৈ করবে না—তারা এরূপ সব আজগুবি ব্যাপারে অভ্যস্থ আছে। তবে কিনা, লণ্ডন গেলে পর, সেখানে এড্‌ওয়ার্ড করবে কি? এ কথার কোন সম্পত্তি কর্‌তে না পেরে ক্যাথেলিন্‌ "বাড়ী গিয়ে আরো ভেবে দেখ্‌ব" বলে চলে গেলেন। এদিকে সারারাত এড্‌ওয়ার্ডের ঘুম হলো না। খানিক পরে পরেই গ্যারেজ থেকে এগ্‌বার্টের গোঙানি শুন্‌তে পাওয়া গেল, সেও রাত্রে ঘুমোতে পারে নি।

পরদিন এড্‌ওয়ার্ড খাওয়া দাওয়ার পর, চিন্তাযুক্ত মনে বাগানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। এসেই তাকে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি মিষ্টার এড্‌ওয়ার্ড?" এড্‌ওয়ার্ড একটু হুঁশিয়ার হয়ে বল্‌ল—"হাঁ। আপনি কে? আমার কাছে কি দরকার?"

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—"আমার নাম ইভর বেরেস্‌ফোর্ড—একটু বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছি।"

বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব লণ্ডনে একটা মিউজিকেল ষ্টেজের ম্যানেজার, টিকিট করে গান বাজনা শোনান তাঁর ব্যবসায়। ডিউক-অব-মিডল্‌ সায়ারের সেই মোটর

দুর্ঘটনার ব্যাপার তিনি খবরের কাগজে পড়েছেন, পড়েই তাঁর মাথায় একটা খেয়াল ঢুকেছে—আর সটান সেণ্ডারষ্টনে, এড্‌ওয়ার্ডদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবের কথা শুনে এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"আপনার কি দরকার আমার কাছে, বলুন।"

সাহেব বল্‌লেন—"মহাশয়! আপনার গণ্ডারের কথা আর ডিউকের মোটর-দুর্ঘটনার কথা আমি খবরের কাগজে পড়েছি। আমার একটা মিউজিকেল ষ্টেজ আছে, লণ্ডনে। আপনার গণ্ডারের ব্যাপার পড়ে আমার একটা খেয়াল হয়েছে। গণ্ডার কখন পোষ মানে না, তাই সকলে জানে। আপনি গণ্ডারকে শুধু পোষ মানান নাই, আবার তার পিঠেও চড়ে বেড়ান—একথা কাগজে পড়ে সকলের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছে, বিষয়টা কেউ বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। এখন আপনি যদি আমার অংশিদার হয়ে, আমার ষ্টেজে এই গণ্ডারের খেলা দেখান, তাহলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুজনে টাকায় লাল হয়ে যাব। বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন দেওয়া প্রভৃতি যা কিছু ব্যবস্থা সবই আমি কর্‌ব, খরচপত্রও সব আমার। তারপর লাভ যা হবে, তার অর্দ্ধেক আপনার।—বলুন, আপনি রাজি আছেন কি না।"

এই প্রস্তাবে এড্‌ওয়ার্ড মনে মনে খুব খুসী হলো। বিষয় বুদ্ধিটা তার বেশ পাকাই ছিল, তাই, মনের ভাবটা চাপা দিয়ে বল্‌ল—"মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ড! এ খেয়ালটা নূতন নয়, আমার মাথায়ও ঢুকেছে এবং কদিন থেকে আমিও তাই বসে বসে ভাব্‌ছি। যাহোক্, আপনি যখন এত কষ্ট করে এসেছেন, তখন, আচ্ছা বেশ—আপনার অংশিদার হতে আমি রাজি আছি। কিন্তু অর্দ্ধাঅর্দ্ধি নয়, লাভের এক তৃতীয়াংশ আপনার আর বাকি সব আমার—এই সর্ত্তে যদি আপনি রাজি হন তবে আমিও প্রস্তুত আছি।"

"কি, এক তৃতীয়াংশ?" বলেই মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ড অবাক্ হয়ে হাঁ করে রইলেন। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড এ সর্ত্ত ভিন্ন অন্য কিছুতেই রাজি হলো না। সে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল, যে, তার সাহায্য বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবের যতটা দরকার বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবের সাহায্য তার ততটা দরকার নাই। কিন্তু বেরেস্‌ফোর্ডও যখন এক তৃতীয়াংশ সর্ত্তে রাজি হচ্ছেন না, তখন সে বল্‌ল—"তা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আমি ভরসা করে বল্‌তে পারি, আমার গণ্ডার কি কি কর্‌তে পারে সেসব আপনি

জানতে পার্‌লে, আর ইতস্ততঃ কর্‌বেন না। তখন না হয় আপনি ভেবে চিন্তে আপনার মত দেবেন।"

একথা বল্‌তেই সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখনই গণ্ডার দেখ্‌তে যাবেন। এড্‌ওয়ার্ড বাধা দিয়ে বল্‌ল—"একটু সবুর করুন। আমার গণ্ডার অচেনা লোক বড় পছন্দ করে না। আগে আমি দেখে আসি, তার মেজাজ কেমন আছে।" বলে এড্‌ওয়ার্ড একা গ্যারেজে চলে গেল।

এখন এগ্‌বার্টকেত আগে এ ব্যাপারের কথা বলা চাই? সে রাজি না হলেত সবই পণ্ড। কিন্তু এ প্রস্তাব তার কাছে করামাত্র, সে এক হুলস্থুল ব্যাপার আরম্ভ করে দিল। গ্যারেজময় পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে আর যেখানে সেখানে মেঝেতে ধপাধপ্ মর্স সংকেত কর্‌তে লেগেছে। অনেক কষ্টে তাকে একটু ঠাণ্ডা



মর্স ক'রে 'না' বলে বাল্‌টিটা প্রায় ভেঙ্গেই ফেলেছিল।

করে, এড্‌ওয়ার্ড সঙ্কেত দেখে বুঝ্‌তে পারল, যে, তার সঙ্কেতের অর্থ—"কিছুতেই আমি সাধারণ ষ্টেজে গিয়ে অভিনয় কর্‌তে রাজি হব না। এত বড় অপমান?"

এড্‌ওয়ার্ড ভীষণ রেগে বল্‌ল—"কি সর্ব্বনাশ! এখন কি তোমার মান অপমানের কথা ভাব্‌বার সময়? মূর্খ! বুঝ্‌তে পারছনা, যে, তুমি রাজি না হলে, না খেয়ে আমাদের মর্‌তে হবে?" এড্‌ওয়ার্ড যত রাগ করে, যত বুঝায়—এগ্‌বার্টের সেই একই সঙ্কেত—কিছুতেই না। শেষবারে এমন জোরে সে মর্স ক'রে "না" বল্‌ল, যে, আর একটু হলে বাল্‌টিটাই ভেঙ্গে গিয়েছিল।

নিতান্ত নিরাশ হয়ে এড্‌ওয়ার্ড ক্যাথেলিনকে ফোন্ করে দিল তখনই আস্‌তে। আর বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবকে গিয়ে বল্‌ল—"না মশায়, গণ্ডারের মেজাজ এখন ভারি খারাপ। আপনি অনুগ্রহ করে বিকালে তিনটার সময় যদি আসেন, তখন সব ঠিক হবে।" এই বলে সে সাহেবকে এগিয়ে দিতে বাগানের দরজা পর্য্যন্ত গেল।

ঠিক এই সময়ে ক্যাথেলিন্ এসে উপস্থিত! তাঁকে দেখেই বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নমস্কার করে চলে গেলেন।

ক্যাথেলিন্ এড্‌ওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ভদ্রলোকটি কে?"

এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"আমাদের পরম উপকারী বন্ধু, এঁকে ভগবান্ পাঠিয়েছেন। এখন এগ্‌বার্টকে একথা বুঝিয়ে দিতে পারলেই আর কিছু ভাবনা থাকে না।" এই বলে ক্যাথেলিন্‌কে সমস্ত ঘটনা বল্‌ল।

শুনে ক্যাথেলিনের যা আনন্দ, তখনই তিনি গ্যারেজের দিকে চল্‌লেন। এড্‌ওয়ার্ডও তাঁর পিছনে পিছনে গেল। গ্যারেজের দরজায় গিয়ে ক্যাথেলিন্ বল্‌লেন—"তুমি থাক, শুধু আমি গিয়ে চেষ্টা করে দেখি, এগ্‌বার্টকে রাজি কর্‌তে পারি কি না।"

এড্‌ওয়ার্ড বাইরে চুপ করে বসে রইল। খানিক বাদে ক্যাথেলিন্ বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—"বাঁচা গিয়েছে বাবা! এগ্‌বার্টকে রাজি করেছি।" এড্‌ওয়ার্ডের খুবই আনন্দ হলো বটে কিন্তু তবু অবাক্ হয়ে বলল—"তোয়াজের বশ দেখ্‌ছি সবাই হয়। যাহোক্, রাজি যে হয়েছে তাই ঢের।"

ক্যাথেলিন্—"তোয়াজে রাজি হয়েছে কি? যখন ভয় দেখিয়েছি, যে, রাজি না হলে আমাদের বিয়ে ভেঙ্গে দিব—তখন সে বাগ মেনেছে।"

বিকালে তিনটার সময় বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব আবার এলেন, ক্যাথেলিন্‌ও এসে উপস্থিত হলেন। তখন এড্‌ওয়ার্ড ক্যাথেলিনের সঙ্গে সাহেবের পরিচয় করিয়ে

দিয়ে বল্‌ল—"এই মিস্ ক্যাথেলিনও গণ্ডারের অর্দ্ধেক মালিক। শুধু তাই নয়, আমি হার মেনে গেলেও ইনি গণ্ডারকে বাগাতে পারেন।"

ক্যাথেলিন্ সুন্দরী ছিলেন খুবই। বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতি, তিনি ক্রমাগত ক্যাথেলিনের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন আর একটু একটু করে তাঁর কাছে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা দেখে একটু বেয়াদবি বলেই মনে হলো, এড্‌ওয়ার্ড ত রেগে আগুন! যাহোক্, সাম্‌লিয়ে নিয়ে বল্‌ল—"মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ড! তবে চলুন, আমাদের গণ্ডার কি কি কর্‌তে পারে, আপনাকে একটু দেখিয়ে দেই। প্রায় মানুষের মত তার বুদ্ধি, তাকে আমরা মর্সকোড্ পর্য্যন্ত শিখিয়েছি।"

বেরেস্‌ফোর্ড—"মর্সকোড্ কি?"

এড্‌ওয়ার্ড—"সেই যে বিন্দুআর ড্যাস্ দিয়ে সঙ্কেতের বই—যে সঙ্কেতের সাহায্যে টেলিগ্রাফ হয়? সেই কোড্ বই একখানি আপনার হাতে দিব। আপনি গণ্ডারকে যা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, এই সঙ্কেতে সে তারই উত্তর দিবে। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন, যে, এসব ফাঁকি নয়—সত্যি কথাই বল্‌ছি। কিন্তু আপনাকে একটি বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি—গণ্ডারটা মিস্ ক্যাথেলিনের ভারি ভক্ত, তাঁকে বড্ড ভালবাসে। কেউ মিস্ ক্যাথেলিনের বেশী কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, তার ভারি হিংসা হয়, আর তখন কিন্তু তার জ্ঞান থাকে না। আমাদের গণ্ডারের নাম দিয়েছি এগ্‌বার্ট।"

বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবের মুখ দেখে মনে হলো, যেন সব কথা তিনি বিশ্বাস কর্‌ছেন না। যাহোক্ তিনজনে গিয়ে গ্যারেজে ঢুক্‌লেন। কোণে চুপ করে এগ্‌বার্ট বসে আছে। এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট। উঠে দাঁড়াও, এই ভদ্রলোককে নমস্কার কর।" এগ্‌বার্টের গ্রাহ্যই নাই, যেন ভদ্রলোকটিকে সে নিতান্ত অপছন্দ করেছে। তখন ক্যাথেলিন্ কর্কশ স্বরে ডাক্‌লেন—"এগ্‌বার্ট।" অমনি, যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়, সে উঠে সাহেবকে নমস্কার কর্‌ল।

বাঃ, কি চমৎকার! বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব অবাক্ হয়ে মাথার টুপি তুলে প্রতিনমস্কার কর্‌লেন। আর বল্‌লেন—"তোমার সঙ্গে পরিচয় করে, আমি ভারি খুসী হয়েছি।"

তারপর এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাকে প্রশ্ন করুন।"

মিনিট কুড়ি পরে সকলে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবের মুখে হাসি আর ধরে না। তিনি আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এগ্‌বার্ট তার পরীক্ষায় খুব সম্মানের সহিত পাশ হয়েছে।

এরপর আর সাহেব বিশেষ কোন আপত্তি কর্‌লেন না, এড্‌ওয়ার্ডের প্রস্তাবেই রাজি হলেন। কিন্তু বল্‌লেন, যে, "এ কাজের ব্যবস্থা যা কর্‌তে হয়, সব আমি কর্‌ব। আর ষ্টেজে মিস্ ক্যাথেলিন্ থাক্‌লেই যথেষ্ট, আপনার উপস্থিত না থাক্‌লেও চল্‌বে।" এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"তা কি করে হবে, মিস্ ক্যাথেলিন্ ত আর যাচ্ছেন না?"



এগ্‌বার্ট শিং বাগিয়ে বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবকে

অম্‌নি ক্যাথেলিন্ বলে উঠ্‌লেন—"কেন যাব না, নিশ্চয়ই যাব। মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ড! আপনার কাগজ পত্র এনে একটা লেখাপড়া করুন, আমি সই কর্‌ছি।"

বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব তাঁর কাগজপত্র বাড়ীর ভিতরে রেখে এসেছিলেন, তখনই তা আন্‌তে গেলেন।

এদিকে এড্‌ওয়ার্ড ত অবাক্! ক্যাথেলিন্ যাবে শুনে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"ক্যাথেলিন্! তুমি যাবে কি করে বল্‌লে?"

ক্যাথেলিন্—"যাব বলেই বলেছি। সেণ্ডারষ্টনে একদিনও থাক্‌বার আমার আমার আর ইচ্ছা নাই। তোমাদের বাড়ী ঘন ঘন যাতায়াত কর্‌ছি, লোকে কত কি বল্‌ছে। মা পর্য্যন্ত এখানে আস্‌তে বারণ করেছেন। কেউ ত আর জানে না, ব্যাপারখানা কেমন গুরুতর? তাই ভেবেছি, কিছু দিন অন্যত্র গিয়ে থেকে আস্‌ব।"

ততক্ষণে বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব তিন বছরের কন্‌ট্রাক্‌ট্ লিখে, কাগজপত্র নিয়ে এসে উপস্থিত। এড্‌ওয়ার্ড ক্যাথেলিন্ দুজনেই তাতে সই কর্‌লেন। তখন বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব মনের আনন্দে, ক্যাথেলিনের হাত চাপ্‌ড়িয়ে, যেন কত দিনের পরিচিত বন্ধু, খুব উৎসাহ করে বল্‌ছেন—"মিস্ ক্যাথেলিন! আপনি যখন পোষাক



তাড়া করেছে।

টোষাক পরে, গণ্ডারের পিঠে চড়ে প্রথম ষ্টেজে ঢুক্‌বেন, তখন কি এক হুলস্থুল ব্যাপার গেলে যাবে। আর তখন আপনাকে কি——

বাকি কথাগুলি সাহেব শেষ কর্‌তে পার্‌লেন না। মহা উৎসাহে সকলে কথাবার্ত্তায় মত্ত, গ্যারেজের দরজা যে ফাঁক হয়ে ছিল, সেটা কারও নজরে পড়েনি। বাইরে তার নিজের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, সেটা শুন্‌তে এগ্‌বার্টের কুতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সে শিং দিয়ে দরজাটা আরো ফাঁক করেছে। করেই, যেই দেখেছে ভদ্রলোকটি তার প্রিয় ক্যাথেলিনের হাত চাপ্‌ড়িয়ে কথা বল্‌ছে, তখন আর যায় কোথা! রেগে আগুন হয়ে, এক লাফে বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবকে শিং বাগিয়ে করেছে তাড়া!!

মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ড ব্যাপার দেখে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্! ভাগ্যিস্ তখন তাঁর বুদ্ধি ঠিক ছিল, তাই সোজা ছুটলেন না—এঁকে বেঁকে, কোণায় কাণায় ছুটতে লাগ্‌লেন আর গণ্ডারও তাঁর পিছনে কিন্তু তাঁকে ধর্‌তে পার্‌ছে না। এড্‌ওয়ার্ড যে চীৎকার করে বল্‌ছে—"এগ্‌বার্ট! শীগ্‌গির থাম" সেটা সে গ্রাহ্যই কর্‌ল না। কি সর্ব্বনাশ! বেচারাকে বুঝিবা মেরেই ফেলে—তাহলে ত আবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত হবে?

যাহোক্ খানিক পরে, সারাটা বাড়ী ঘুরে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরেস্‌ফোর্ড আবার সেখানেই এসে উপস্থিত! এসেই উঁচু একটা কার্ণিসের উপর চড়ে বসেছেন! একটু পরেই গণ্ডারও ঘঁৎ ঘঁৎ কর্‌তে কর্‌তে এসে হাজির! তখন এড্‌ওয়ার্ড ভীষণ চীৎকার করে ধমক দিয়ে বল্‌ল—"এগ্‌বার্ট! শীগ্‌গির গ্যারেজের ভিতরে যাও।" ঈশ্বর ইচ্ছায় এবারে এগ্‌বার্ট কথা শুনে গ্যারেজের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

এই দারুণ দুর্ঘটনায়ও কিন্তু মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ডের উৎসাহ কমেনি। বিপদ কেটে গিয়েছে দেখে, তিনি জানালার কার্ণিসের উপর থেকে নেমে এসে বল্‌লেন—"খাসা হবে, খাসা হবে! মিষ্টার এড্‌ওয়ার্ড! আমি ভেবেছিলাম, ষ্টেজে আপনার উপস্থিত থাক্‌বার দরকার নাই। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—উপস্থিত ত থাক্‌বেনই, অধিকন্তু মিস্ ব্র্যাথেলিন্ ষ্টেজে আস্‌তেই তাঁকে আপনি আদর করবেন, আর গণ্ডারও আপনাকে ষ্টেজময় তাড়া করে বেড়াবে—বাঃ, তাহলে কি মজাটাই যে হবে!!

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

প্রতিদ্বন্দী

আয়র্লণ্ডের সকলের বড় রাজার প্রধান ডাক্তার ছিলেন ডারমট্। এরিণ সহরে প্রাসাদের মত তাঁর মস্ত বাড়ী ছিল "টারাপ্রাসাদ"। অনেক লোক তাঁর বাড়ীতে থেকে তাঁর কাছে ডাক্তারী শিখ্‌ত। কিন্তু এত লোক থাকা সত্ত্বেও ডার্‌মট্ সঙ্গীহীন বোধ কর্‌তেন। ডার্‌মট্ অল্প বয়সেই এক মেয়ে ডাক্তারকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর স্ত্রীও অনেক কাজে তাঁকে সাহায্য কর্‌তেন। একদিন এক ঝড়ের রাত্রে —ডার্‌মট্ তখন অন্য জায়গায় কাজে গিয়েছিলেন—এমন সময় একটি রুগ্ন শিশুকে দেখ্‌বার জন্য, তাঁর স্ত্রীকে একলা সমুদ্র পার হয়ে একটা দ্বীপে যেতে হয়েছিল; কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি, সমুদ্রে ঝড়ে পড়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

এই দুর্ঘটনার পর ডার্‌মটের মন ভেঙ্গে গেল। তখন তাঁর ব্যবসাই হলো স্ত্রী পুত্র পরিবার। একাকী ঘরে বসে ডাক্তারী বই পড়ে সময় কাটান, ছাত্রদের নিয়ে রোগীর বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান—তবু মনটা যেন খালি খালি লাগে। তাঁর এইরূপ উদাস ভাবের মধ্যেও, ডাক্তারীতে তাঁর মান ইজ্জৎ কতখানি এবং তা কিরূপ মূল্যবান্ সে কথাটি তাঁর মনে বেশ সজাগ ছিল। তাই "কোণাল" নামে এক নবীন ডাক্তার এসে যখন সেখানে তার পশার খুব জাঁকিয়ে তুল্‌ল এবং ক্রমে তাঁর রোগী-দের দখল কর্‌তে লাগ্‌ল, তখন ডার্‌মটের আর সে উদাসীন ভাব রইল না। ওষুধ পত্র জান্‌তেন খুবই ভাল, চিকিৎসাতেও কোণালের চাইতে ডার্‌মট্ অনেক নিপুণ ছিলেন। কিন্তু কোণাল কাটা ঘা সেলাই করা, ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগান প্রভৃতি বিষয়ে ডার্‌মটের চাইতে সিদ্ধহস্ত ছিল। আর তখনকার যুদ্ধ বিগ্রহের দিনে, অসুখের চেয়ে এই সবের চিকিৎসারই বেশী দরকার হ'ত বলে, লোকে কোণালকেই খুব বেশী ডাকৃত এবং তারই যে খুব নাম হয়ে পড়েছিল, সেটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ক্রমে হিংসার জ্বালায় অস্থির হয়ে, ডারমট্ সেখান থেকে চলে গিয়ে, বনের ভিতর নির্জ্জন এক হ্রদের ধারে একটা বাড়ীতে থাক্‌তে লাগ্‌লেন। এক মাস বেশ ভালই কেটে গেল। তারপর একদিন ডার্‌মট্ বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌লেন যে, বনের পাখীরা শুধু এক রকম বুনো জামের লাল টুকটুকে শাঁস খায় আর অন্য সব বিষাক্ত ফলগুলি বেছে ফেলে দেয়। এই দেখে তাঁর মনে এক দুষ্ট মতলব হলো। তিনি ভাবলেন যে, "আমি ত সব গাছ গাছড়ার দোষ গুণ দুই জানি, তবে কোণালকে কোন বিষাক্ত ওষুধ খাইয়ে কেন মেরে ফেলি না?" এই ভেবে তিনি তাঁর ওষুধের থলিটি সমস্ত বিষাক্ত গাছ গাছড়া আর ফলে ভর্ত্তি করে, বাড়ী ফিরে চল্‌লেন। বাড়ীর কাছে এসেছেন, এমন সময় তাঁর একজন বিশ্বাসী অনুচর দৌড়ে এসে বল্‌ল, "প্রভু, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন? কেন আমাদের ছেড়ে চলে এলেন? আপনার ছাত্রেরা আর শিক্ষা পায় না, আপনার রোগী-দের কেউ দেখে না।" ডার্‌মট্ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, "কেন? তাদের কোণালই ত আছে?"

সে উত্তর কর্‌ল, "তার ভয়ানক অসুখ করেছে। একেবারে মৃত্যুশয্যায়। শীতকালে তার বড় কাশী হয়, তাতেই তাকে কাবু করে ফেলেছে।"

ডার্‌মট্ একটু ঠাট্টাচ্ছলে বল্‌লেন, "কেন! সে ত ছুরি চালাতে খুবই ওস্তাদ; তাকে বল না নিজেই নিজের চিকিৎসা করুক, ছুরি চালিয়ে কাশীটাকে সারাক্ করে দিক্। কোথায় আছে সে?"

অনুচরটি বল্‌ল, "সে ছাত্রনিবাসে আছে। ডাক্তার "ব্রুই" তাকে একেবারে নিজের ছেলের মতন যত্ন করে দেখ্‌ছেন।"

"আমি তাকে নিশ্চয়ই গিয়ে দেখ্‌ব"—এই বলে ডার্‌মট্ তাড়াতাড়ি সে দিকে চল্‌লেন। কোণালের ঘরের কাছে এসে শুন্‌তে পেলেন, ভেতরে অনেক লোক হাস্‌ছে আর ভীষণ গোলমাল কর্‌ছে। কিন্তু সব গোলমালের উপর কোণালের কাশীর শব্দ শুন্‌তে পেলেন। তিনি ঘরে ঢুকে দেখ্‌লেন ঘরটি লোকে পূর্ণ। এক কোণে একটা সোফার উপর, অস্থিচর্ম্মসার কোণাল চুপ করে শুয়ে আছে আর অন্য লোকেরা তাকে ঘিরে হট্টগোল কর্‌ছে। এই ব্যাপার দেখে, তিনি ভয়ানক রেগে সবাইকে ঘর থেকে বা'র করে দিয়ে ডাক্তার ব্রুইকে বল্‌লেন—"আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, তুমি ডাক্তার মানুষ হয়ে রোগীর ঘরে এই রকম হট্টগোল কর্‌তে কি বলে অনুমতি দিলে?"

ব্রুই বল্‌লেন, "আমরা রোগীকে অন্যমনস্ক করে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম।"

ডার্‌মট্ ডাক্তার ব্রুইকে খুব বকুনি দিলেন। তারপর জানালা সব খুলে, পর্দা সরিয়ে ঘরে বাতাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে, কোণালের কাছে গিয়ে তার কপালে হাত দিলেন। ডাক্তার ব্রুই তখনও কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ডার্‌মট্ তাঁকে বল্‌লেন একজন চাকরকে ডেকে দিতে আর একটা খাটিয়া নিয়ে আস্‌তে, কোণালকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন বলে; তা'হলে চিকিৎসা কর্‌তে সুবিধা হবে। ডাক্তার ব্রুই কিন্তু বকুনি খেয়ে বড় চটে ছিলেন, তাই এই কথা শুনে বল্‌লেন—"না, না, কোণাল তার প্রতিদ্বন্দীর কাছে থাকার চেয়ে, বন্ধুদের কাছে বেশী ভাল থাক্‌বে।"

এমন সময় হঠাৎ কোণাল ডার্‌মটের হাত দুখানি ধরে বলে উঠ্‌ল, "না আমি এঁর সঙ্গেই যাব, কারণ, তিনি যখনই ঘরে ঢুকেছেন তখনই আমি আমার বল ভরসা সব ফিরিয়ে পেয়েছি।" ডার্‌মটের হাতে তখনও কিন্তু সেই বিষাক্ত গাছ গাছড়ার থলিটি ছিল।

সেই দিন থেকে কোণাল ডার্‌মটের কাছেই থাক্‌তে লাগ্‌ল। ডার্‌মট্ কোণালকে পাইন্ বনের ভেতর একটা নদীর ধারে সুন্দর বাড়ীতে রেখেছিলেন আর খুব করে

ঘি, মাখন, মধু খেতে দিতেন। মাসের পর মাস যেতে লাগ্‌ল, কোণালও ক্রমে সুস্থ সবল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। গ্রীষ্মকালে কোণাল একেবারে ভাল হয়ে, ডার্‌মটের অতিথিরূপে তাঁর নিজের বাড়ীতে এসে উপস্থিত। এখন আর ডার্‌মট্ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত দেখেন না। বেশ বন্ধুভাবেই দুজনে আছেন। একদিন ডার্‌মট্ খানিকক্ষণ কোণালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন "একি! কোণাল, তোমার মুখের সঙ্গে দেখ্‌ছি আমার কোন পরিচিত লোকের মুখের সাদৃশ্য আছে। তোমার অসুখের সময় আমি এটা খুব লক্ষ্য করেছিলাম।" কোণাল শুধু "দেখ্‌বেন?" এই কথাটি বলে, একটা চক্‌চকে আয়না এনে ডার্‌মটের সাম্‌নে ধর্‌ল। আয়নাতে দুজনেরই ছায়া পড়্‌ল। একজন সুপুরুষ যুবা, আর একজনের মুখে বার্দ্ধক্যের ছায়া। কিন্তু দুজনেরই ডানদিকের গালে একটা তিল রয়েছে আর মুখের সাদৃশ্য খুব বেশী রকমের।

ডার্‌মট্ আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি করে এ রকম হ'ল? তোমার মা বাবা কে? কোথায় জন্মেছ তুমি?"

তখন কোণাল আস্তে আস্তে বল্‌ল,"আমি সমুদ্রে জন্মিয়েছি। জন্মের পর সমুদ্রে নৌকার মধ্যে মায়ের মৃত্যু হয়, তারপর ঢেউএ নৌকা তীরে গিয়ে লাগ্‌ল। ওয়েল্‌স্ (welsh) এর সন্ন্যাসীরা আমাকে আমার মৃত মায়ের কোল থেকে তুলে নে'ন্। মায়ের গায়ে খুব দামী গহনা ছিল, তাই দেখে তাঁরা তাঁকে বড় ঘরের মেয়ে বলে বুঝ্‌তে পারেন। আর তাঁর পাশে যে ওষুধের ব্যাগ্‌টি ছিল, তা দেখে সন্ন্যাসীরা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, আমার মা মেয়ে ডাক্তার। তাই আমাকেও তাঁরা ডাক্তারী পড়ান। মায়ের সেই ওষুধের ব্যাগটা তাঁর চিহ্নস্বরূপ সর্ব্বদা আমার কাছেই থাকে।"

ডার্‌মট্ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লেন—"কই সে ব্যাগটা? আমাকে দেখাও ত?" ব্যাগটা কোণালের হাত থেকে নিয়েই তিনি চিন্‌তে পার্‌লেন। তাঁর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল। ডার্‌মট্ ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"আমিই তোমার মাকে এই ব্যাগটা দিয়েছিলাম। তখন আমি রাজার সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলাম। সেই সময় সমুদ্রে এক দ্বীপে একটি ছোট ছেলের প্লেগ হওয়াতে, তোমার মাকে বাধ্য হয়ে সেখানে যেতে হয়। ভীষণ ঝড় সেদিন, কোন মাঝিই নৌকা চালাতে রাজি হয়নি। তোমার মা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, ছেলেটিকে রক্ষা কর্‌বার জন্য, সেই ভীষণ দুর্য্যোগে নিজেই নৌকা বেয়ে বেরিয়েছিলেন। যাক্, সন্ন্যাসীরা

তোমাকে ডাক্তারী পড়িয়ে খুব ভালই করেছেন। কারণ তোমার মা বাবা, দুজনেরই এই ব্যবসা।"

এইরূপে হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে পিতা পুত্রের মিলন হ'য়ে গেল। আর সেদিন থেকে, দুজনে মহা উৎসাহে চিকিৎসা-কার্য্যে মন প্রাণ দিয়ে লেগে গেলেন।

এখনও গল্প শোনা যায়, কোণাল কি অদ্ভুত চিকিৎসা কর্‌তেন। কিন্তু কোণাল নিজে পিতার সুখ্যাতিটাই বেশী কর্‌তেন। বল্‌তেন—"আমার চিকিৎসা ত কিছুই নয়। যে ব্যারাম চোখে দেখা যায়, হাতে ধর্‌তে পারা যায় তারই চিকিৎসা আমি করি; কিন্তু যে ব্যাধি অদৃশ্য থেকে মানুষের চোখে ধুলা দেয়, মানুষকে কাবু করে—বাবা সেই ব্যাধি আরাম করেন—তাঁর চিকিৎসাই প্রকৃত চিকিৎসা।

শ্রীইলা রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ইতরপ্রাণীর বুদ্ধি

মাছেদের শ্রবণ-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি সবই আছে। ছিপ দিয়ে যারা মাছ ধরে, তারা অনেক সময় টোপের সঙ্গে সুগন্ধ মিশিয়ে দেয়, সে টোপ মাছেরা খুব পছন্দ করে। মেথি, একাঙ্গী, তাম্বুল প্রভৃতি ভেজে গুঁড়া করে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে পুকুরের কোন জায়গায় ফেল্‌লে—তার গন্ধে অনেক মাছ এসে সেখানে জড় হয়। অনেক সময় দেখা যায়, খুব চালাক মাছ হলে, যারা টোপ খেতে গিয়ে অনেকবার বড়শির খোঁচা খেয়েছে, তারা করে কি—বড়শির দিকে পিছন ফিরে ল্যাজের ডগা দিয়ে টোপটাতে নাড়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরে ফাতাটিও নড়ে উঠে। শিকারী, মাছে টোপ খাচ্ছে ভেবে যাই টানে, অমনি টোপটি মাটিতে পড়ে যায়, আর মাছ মজা করে সেটি খায়। এসব পরীক্ষিত সত্য কথা।

মাছের স্বভাব-জাত বুদ্ধি (Instinct) অতি অদ্ভুত। হেরিং, সামন্, মেকারেল্ প্রভৃতি মাছ সমুদ্রের জলে থাকে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ঠিক তাদের ডিম পাড়বার সময়টি এলে, তারা করে কি, সমুদ্রের লোণা জল ছেড়ে কোন পরিষ্কার জলের জায়গায় গিয়ে, ডিম পাড়ে—কারণ লোণা জলে তাদের ডিম ফোটে না।

শুন্‌তে একটু অদ্ভুত হলেও, এটা সত্যি কথা যে—পাখী যেমন তার বাসা বানায়, কোন কোন মাছও তেম্‌নি জলের নীচে বাসা তৈরী করে সেখানে বাস করে, ডিম পাড়ে।

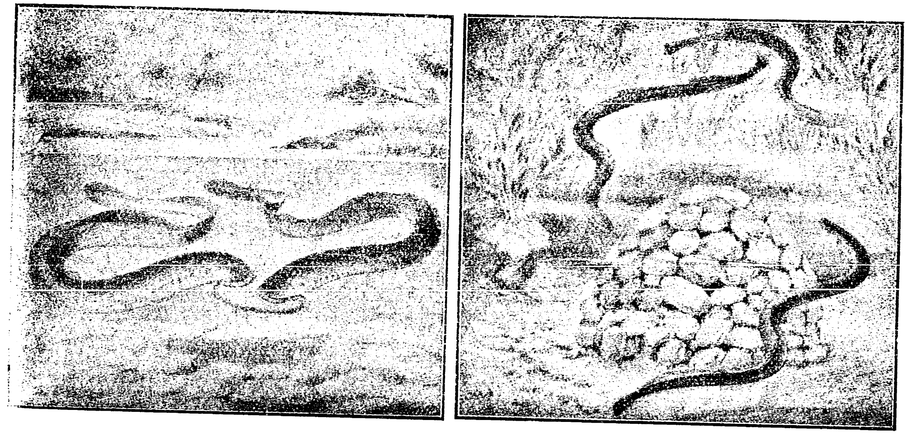

মাছের বাসা তৈয়ারী—দুটি মাছ পরস্পরকে সাহায্য ক'রে বাসা তৈয়ারী কর্‌ছে।

ষ্টিক্‌ল্‌ব্যাক্ (আমাদের শোল মাছ) নামে এক জাতের মাছ আছে, তারা প্রতি বৎসর জুন মাসের প্রথমে জলের নীচে, খুব দেখে শুনে একটা ভাল জায়গা বেছে নেয়। সেখানে কাদামাটিতে নিজের থুত্‌নী দিয়ে ঠিক তার শরীরের মাপে একটা গর্ত্ত করে। তারপর সেখানে গড়াগড়ী দিয়ে গর্ত্তটাকে বেশ বড় ক'রে নিয়ে, তার চার ধারে মাটির দেয়াল বানিয়ে দেয়। তারপর জলীয় গাছের শিকড় এনে, একটা একটা করে সেগুলোকে থুত্‌নী দিয়ে মাটিতে পোঁতে। শিকড়গুলি একটু মজবুত এবং খাড়া হয়ে থাকা চাই, তাই বালি এনে তার চার ধারে স্তূপের মত করে রাখে। সেই বালির স্তূপের উপর নিজের গা ঘস্‌তে থাকে—তাতে হয় কি, তার শরীর থেকে আঠার মত এক রকম জিনিষ বেরিয়ে, বালির স্তূপের উপর প'ড়ে যেন সিমেণ্ট্ করে দেয়, তাইতে স্তূপ শক্ত হয়। বাড়ীর ভিটা আর দেয়াল এমন সুন্দর ক'রে করে,

যে, ভিতরে ঢুক্‌বার জন্য দুধারে দুটি দরজাও থাকে। বাড়ীটা ঠিক দুজন থাক্‌বার মত বড় করে—আবার আগাছা দিয়ে তার একটা ছাতও বানায়।

পাখীদের মধ্যে, বিশেষ ভাবে শিকারী পাখীদের দৃষ্টি খুব প্রখর। শকুন কত উঁচুতে থাকে তা সকলেই দেখেছ। গ্রামে দেখেছি, মরা গরু, মহিষ মাঠে ফেলে দিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথা হতে পালে পালে শকুন এসে উপস্থিত হয়। চিল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে এত উঁচুতে, যে, হয়ত চোখে দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই অদৃশ্য চিল, জলের উপর মরা মাছটি ভাস্‌তে থাক্‌লে কিংবা মাঠে ইঁদুর তার গর্ত্ত থেকে বেরুলে সেই মুহূর্ত্তে তা দেখ্‌তে পায়।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মেরু আবিষ্কার কর্‌তে গিয়ে, সার্ জন্ রস্, ওয়েলিংটন্ সাউণ্ড থেকে একটা বার্ত্তাবাহক পায়রা ছেড়েছিলেন। সেই পায়রাটি সাত দিন পরে, স্কট্‌লণ্ডে আয়ারসায়ারে তার নিজের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের ভীষণ ঢেউএর উপর দিয়ে, ক্রমাগত দুই হাজার মাইল পথ পায়রাটাকে উড়্‌তে হয়েছিল।

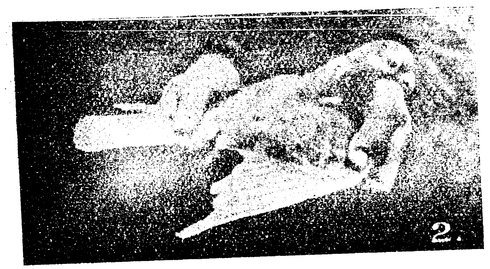

বার্ত্তাবাহক পায়রা।

নাবিকেরা সমুদ্রে দিক্‌দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে চলা ফেরা করে। কিন্তু কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে এই পায়রা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের মত বিশাল সমুদ্রে, নাবিকদের চাইতেও ভাল করে দিক্ ঠিক কর্‌তে পারে—সেটা প্রাণীতত্ত্ব-বিদেরাও বল্‌তে পারে না।

পাখীরা যে গান করে, সে শক্তিটা ভগবান্ তাদের দিয়ে দিয়েছেন, না কি তারা শুনে শুনে নকল করে গান গায়—এ সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। একটি নাইটিংগেল পাখীকে শৈশব থেকে একেবারে সঙ্গীশূন্য করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তবু বড় হয়ে সে ঠিক তার স্বজাতীর মত সুন্দর গান কর্‌ত। আবার একটি চড়াই পাখীকে গোল্ড্‌ফিঞ্চ এবং লিনেট্ পাখীর সঙ্গে এক খাঁচায় রেখে দেখা গিয়েছে, যে, চড়াই ও কিছু দিন পরে তাদের মত মিষ্টি গান গায়। একটি শিশু-রবিন্ পাখীও

নাইটিংগেলের সঙ্গে এক খাঁচায় থেকে, শেষে প্রায় নাইটিংগেলের মতই মিষ্টি গান কর্‌ত।

উইএর ঢিপি কেটে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, কি অদ্ভুত তাদের বাড়ী বানাবার কায়দা—বড় বড় ইন্‌জিনিয়ারও সে কৌশলের কাছে পরাজয় মানে।

ইঁদুরের আশ্চর্য্য বুদ্ধি এবং চালাকির সম্বন্ধে অনেক গল্প তোমরা পড়েছ। খুব উঁচুতে ডিম রাখা হয়েছে, সে ডিমও ইঁদুর অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে, কত রকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, নিজের বাড়ীতে বয়ে নিয়ে এসেছে—এরূপ ঘটনাও অনেক শুনা যায়।

একবার দেখা গিয়েছিল, দুটো ইঁদুর মিলে তাদের মুখ ও সাম্‌নের দুটি পায়ের সাহায্যে ডিম চুরি কর্‌ছে। আর একবার কতগুলি ইঁদুর লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে—একজন আর একজনেরহাতে, সে পরের জনের হাতে, তারপরের জন তারপরের জনের হাতে—পাড়াগাঁয়ে আগুন লাগ্‌লে লোকে যেমন করে পরস্পর জলের বাল্‌টি চালান করে—ঠিক তেমনি করে তারা রাশি রাশি ডিম চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

চিনেগল্প

একজন চীন দেশের লোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল;—সে এক মজার শাস্তি! লোকটার গলায় একটা কাঠের মোটা চাক্‌তি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এমন ভাবে যেন সেটা খুলে ফেলা না যায়। একদিন সে লোকটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার কতগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হ'ল। তারা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"ওহে বন্ধু, তুমি কি করেছিলে যে তোমার এই শাস্তি!"

সে বল্‌লে—"আর ভাই, রাস্তা থেকে একটা দড়ি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম বলেই এই শাস্তি!"

বন্ধুরা এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল—"কি ভীষণ! একটা সামান্য দড়ি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলে ব'লে এত বড় ভীষণ শাস্তি! কাঠের হাঁসুলী গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে!"

সে বল্‌লে—"আর ভাই, বল কেন—দড়িটার শেষ দিকে ঘটনাক্রমে একটা গরু বাঁধা ছিল—তাতেই এই শাস্তি!

শ্রীসুধীরঞ্জন খাস্তগীর।

নাচের গুণ

"রাজসরকারের জন্য একজন বিশ্বাসী খাজাঞ্চির দরকার"—এই ব'লে সহরের রাজপথে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হলো। দলে দলে লোক কাজ পাবার আশায় রাজবাড়ীতে হাজির। রাজামশাই তো ঠিকই কর্‌তে পার্‌লেন না, কোন্ লোকটিকে রাখ্‌বেন।

তখন মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে চুপি চুপি বল্‌লেন, "কিছু চিন্তা নেই মহারাজ! আমি এখনই উপযুক্ত লোকটিকে বেছে বের কর্‌ব। যে নাচ্‌তে পার্‌বে সেই এ কাজ কর্‌বার উপযুক্ত লোক।"

রাজামশাই ভাব্‌লেন, "এ আবার কি রকম কথা? খাজাঞ্চির নাচ দিয়ে কি দরকার? মন্ত্রীমশাই কি পাগল হ'লেন নাকি?" তবুও তিনি মুখে কিছু বল্‌লেন না, কারণ মন্ত্রীমশাই বহুকালের পুরানো লোক, অভিজ্ঞতা অনেক তাঁর।

মন্ত্রীমশাই সকলকে ডেকে বল্‌লেন, "মশায়রা! আপনারা এই অন্ধকার গলির ভিতর দিয়ে, একে একে রাজসভায় গিয়ে হাজির হবেন। সাবধানে চল্‌বেন; পথে অনেক জিনিষ মাটিতে ছড়ানো রয়েছে।"

সকলে সেই অন্ধকার গলি দিয়ে রাজসভায় এলে পর, মন্ত্রীমশাই একে একে সকলকেই নাচ্‌তে বল্‌লেন কিন্তু একজন ছাড়া কেউই নাচ্‌তে রাজি হ'লো না। তখন মন্ত্রীমশাই বল্‌লেন, "এই লোকটিই আমাদের খাজাঞ্চি হওয়ার উপযুক্ত। যে অন্ধকার গলি দিয়ে এঁরা এসেছেন, তার মধ্যে অনেক সোণা রূপো ছড়ানো ছিল। অন্য সকলে নিজেদের পকেটের মধ্যে ঐ সব সোণা রূপো ঠেসে ভ'রে নিয়েছে; কাজেই নাচ্‌তে গেলে ঐ সবের ঝন্ ঝন্ আওয়াজে ধরা পড়্‌বার ভয়ে আর কেউ নাচ্‌তে রাজি হয়নি। এঁর পকেটে কিছু নাই, কাজেই নাচ্‌তেও কোন আপত্তি হয়নি এঁর।"

এই কথা ব'লে যার-যার পকেট থেকে সোণা রূপো বের ক'রে নিয়ে, অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে অন্য সকলকে বিদায় দেওয়া হ'লো; আর যিনি নেচেছিলেন তাঁকেই দেওয়া হ'লো খাজাঞ্চির পদ।



সুকুমার রায়চৌধুরী
(বিভিন্ন বয়সে)

ক্রমিক সং
গ্রন্থ সং

খেলাধূলা



খোলা বাতাসে সকলে মিলে খেলা ধূলা কর্‌লে মনে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি শরীরের আর মনের উন্নতিও হয়। তোমাদের মধ্যে যারা স্কুলে পড় তাদের অনেকেই হয়তো স্কুলের খেলার (Sports) প্রতিযোগিতায় যোগ দাও। সেই সব প্রতিযোগিতায় কি রকম আনন্দ, কি রকম উৎসাহ, কি রকম রেষারেষি হয় তা' তোমরা অনেকেই জান। মেয়েদের জন্যও আজকাল অনেক খেলার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এই যে ছবিটি দেখ্‌ছ, এটা ছোট মেয়েদের দৌড়ের প্রতিযোগিতার ছবি। সকলেরই মুখে কত উৎসাহ!

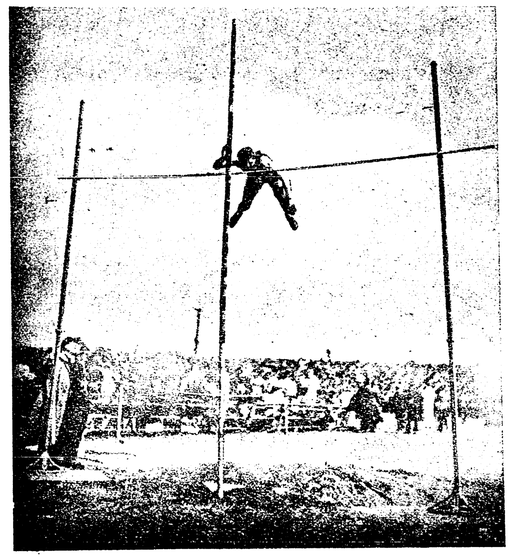

এবার আরেকটি ছবি দেখ ;— এটি হচ্ছে উঁচু-লাফের ছবি। একটি লোক একটা লম্বা বাঁশের সাহায্যে কত উঁচুতে লাফ দিয়েছে একবার দেখ! পাশে আরেকটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে তুলনা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে লোকটি কত উঁচু লাফিয়েছে। 'তাঁতিয়া ভীল' নামে আমাদের দেশে একটি প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল, সে নাকি ঐ রকম বাঁশের সাহায্যে একতলা বাড়ীর ছাতে উঠে যেত আবার বাঁশের সাহায্যে অনায়াসে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ুত।

শেষ ছবিটি একবার দেখ। একটি লোক কেমন লাফ দিয়েছে! বাহাদুর বটে!

এবার এই পর্য্যন্ত! আগামী বারে আরো কয়েকটি ভাল ভাল খেলাধুলার ছবি দেওয়া হবে।

দুখিয়ার সুখ

জঙ্গলটা এককালে খুব গভীর ছিল। আজকাল অনেক বড় বড় গাছ কাটা হয়ে যাওয়াতে, একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে। তা ছাড়া সর্ব্বদাই শিকারীর যাতায়াত, তাই বড় বড় জন্তুরা সে বন ছেড়ে আরও গভীর বনে পালিয়েছে। কিছু দিন থেকে কাঠুরেদের মুখে শোনা যাচ্ছে, এক দল ভাল্লুক সেখানে এসেছে বলে তাই দুখিয়ার সর্দ্দার দলবলে বনে ঢুকেছে। কিন্তু সারাদিন ঘুরে ঘুরেও ভাল্লুকের দেখা পায়নি, কেবল এক পাল হরিণের পিছু ছুটে তারা দুটো হরিণ মেরেছে, আর গোটা দশ বন-মোরগ ও জংলি হাঁস। সন্ধ্যার আগে তারা একটা ঝরণার ধারে এসে বিশ্রাম করতে বস্‌ল। সেখানে কাঠ জ্বেলে রান্নার বন্দোবস্ত হ'তে লাগ্‌ল, খুঁটি পুঁতে চামড়ার তাঁবু খাটান হতে লাগ্‌ল, কেউ আবার ধুনি জ্বালাবার জন্য কাঠের বোঝা জড় করতে ব্যস্ত। তাদের সঙ্গে এক বুড়ো ব্যাধও আছে, তার একটা পোষা বাজ পাখী তিনটা ঘুঘু শিকার করেছে। সর্দ্দার গিয়ে ঝরণার ধারে বস্‌তে তার সঙ্গে জংলা দুখিয়া বুড়ো ব্যাধ এবং আরও দুই চারজন গিয়ে বস্‌ল। বুড়ো ব্যাধ বল্‌ল "নদীর ওপারে বন খুব ভারি বন। ওখানে বাঘ ভাল্লুক খুঁজতে হয় না ঢের ঢের আছে।"

সর্দ্দার—"আর কি শিকার আছে?"

বুড়ো—"আর ছোট ছোট জন্তু মেলা আছে। মাঝে মাঝে হাতীর পালও আসে।"

সর্দ্দার—"কাল তবে ও বনে যেতে হবে।" অমনি জংলা বলে উঠ্‌ল "তা হলে দুখিয়া এইখান থেকে বাড়ী ফির্‌বে। তার কথা শেষ হ'তে না হ'তে পিছনে খস্ খস্ শব্দ শুনে সবাই চেয়ে দেখ্‌ল, একটা মস্ত বড় বুনো বরাহ ছুটে আস্‌ছে। তাদের দু এক জনের হাতে মাত্র তীর ধনুক, তাছাড়া সকলেই কেমন থতমত খেয়ে গেল। বরাহটা একেবারে সোজা সর্দ্দারের দিকে দৌড়েছে। জংলা সর্দ্দারের পাশেই বসেছিল, বরাহ দেখে সে একেবারে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঝরণার জলে পড়ল। ব্যাধের হাতে একটা লাঠি ছিল, সে সেটা ছুঁড়ে মার্‌ল কিন্তু বরাহের গায়ে লাঠি

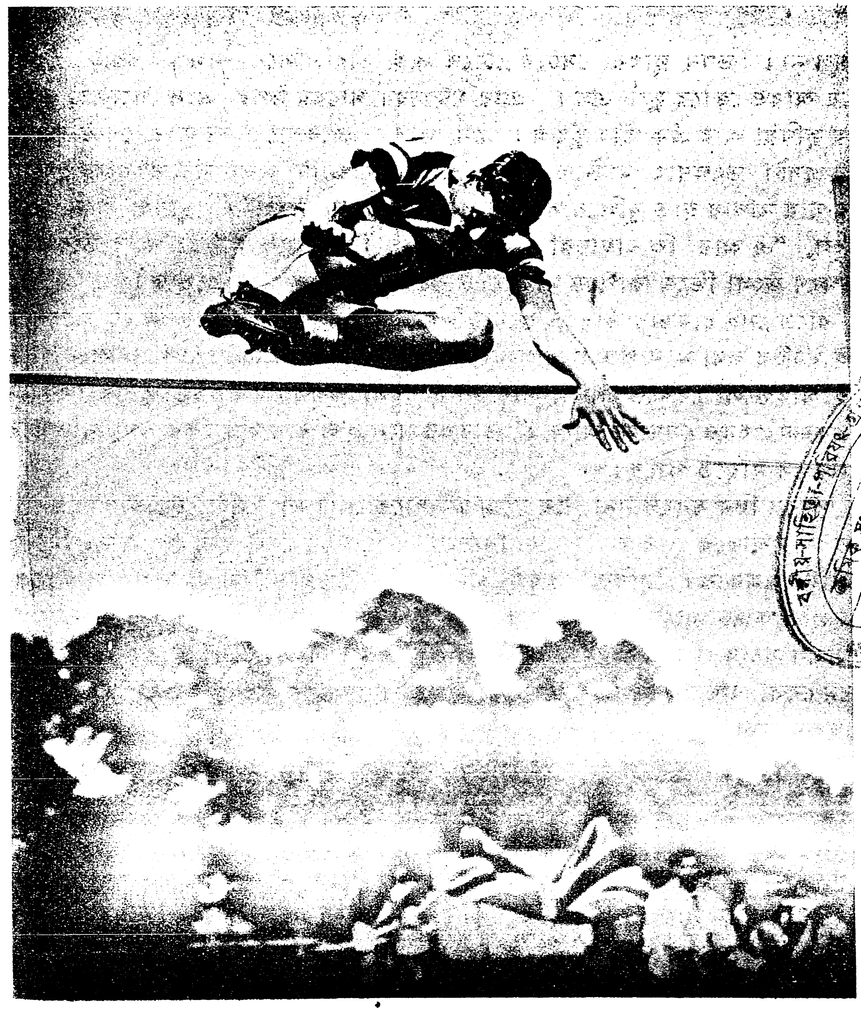

সাবাস!

লাগ্‌ল না। তখন দুখিয়া সেটার চোখে এক তীর বসিয়ে দিল। বরাহ রেগে গিয়ে আরও জোরে ছুটে এল। প্রায় সর্দ্দারের গায়ের উপর এসে পড়েছে, এমন সময় দুখিয়া আর এক তীর ছুঁড়ল। সে তীরটা একেবারে বরাহের পেটে লাগ্‌ল আর সেটা তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেল। দুখিয়ার জন্যই সর্দ্দার বেঁচে গেল। তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে সর্দ্দার বল্‌ল "বাহাদুর ছেলে"। দুখিয়া মনে মনে ভাব্‌ল, "এ আর কি বাহাদুরী। একটা বাঘ কি ভাল্লুক মার্‌তে পারি তবেত"? ততক্ষণে জংলা ভিজে কাপড়ে মাথা হেঁট করে জল থেকে উঠে এসেছে।

রাত্রে সেই চামড়ার তাঁবুতে শুয়ে দুখিয়ার ঘুম এলনা। তার কেবল ছেলেবেলার সেই ঘরটির কথা মনে পড়তে লাগ্‌ল। মনে হচ্ছে, "কাল নদীর ওপারে গিয়ে হয়ত সেই গাছগুলো দেখ্‌তে পাব; যার নীচে খেলা কর্‌তাম। হয়ত পুরাণ শিকারী দু একজন এখনও সেখানে আছে।" তারপর মনে হ'ল বাঘ ভাল্লুকের কথা, যদি তার একটা সে মার্‌তে পারে।

পরের দিন সকলে নদী পার হচ্ছে। নদীতে বেশী জল নেই, হেঁটেই পার হওয়া যায়। সর্দ্দারকে একজন কাঁধে নিয়েছে। ওপারে সেই বন, খুব ঘন, দিনের বেলাই অন্ধকার। দুখিয়া কেবল এদিক ওদিক দেখ্‌ছে, তার ছেলেবেলার চেনা গাছগুলি কাছে আছে কিনা। যখন দু একটা শিকার দেখা যেতে লাগ্‌ল তখন আর সে সব কথা মনে রইল না। এখানেও বাঘ বা ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা নাই। ক্রমে বেলা বাড়্‌ছে, তবে অনেক বড় বড় গাছ থাকায় রোদে বেশী কষ্ট হচ্ছে না। পাঁচ ছয় ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে দু একটা জন্তু শিকার করে, শিকারীদের খিদে পেয়ে গেল। তারা এগাছে ওগাছে দেখ্‌ছে কোন ফল আছে কিনা। কাছেই এক যায়গায় এক বড় জাম গাছ, তাতে জংলি জাম পেকে রয়েছে। তাই দেখে সকলের ভারি আনন্দ। তারা জাম পাড়বার জন্য গাছে উঠ্‌তে গেল, এমন সময় তাদের মাথায় টুপ্‌টাপ্ করে জামের বীচি পড়্‌তে লাগ্‌ল। উপরে চেয়ে দেখে, গাছে একদল বাঁদর বসে জাম খাচ্ছে। তখন তারা সবাই মিলে একটা একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে, হৈ হৈ করে তাড়া দিতে লাগ্‌ল। তাড়া খেয়ে বাঁদরের দল লাফালাফি করে এগাছে ওগাছে পালিয়ে গেল। তখন শিকারীরা গাছে উঠ্‌ল জাম খেতে। হঠাৎ হুড় মুড় শব্দ শুনে সবাই চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌ল, একদল হাতী জাম গাছগুলোর প্রায় নীচ দিয়েই যাচ্ছে। ছোট বড় অনেক হাতীর দল, বাচ্ছা হাতীগুলো মায়ের

সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। তারা এসে জাম গাছের ডাল মট্‌মট্ করে ভাঙ্গতে লাগ্‌ল। সেই ডাল ভাঙ্গার ঝাঁকানি লেগে, গাছের উপর শিকারীরাও নড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তাদের ভয় হ'ল বুঝি বা পড়ে যায়, তারা শক্ত করে ডাল ধরে রইল। ডাল ভেঙ্গে, পাতা ছড়িয়ে, খানিক খেলা করে হাতীগুলো চলে গেল। একটা হাতী তখনও যায়নি। সেটা দুখিয়া যে গাছে ছিল সেই গাছের গোড়ায় গা ঘষ্‌ছিল। এমন সময় গাছের উপরের ডালে খক্‌খক্ করে বিকট একটা শব্দ হ'ল। বোধ হয় একটা বাঁদর বসেছিল, সেইটাই অমন কর্‌ল। যাই হোক, সেই শব্দ শুনে হাতীটা ভয়ানক রেগে গিয়ে গাছে ঢুঁ মার্‌তে লাগ্‌ল। সেটা বোধ হয় পাগ্‌লা হাতী ছিল, কারণ ঢুঁ মার্‌তে মার্‌তে তার কপাল কেটে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল, তবু সে ছাড়ে না। দুখিয়া প্রাণপণে গাছ আঁকড়িয়ে ধরে আছে। সর্দ্দার দেখ্‌ল, দুখিয়া যদি একবার হাত ফস্কে পড়ে যায়, তবে আর রক্ষা নেই। তখন সর্দ্দারের হুকুমে সব শিকারীরা একসঙ্গে হাতীটার গায়ে তীর মার্‌তে লাগ্‌ল। তারা আগেই তীর ছুঁড়্‌ত, কিন্তু ভয় পাচ্ছিল, পাছে হাতীটার চীৎকারে অন্য হাতীগুলো ফিরে আসে। যাহোক, সকলে একসঙ্গে তীর ছোঁড়াতে হাতীটা বেশী চেঁচাতেও পার্‌ল না, তখনি মাটিতে পড়ে গেল। সকলেই গাছ থেকে নেমে পড়েছে; দুখিয়া আর নামেই না; হাঁ করে গাছের উপর ডালে কি দেখ্‌ছে। সর্দ্দার বল্‌ল, "একজন গিয়ে ওকে নামিয়ে নিয়ে এস; ও বোধ হয় ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে আছে।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তেই দুখিয়া নেমে এল।

সেদিন রাত্রে তারা গাছের উপর মাচা বেঁধে রইল। এক এক মাচায় তিনজন চারজন করে বসে আছে। দুখিয়া চুপ্‌চাপ্ আছে দেখে বুড়ো তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "এত চুপ্‌চাপ্ কেন রে? হাতী দেখে ভয় পেলি নাকি?"

দুখিয়া—"হাতী দেখে ভয় পাইনি, কিন্তু একটা ভারি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছি!"

সর্দ্দার—"কি জিনিষ? কোথায় দেখ্‌লি?"

দুখিয়া—"সেই গাছের উপরে। তোমরা দেখনি? সেই জন্তুটা, যেটা খক্ খক্ শব্দ করেছিল?"

বুড়ো—"সেটা ত বাঁদর?"

দুখিয়া—"না বাঁদর নয়। আমি কাছ থেকে ভাল করে দেখেছি; সেটা ঠিক মানুষের মত দেখ্‌তে অথচ বাঁদরের মতনও।"

সর্দ্দার—"দূর, তাকি হ'তে পারে?"

বুড়ো—তা বলা যায় না সর্দ্দার, হ'তেও পারে। অনেক মানুষ থাকে, তারা যাদু জানে, তারা ইচ্ছা কর্‌লে জন্তুর বেশ ধর্‌তে পারে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমাদের গ্রামে একটা লোক ইচ্ছা কর্‌লে বাঘ সাজ্‌তে পার্‌ত।"

সর্দ্দার—"সত্যি? বল কি? আমাকে দেখাতে পার?"

বুড়ো—"এখানে ত কোথাও সে রকম মানুষ দেখিনি। তবে যদি এই লোকটা, যাকে তুখিয়া জন্তু বল্‌ছে, এ যদি সে রকম হয়ে থাকে ত, একবার এর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে পারি।"

সর্দ্দার—"ঠিক বলেছ। কালকেই তার খোঁজ কর্‌তে হচ্ছে।"

তুখিয়া—"কিন্তু সে ত ছেলেমানুষ, আমার চেয়ে ও ছোট হবে; সে যাদু জানবে কেমন করে? আর সে ত জন্তু সাজেনি? মানুষই ছিল; কিন্তু তবু কেমন যেন জন্তুর মতন।"

বুড়ো—"দেখ্‌লেই বোঝা যাবে। হয়ত বা বনমানুষ হবে।"

তুখিয়া—"না, না, বনমানুষ কখনই নয়। আমার দিকে চেয়ে আবার হাসছিল। দেখ্‌লে একটুও দুষ্টু মনে হয় না। বনমানুষের গায়ে ত বড় বড় লোম থাকে। এর মাথায় লম্বা চুল আছে। কিন্তু গায়ের চামড়া আমাদেরি মত। গলায় একটা মালার মতন কি আছে মনে হ'ল।"

সর্দ্দার—"কাল তাকে খুঁজে বা'র কর্‌তে হবে, কাল আর শিকার ধরা হবে না।"

তুখিয়া—"আচ্ছা, সর্দ্দার! ভাল্লুকে কি মানুষ খায়?"

সর্দ্দার—"কেন বল্ দেখি?"

তুখিয়া—"অমনি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। তারা যদি মানুষ না খায় ত, মানুষের ছেলেপিলে ধরে নিয়ে যায় কেন?"

বুড়ো—"মাংস খেকো ভাল্লুক আছে শুনেছি, কিন্তু আমাদের দেশে নয়। আমাদের এদিকের ভাল্লুকেরা খালি মধু খায়। মানুষের ছেলেদের কেন তারা নিয়ে যায় জানিনা, বোধ হয় মানুষদের একটু জব্দ করবার জন্য। জঙ্গলে গিয়ে আমরা তাদের বিরক্ত করি কিনা, তাই।"

সর্দ্দার—"থাক্ আর বেশী কথা ব'লে কাজ নেই। দূরে বাঘ ডাক্‌ছে শোন।"

ক্রমশঃ

শ্রীসুখলতা রাও।

১৯২৪

উনিশ শ চব্বিশ খৃষ্ট অব্দ
জানুয়ারী মাস হতে হইল আরব্ধ।
সংখ্যায় লিখে হয় ১, ৯, ২, ৪,
মনে রেখো ঠিক ঠিক, লিখি দেখ আরবার।
১ বৎসরের শেষে, আসে আর বৎসর,
৯ কভু ধীর গতি, ঠিক আসে পর পর।
২ হাত যোড় করি যাচি এই হরষে,
৪ দিক হতে যেন শান্তিসুখ বরষে।

শ্রীসুখলতা রাও।

নূতন ধাঁধা



হারু, চারু, আর নীরুর মা তাদের বল্‌লেন, "প্রত্যেক থাকে ১৮ সের আচার আছে, আর বড় মাঝারি আর ছোট এই তিন রকমের বোতল আছে। বোতল দেখে আর গুণে বল তো, কোন বোতলে কত সের আচার ধরে।"

তোমরা সকলে বল তো?

বন্ধ ঘরে আছি সেথা নাই জানালা, নাইকো দ্বার,
রূপের ছটা দেয়াল ফুটে, বাইরে ছুটে চমৎকার;
বন্ধ ঘরেই থাকি ভাল, খুল্‌লে পরাণ আইঢাই;
দিন ফুরালে আদর আমার, দিন থাকিতে আদর নাই;
স্নেহের গুণেই বাঁচি আমি, তার অভাবে মরে যাই;
বিদেশ হ'তে আমদানি মোর, বিদেশী নাম ধরি তাই।

ইস্কুলে নূতন মাষ্টার এসেছেন—ভূগোল পড়াবেন। লোকটি একটু পাগ্‌লাটে ধরণের। পরীক্ষায় তাঁকে প্রশ্ন কর্‌তে দেওয়া হ'লো; তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন—

"(১) কোন্ সহর বেড়ে যাচ্ছে? (২) কোন্ সহর খোলা নয়? (৩) কোন্ জায়গা খাবার জন্য? (৪) কোন্ নদী থেকে চাঁদ পালিয়েছে? (৫) কোন্ নদীকে শুন্‌তে বল্‌ছে? (৬) কোন্ জায়গা বাজান যায়? (৭) কোন জায়গায় চিকিৎসক থাকে? (৮) কোন্ জায়গা শাদা? (৯) কোন জায়গা শুক্‌নো? (১০) কোন খানে কাকের ডাক চিলে ডাকে?" তোমরা এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পার কি?

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) বর। (২) তাল। (৩) গোল। (৪) বালা। (৫) "ল"

উত্তরদাতাগণের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন:—সনৎকুমার চন্দ্র, সুবালা ঘোষ, দেবরাণী দেবী, অনিলকুমার দাসগুপ্ত, জ্যোতিকণা সেনগুপ্তা, সমরেন্দ্রকুমার দেব, উষারাণী মিত্র, অশ্রু, শঙ্খচূড় ঘোষ, বীণাপাণি চৌধুরী, মিনু বসু, ইন্দিরা ঘোষাল, সুনীলকুমার লাহিড়ী, বিমলা রায়চৌধুরী, উমাপদ ভট্টাচার্য্য, বি, এন, মুখার্জ্জি, অমলেন্দুকুমার দত্ত, গৌরী দেবী, চিন্মোহন সেহানবিশ, সন্তোষকুমার গুপ্ত, সুষমা সেন, হিরণ্ময় ঘোষ, ইলা গুপ্তা, বিজলীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবকুমার সেন, প্রভাসরঞ্জন ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার বসু, সুধাংশুকুমার বসু, মহম্মদ ইয়াকুব, নীলিমা দেবী, রবি, হরিপদ গোস্বামী, মৃণালপ্রভা দেবী, হরশঙ্কর রায়, শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জ্যোতিপ্রভা রায়, সুকুমার চক্রবর্ত্তী, রবীন, শৈলেন্দ্রকুমার দে, দেবীভূষণ ভট্টাচার্য্য, পরিমল দত্ত, হিমাংশুজীবন মিত্র, আলো, অমরেন্দ্রনাথ সেন, ত্রিদিবকুমার চৌধুরী, অমলানন্দ সেন, হরিপ্রসন্ন সেন, নীরদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীণা দাস, বিভাবতী দেবী, যতীশকুমার বসু, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, ব্রহ্মব্রত রাহা, হীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য, জগৎপ্রসন্ন গুপ্ত, পবিত্রকুমার নন্দী, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, হরিসাধন দল, সরোজকুমার দত্তগুপ্ত, প্রভাবতী দেবী, গণেশচন্দ্র সিংহ, সাগরবালা দেবী, এন্, কে, বসু, ধীরেন্দ্রনাথ বল, জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত, রবীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার নন্দী, বরদা এম, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, সমরেন্দ্রমোহন সিংহ, অনিলকুমার মিত্র, ভবেশচন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, রাধিকামোহন মৈত্র, গুণদাচরণ মজুমদার, করুণাকেতন সেন, শীতাংশুশেখর মজুমদার, বিজয়ানন্দ মাড্‌গোকার, নির্ম্মলকান্তি গুহ, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বকুলমালা লাহিড়ী, অরুণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র নাগ, সুরমা দেবী, রণেন্দ্রনাথ ঘোষ, অনিলা বসু।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং



ওরে বাস্‌রে! ওটা কেরে! চম্‌কে দিল পিলে,
আড়াল থেকে মার্‌ল উঁকি, ফেল্‌ল বুঝি গিলে!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সন্দেশ

একাদশ বর্ষ | পৌষ, ১৩৩০ | ৯ম সংখ্যা

ক্ষমা

পিতা মাতা সদা ক্ষমা করেন অশেষ—
সন্তানের দোষ ত্রুটি, রাগ হিংসা দ্বেষ।
গুরুজন হতে ক্ষমা লভি স্নেহ বশে,
বাড়িছে মানব শিশু কল্যাণে হরষে।
নৃপতি করেন ক্ষমা প্রজার অন্যায়,
বন্ধুজন ক্ষমে ক্ষতি, রূঢ় বাক্য ব্যয়।
কিন্তু মহাপ্রাণ হতে যেই ক্ষমা ঝরে,
দারুণ যাতনা দায়ী শত্রুর উপরে,
হন্তা প্রতি আহতের যেই ক্ষমা রাজে,
সকলের বড় সেই সব ক্ষমা মাঝে।

শ্রীসুখলতা রাও।

COLOURED DOCUMENT.



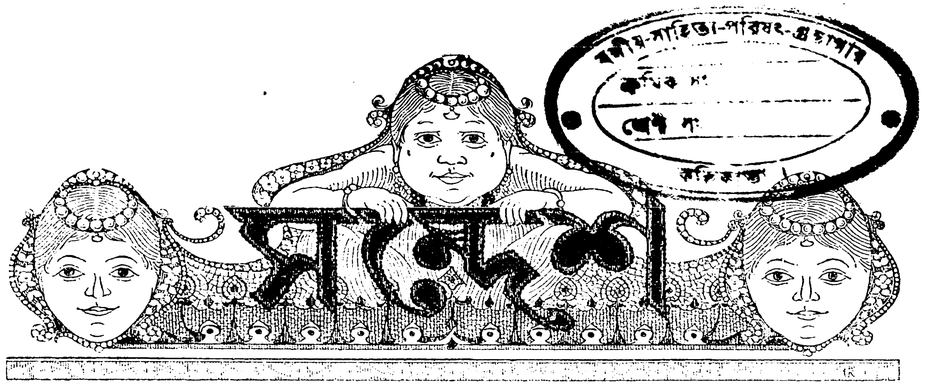

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
রক্ষিতস্তম্ভ

একাদশ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৩০ ১১শ সংখ্যা

দান

সেরা দান-বীর খালিফ্ হাসান্ করুণার পারাবার,
অভাগা জনের অভাব মোচনে সদা প্রাণ কাঁদে তাঁর।
খোলা ভাণ্ডার নিশিদিন তাঁর, দীন দুখীর তরে,
কভু কোন দিন, এসে কোন দীন, নিরাশ ফেরেনি ঘরে।
একদা নিশীথে, বসিয়ে নিভৃতে, অতীতে স্মরণ করি',
নিজ দান কথা, লিখিছে হাসান্ যতনে লেখনী ধরি—
"শত উট আর সহস্র মোহর দিনু মোসাফের দলে,
ফকিরেরে দিনু কম্বলখানি, মণিমালা দিনু গলে।
হজ্ যাত্রার পথিকের দলে আশ্রয় দিনু রাতে,
অসনে বসনে তুষিয়া তাদের বিদায় করিনু প্রাতে।
শিশু কোলে মাতা, দুখিনী অনাথা আসিয়া মাগিল ভিখ্,
একখানি রুটি দিনু যে তাহারে, আর দিব কি অধিক?"—
সহসা চমক্ ভাঙায়ে তাহার দেবদূত আসি তথা,
মুছি দিল সব, রহিল উজল, শুধু শেষ-দান কথা।

COLOURED DOCUMENT.

দুখিয়ার সুখ

(৩)

"সর্দ্দার, সর্দ্দার, ঐ যে, ঐ!" বলে দুখিয়া চেঁচাতে চেঁচাতে একটা ঝোপের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। সকাল থেকে তারা সেই অদ্ভুত ছেলেটিকে খুঁজ্‌ছে। এতক্ষণ কোথাও দেখ্‌তে পায়নি। দু একটা বাঁদরের দল দেখেছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সে ছিল না। বনের ভিতর একটা ছোট ঢিপি, ঢিপির গায়ে, জঙ্গলে ঢাকা একটা গর্ত্ত তারা দেখ্‌তে পেল। সেটা বাঘ কি ভাল্লুকের গর্ত্ত হবে। বাইরে থেকে উঁকি মেরে যখন দেখ্‌ল ভিতরে কিছু নেই, তখন তিন চার জনে গর্ত্তের ভিতরে ঢুক্‌ল। কি আশ্চর্য্য! সে গর্ত্তের ভিতর এক কোণে শুক্‌নো ঘাস পাতা বিছান, যেন কে বিছানা করেছে; তার উপরে একটা শুকান হরিণের চাম্‌ড়া! তার মানে সেখানে মানুষ এসেছিল, না হলে হরিণের শুকান চাম্‌ড়া আসবে কোথা থেকে? গর্ত্তের একদিকের দেয়ালের পাথরে আবার আঁচড়ের দাগ; বাঘ ভাল্লুকের থাবার আঁচড় নয়, মনে হয় কে যেন একটা ছুঁচাল কোন জিনিষ দিয়ে আঁচড় কেটেছে। ভাল করে দেখে বুঝা গেলে যে, সেগুলো ছবি; বাঁদর, শূয়র, হরিণ, পাখী এই সবের ছবি। বুড়ো ব্যাধ বল্‌ল, "এটা নিশ্চয় সে মানুষের বাড়ী। এ ত যাদু জানে না; এ যে নেহাৎ বোকা, খাবার জন্য একটা বাসনও বানাতে পারেনি, একখানা বই চাম্‌ড়া নেই, তাও কোন্ কালের পুরাণ, তীর ধনুক ত নেইই।"

সর্দ্দার—"চল, চল, তার বাড়ী দেখা গেল, এখন তাকে দেখ্‌তে হবে।"

আবার সবাই ঝোপে, জঙ্গলে গাছে গাছে খুঁজতে লাগ্‌ল। বুড়ো বল্‌ল, "কাছেই কোথাও আছে। আর যখন ধনুক নেই, বেশীদূর যেতে সাহস পাবে না। তা ছাড়া দিনের বেলায় সে ঘুমায়, দিনে ত বাঘ ভাল্লুকের তত ভয় নেই। রাত্রে কোন গাছে উঠে বসে থাকে। গর্ত্তের মুখ আড়াল করার জন্য আবার একটা দরজাও বানিয়েছে দেখ; ডালপালা দিয়ে। হয়ত আমাদের সাড়া পেয়ে কোথাও লুকিয়েছে।" এমন সময় দুখিয়া চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ঐ যে ঐ।"

বল্‌তেই, ঝোপের ভিতর থেকে কে বেরিয়ে, এক ছুট্ দিল। সকলে দেখ্‌তে পেল, মাথা ভরা জটা, রোগা রোগা হাত পা, একটি আট দশ বছরের ছেলে। তারা

তাড়া করেছে কি না দেখ্‌বার জন্য সে একবার মুখ ফেরাল। তখন তারা বুঝ্‌তে পার্‌ল, তাকে দেখে দুখিয়া কেন এত আশ্চর্য্য হয়েছে, তার নাক মুখ চোখ সব মানুষের মত কিন্তু মুখের ভাব মানুষের মত নয়। গায়ে বড় বড় লোম থাক্‌লে তাকে কতকটা বনমানুষই বলা যেত। তাদের দেখে "মা—" ব'লে চীৎকার করে আবার দৌড়াল। তীর মার্‌লে ত মরে যাবে তাই বাধ্য হয়ে তাদের পিছনে পিছনে ছুট্‌তে হ'ল। অতটুকু ছেলে, কি রকম ছুট্‌তে পারে, শিকারীরা তাকে ধর্‌তে হাঁপিয়ে পড়্‌ল। সে বেচারাও হাঁপিয়ে পড়েছে। শেষটায় আর না পেরে সে দুই হাত তুলে তারপর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তখন শিকারীরা সবাই এসে তাকে ধরে ফেল্‌ল। ধর্‌তেই সে ভয়ানক ভয় পেয়ে তাদের দিকে চেয়ে "মা,—মা—" করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তাই দেখে দুখিয়ার ভারি কষ্ট হ'ল। সে কাছে এসে আস্তে আস্তে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগ্‌ল। খানিক এমনি কর্‌লে পর, আর সবাই তাকে কিছু কিছু খাবার দিলে পর তার যেন একটু ভয় ভাঙ্গল। কিন্তু সে কিছু খেল না, তার হাত পা তখনও কাঁপ্‌ছে। বেচারা অসহায় ভাবে বনের ভিতর থাকে, সর্ব্বদাই তাকে ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়, কখন কোন জন্তু আসে। এতগুলি নূতন রকমের জন্তু তাকে তাড়া করেছে দেখে, সে একেবারে ঘাব্‌ড়িয়ে গিয়েছে। যখন ভাল করে খুঁটি নাটি দেখ্‌বার অবসর হ'ল, তখন সকলে দেখ্‌ল তার গলায় সত্যি সত্যিই একটা মালা; সে মালা বোধ হয় খুব ছোট বেলায় তাকে পরান হয়েছিল, কারণ এখন সেটা গলায় একেবারে আঁট হয়ে বসে গিয়েছে। আর একটু আঁট হ'লে গলায় লাগ্‌ত। মালাটা কি না ফলের বীচির আর ঘোড়ার ল্যাজের চুলে গাঁথা, তাই খুব শক্ত।

সর্দ্দার বল্‌ল, "চল আমরা একে গ্রামে নিয়ে যাই। ছেলে মানুষ আছে, আমাদের সঙ্গে থাক্‌লে সব শিখে নিবে।"

বুড়ো বল্‌ল, "এখানে এল কোথা থেকে?" দুখিয়া কিছুই বল্‌ছে না। কিন্তু যখন জংলা বল্‌ল, "ওটাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে? কেবল জ্বালাবে বই ত নয়! ওটাকে এখানেই ফেলে রেখে যাও।" তখন দুখিয়া বলে উঠ্‌ল, "না না, তাহ'লে কোন্‌দিন বাঘে খেয়ে ফেল্‌বে।" তাতে জংলা বল্‌ল "থাক না, কার কি। জঙ্গলেইত ছিল, আমরা না এলে কি হ'ত?" দুখিয়া বল্‌ল, "তোমরা ওকে না নাও, আমি নিয়ে যাব। ওর জন্য তোমাদের কাউকে কিছু কর্‌তে হবে না।"

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে শিকারীর দল বাড়ী ফির্‌ল। কিন্তু এক মুস্কিল হল, সে কিছুই খেতে চায় না, তখনও তার ভয় ভাঙ্গেনি, বুক দুর্‌দুর্‌ কর্‌ছে। তাদের সঙ্গে আসা অবধি এক ফোঁটা জলও সে খায়নি। নদী পার হয়ে তারা এপারে সেই ঝরণার ধারে তাঁবু ফেলেছে। ছেলেটি পাছে পালিয়ে যায়, তাই ঘাসের দড়ি দিয়ে তার হাত পা বাঁধা হ'য়েছে। রাত্রে তাঁবুর একধারে, দুখিয়ার পাশে সে শুয়েছে। সবাই ঘুমালে পর, একটা নারকোলের মালায় একটু জল এনে দুখিয়া তার পাশে রেখে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে তাকে খেতে বল্‌ল। তখন তেষ্টায় তার কথা শুকিয়ে গিয়েছে। সে কর্‌ল কি, নারকোলের মালাটা হাতে না নিয়ে, মাটিতেই রেখে তাতে মুখ ডুবিয়ে খানিকটা জল খেল। তাই দেখে দুখিয়া তাকে একটুক্‌রো পোড়ান মাংস এনে দিল। কিন্তু সে খেল না, মাংসটাকে শুঁকে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার ত রান্না জিনিষ খেয়ে অভ্যাস নেই। তারপর দুচারটা জাম খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

দুখিয়ার মনে এক একবার সন্দেহ হচ্ছে, এ তার সেই হারাণ ভাই নয়ত; যাকে ভালুকে নিয়ে গিয়েছিল? কিন্তু এত বড় বনের ভিতর এতটুকু ছেলে বাঁচ্‌ল কি কি করে? বুড়ো ব্যাধ বলেছে ভালুকে মানুষ খায় না, মধু খায়। হয়ত বা ভালুক তাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে গিয়েছিল। হয়ত মধু খাবার সময় তাকেও একটু একটু খেতে দিত। ঐ বুড়ো ব্যাধই দুখিয়াকে বলেছিল যে, মধু খেয়ে খেয়ে ভালুকের হিংস্র স্বভাবও অনেক কমে যায়, এমন কি কেউ কেউ বলে তাদের বেশ মায়া মমতাও আছে। যাই হোক্‌, এতদিন এই ছেলেটি কোনমতে বেঁচে আছে দেখা যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে, এ কে? যেই হোক্‌, তার উপর দুখিয়ার মায়া বসে গেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীসুখলতা রাও।

সমালোচনা

মাননীয় শ্রীযুক্ত
"নিরঙ্কুশ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

"গবদগীতার" গ্রন্থকার মেঘমালতীর কবি
আজ এসেছেন কল্‌কেতাতে পাঠাচ্ছি তাঁর ছবি

আস্‌ছে মাসে "নিরঙ্কুশে" ছাপিয়ে দিতে হবে
এই অনুরোধ নাছোড়বন্দা কর্‌ছি মোরা সবে।
সঙ্গে দিলাম সংক্ষেপেতে জীবনী তাঁর লিখে
সবাই হবেন উপকৃত নূতন কথা শিখে।
আরও দিলাম এক পুঁটুলি কাব্য তাঁরি লেখা
"কাকুতি" আর "কৃষ্ণকাজল" "কঙ্কু" "তস্মরেখা"
"প্রপঞ্চ" আর "আহ্লাদিকা" "মুঞ্জী" "মিহিদানা"
"ভৃঙ্গী" "ভঙ্গী" ইত্যাদিতে মোদ্দা উনিশখানা।
কর্‌তে হবে সমালোচন বিশেষ দরদ করে
ভিতর কার সব গভীর তত্ত্ব ফুটিয়ে লেখার জোরে।
আরেক কথা, ছবিখানার নীচের দিকে ফাঁকে
"কিশোরী চাঁদ কাব্যকুলিশ" নামটি যেন থাকে।
আপনারাই ত দেশের শক্তি এবং জ্ঞানদাতা
দেশের গতি, দেশের কণ্ঠ, জিহ্বা ঘীলু মাথা।
অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন মহাশয়দের কাছে—
ফিরাবেন না নিরাশ করে এই ভরসা আছে।

শ্রীগৌরহরি আঢ্য

শ্রীযুক্ত গৌরহরি আঢ্য মহাশয় সমীপেষু

আঢ্যি মশায়! হাড্ডি মোদের নয়কো তেমন শক্ত
এসব কাব্য হয় না হজম, মাথায় ওঠে রক্ত।
এমন রাবিশ গজায় কেন, মজায় কেন দেশটায়?
শস্তা হাটে নামটি কিনে পস্তাতে হয় শেষটায়।
আপনারা সব ধন্যি বলুন, কবির বাড়ুক পুণ্যি
মোদের কাছে এগ্‌জামিনে পেলেন তিনি শূন্যি!!

নিবেদক
শ্রী"নিরঙ্কুশ" সম্পাদক
সুকুমার রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

এগ্‌বার্টের লাঞ্ছনা

(পিয়ার্‌সনস্‌ ম্যাগেজিন্‌ হইতে)

মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ডের সঙ্গে কণ্ট্রাক্‌ট করে এড্‌ওয়ার্ড ও ক্যাথেলিন্‌ এগ্‌বার্টকে নিয়ে লণ্ডনে গেলেন। গিয়েই ত আর, ষ্টেজে এগ্‌বার্টের তামাসা দেখান যায় না তার আগে রিহার্সেল্‌ করা দরকার—অর্থাৎ, ষ্টেজে এগ্‌বার্টের যে যে রমক তামাস দেখাতে হবে, সেগুলি পূর্ব্বে অভ্যাস করে নিতে হবে। রিহার্সেল চল্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ড খুব করে বিজ্ঞাপন দিতে লাগ্‌লেন—অমুক দিন রাত্রে আমা মিউজিকেল ষ্টেজে গণ্ডারের তামাসা দেখান হবে।

রিহার্সেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একদিন এডওয়ার্ড ক্যাথেলিন্‌কে জিজ্ঞাস করল—"ক্যাথেলিন্‌! মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ড ত তোমার সুখ্যাত কর্‌ছিলেন বল্‌ছিলেন, "আর ভাবনা নেই, মিস্‌ ক্যাথেলিনের এখন খুব ভরসা হয়েছে—বো করি ষ্টেজে গিয়ে আর ঘাব্‌ড়াবেন না'।"

একথা শুনে ক্যাথেলিন্‌ খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—"তা ত বুঝ্‌লাম, কিন্তু মিষ্ট বেরেস্‌ফোর্ডকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। এগবার্টের খাঁচার সাম্‌নেই তিনি "যেন তাঁর সঙ্গে আমার খুব জানা শোনা আছে, খুব মাখামাখি ভাব," এরূপ ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন। এগ্‌বার্ট মোটেও সেটা পছন্দ করে না, আর সেজন্য সে রিহার্সেলের সময় ভারি গেম্‌রা মুখ করে থাকে। আমার ত ভয়ই হচ্ছে, ষ্টেজে গিয়ে না জানি সে কি একটা কাণ্ড করে বসে।" এড্‌ওয়ার্ডেরও সেরূপ ভয় কতকটা ছিল, তারও ভবনা হয়েছিল যথেষ্ট।

ক্রমে রিহার্সেল শেষ হয়ে গেল। ষ্টেজে তামাসা দেখাবার দিন প্রায় উপস্থিত। এগ্‌বার্টের মেজাজ ক্রমেই বেশী খারাপ হচ্ছে। মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ডের যে এত স্ফূর্ত্তি তাঁরও মন যেন দমে গেল। রিহার্সেলের শেষ দিন তিনি এড্‌ওয়ার্ডকে বল্‌লেন—"এখনই গণ্ডারের যদি মেজাজ এমন হলো, তবে ষ্টেজে গিয়ে সে কি না জানি কর্‌বে? আমি এত খরচ পত্র করে বিজ্ঞাপন দিলাম—ভেবেছিলাম, একটা হুলস্থুল ব্যাপার হবে! এখন ত আমার ভয় হচ্ছে যে সবই বুঝি পণ্ড হয়ে যায়!"

ক্রমে সোমবার এসে উপস্থিত, সেই দিন রাত্রে এগ্‌বার্টের খেলা। সন্ধ্যার পরই দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালারি দর্শকে ভরে গেল। ক্যাথেলিন্‌ গেলেন সাজ গোজ

কর্‌তে, এড্‌ওয়ার্ড গেল দেখ্‌তে, এগ্‌বার্টের মেজাজ কেমন। ইচ্ছাটা ছিল, খারাপ মেজাজ দেখ্‌লে, বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে ঠাণ্ডা কর্‌বে। কিন্তু এগ্‌বার্টের দারুণ ভ্রূকুটি দেখে, সে ভড়কে গেল। আর বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, তখন এগ্‌বার্টকে কিছু বল্‌তে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

এড্‌ওয়ার্ড ষ্টেজে গিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ল। লোকে লোকারণ্য, সকলে একেবারে উৎসুক হয়ে আছে, কখন ঘণ্টা বাজবে আর গণ্ডার আস্‌বে ষ্টেজে। ধীরে ধীরে সে ফিরে এসে গণ্ডারের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, সঙ্কেত হলেই দরজা খুলে দিবে। ক্রমে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তেই, ক্যাথেলিন্‌ও তাঁর পোষাকের উপর একটা শাল জড়িয়ে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন।



এড্‌ওয়ার্ড দরজা খুলে দিয়ে ডাক্‌ল —"এগ্‌বার্ট্‌ শীগ্‌গির বেরিয়ে এস, ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে—এখন তোমাকে ক্যাথেলিন্‌কে পিঠে নিয়ে ষ্টেজে যেতে হবে।" কিন্তু তার কথা কে শুনে? এগ্‌বার্ট ঘরের এক কোণে গিয়ে গোঁ মেরে শুয়ে রইল। এড্‌ওয়ার্ড একটু ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকে "শীগ্‌গির বেরিয়ে এস" বলে, এগ্‌বার্টের পাঁজরে দুই তিন ঘুঁসী। ঘুঁসী

মেরে মেরে তার কব্জি মচ্‌কাবার জোগাড়, কিন্তু এগবার্টের তাতেও গ্রাহ্য নাই।

তখন ক্যাথেলিন্ বল্‌লেন—"এড্‌ওয়ার্ড! তুমি বেরিয়ে যাও, তোমার কথা শুন্‌বে না। দেখি আমি বাগাতে পারি কি না।" এড্‌ওয়ার্ড বুঝতে পার্‌ল যে ক্যাথেলিন্ ঠিকই বল্‌ছেন। তখন সে মিষ্টার বেরেস্‌ফোর্ডের কাছে গিয়ে বসে রইল—তার মনে দারুণ দুর্ভাবনা। খানিক পরেই ষ্টেজের পর্দ্দা উঠে গেল, কিন্তু



তখনও ষ্টেজ শূন্য—এগ্‌বার্টকে নিয়ে ক্যাথেলিন্ তখনও আসেননি। এড্‌ওয়ার্ডও ভেবে অস্থির—"তবে কি ক্যাথেলিনও তাকে বাগাতে পার্‌লেন না?" এমন সময় হঠাৎ দর্শকবৃন্দ আনন্দধ্বনি করে উঠ্‌তে, এড্‌ওয়ার্ড চেয়ে দেখ্‌ল যে, ক্যাথেলিন্‌কে

পিঠে নিয়ে এগ্‌বার্ট ভারি বেজার মুখ করে ষ্টেজে এসে হাজির। দর্শকদের চীৎকার আর থামেই না, বেরেস্‌ফোর্ড সাহেব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন।

কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের ভাবনা তবু গেল না, কারণ, সে দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, এগবার্টের মেজাজ ভীষণ খারাপ। তার প্রমাণও তখনি পাওয়া গেল। ক্যাথেলিন্ ষ্টেজে এসেই এগ্‌বার্টকে বল্‌লেন—"দর্শকদের নমস্কার কর।"

বিজ্ঞাপন মত কথা ছিল, যে, এগ্‌বার্ট ষ্টেজে এসেই সলকে নমস্কার করে, তারপর সে মর্‌কোডের তামাসা দেখাবে। কিন্তু ক্যাথেলিন্ যখন তাকে নমস্কার কর্‌তে বল্‌লেন, তখন সে কথা যেন তার কাণেই গেল না—সে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—মুখে পূর্ণ বিদ্রোহের ভাব! কি সর্ব্বনাশ! সব বুঝি মাটি হয়ে যায়! ক্যাথেলিন্‌ও একটু ব্যস্ত হলেন বটে কিন্তু ঘাব্‌ড়ালেন না—তখন দর্শকদের দিকে একবার চেয়ে, ভারি কায়দা করে বল্‌লেন—"এগ্‌বার্ট! এই বুঝি তোমার ভদ্রতা? তাহলে তুমি নমস্কার কর্‌বে না ভেবেছ?" একথার উত্তরের উপরেই সব নির্ভর করে। এগ্‌বার্ট মাথা নেড়ে বল্‌ল—না। যাহোক্, তবু সর্ব্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা। এই 'না' বলা দেখেই দর্শকদের আনন্দের আর সীমা নাই! তারা ভাব্‌ল, এটাও বুঝি গণ্ডারের খেলার একটা অঙ্গ।

ক্যাথেলিন্ আবার বল্‌লেন—"এগবার্ট! তোমার পিছনে এত টাকা খরচ কর্‌লাম; এত কষ্ট করে তোমাকে নানা রকম খেলা শিখালাম, তার ফল বুঝি এই হলো? শেষে আমাকে সকলের সাম্‌নে তুমি এমন অপদস্ত কর্‌লে!" এগবার্ট তবু নিরুত্তর, আর ক্যাথেলিনের এ সকল কথা যেন সে গ্রাহ্যই কর্‌ছে না। তখন ক্যাথেলিন্ আবার দর্শকদের সম্বোধন করে বল্‌লেন—"ব্যাপারটা আপনারা বুঝ্‌তে পার্‌লেন কি? আর কিছু নয়, এসব ওর খালি দুষ্টামি আর ঠেঁটামি। আসল কথা, মিউজিক হলে তামাসা দেখানটা ও মোটেই পছন্দ করে না—একটা কিছু বড় রকমের অভিনয় টভিনয় হলে বরং সে চেষ্টা করে দেখ্‌তে পার্‌ত।"

কথাগুলি যদিচ ক্যাথেলিন্ তামাসা করে বলেছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক সবই সত্যি কথা—এগ্‌বার্টও মনে মনে তাই ভেবেছিল। সুতরাং তার রাগ এবং অভিমান হওয়াটা স্বাভাবিক। তখন সে একেবারে বিগ্‌ড়ে গিয়ে, আর কি কোন বাধা মানে? ঘোঁৎ করে এক ডাক দিয়ে মাথা উঁচু করে ষ্টেজ ছেড়ে চল্‌ল। তাতেই দর্শকদের আনন্দের আর সীমা নাই, তাদের চীৎকারে কাণ যেন ফেটে যায়! ক্যাথেলিন্

গণ্ডারের পিছনে পিছনে ছুট্‌লেন এবং দরজার কাছে গিয়ে তাকে ধরে ফেল্‌লেন। এদিকে দর্শকদের চীৎকার চেঁচামেচিতে এক হুলস্থুল লেগে গিয়েছে। এই সুযোগে ক্যাথেলিন্ গণ্ডারের কাণে ফিস্ ফিস্ করে কি জানি বল্‌লেন।

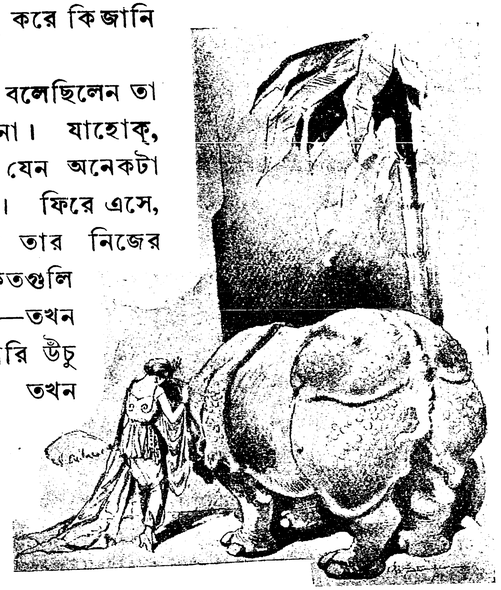

এগ্‌বার্টের কাণে ক্যাথেলিন্ কি বলেছিলেন তা পরে তিনিও স্মরণ কর্‌তে পার্‌লেন না। যাহোক্, তার ফল ভালই হলো—এগ্‌বার্ট, যেন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে, আবার ষ্টেজে ফিরে এল। ফিরে এসে, লক্ষ্মী ছেলের মত, মর্সের সাহায্যে তার নিজের নাম বানান করে দেখাল, দর্শকদের কতগুলি সহজ সহজ প্রশ্নের উত্তর দিল—তখন সকলেরই বিশ্বাস হল, যে, "এটা ভারি উঁচু দরের শিক্ষিত গণ্ডার।" অবশ্যি তখন কিরূপ বাহবাটা যে ক্যাথেলিন্ পেলেন, তা সহজেই বুঝ্‌তে পারা যায়। এগ্‌বার্ট প্রথমটা যেম্‌নি দুষ্টুমি করে সব মাটি করবার জোগাড় করেছিল, তেম্‌নি শেষটায় সে সব পুষিয়ে নিল। ষ্টেজ থেকে যাবার সময় শুধু যে সে দর্শকদের নমস্কার করে গেল, তা নয়, আবার মাথা নেড়ে নেড়ে এই সব 'বাহবার' জন্য দর্শকদের ধন্যবাদও করে গেল।

প্রথমদিনের ব্যপার ত কোনরকমে বেশ ভালয় ভালয়ই কেটে গেল, কিন্তু তারপর যে আর এতটা নির্ব্বিঘ্নে কাটেনি—সেটা আগামী বারে পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

খেলোয়ার

ফুট্‌বল্ 'ম্যাচ্' দেখে বাড়ী ফিরে সন্ধ্যায়—
হাবু বাবু বিছানায় ঢুলে পড়ে তন্দ্রায়;
যেই শোওয়া সেই ঘুম্—সাড়া নাই আর তার,
ভোঁস্ ভোঁস্ গর্জ্জনে নাক ডাকে বার বার।
স্বপ্নের ঝোঁকে দেখে—হয়েছে সে 'কাপ্তান্',—
উল্লাসে বল নিয়ে ময়দানে লাফ্ দ্যান্।
খেলা আজ জমকালো—সব সেরা একদম্,
হাবু আজ কাপ্তান্,—লোকে মাঠ গম্‌গম্।
হাবু বাবু আস্‌তেই বল্ নিয়ে ময়দান—
আহ্লাদে চারিদিকে ওঠে তার জয়গান;
বাপ্‌রে সে কোলাহলে তালা লাগে কাণটায়,
মাথা ঘোরে বন্ বন্—হায় বুঝি প্রাণ যায়।
শন্ শন্ ছোটে হাবু—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ,—
কেড়ে নিতে বলখানি বিপক্ষ কূপোকাৎ।
বাহিরেতে কোলাহল—"তাজ্জব খেলোয়ার,—
দুনিয়ায় এইরূপ দুটি খুঁজে মেলা ভার;"
ঘন ঘন হাততালি—সোল্লাস চীৎকার,—
হাবু ছোটে, ভ্রূক্ষেপ নাহি কোনো দিক্ তার।
এইবার এইবার এক "সুট্" মারলেই,—
নিশ্চিত গোল হবে—সন্দেহ আর নেই।
বাস্ বাস্,—হাবু বাবু তাক্ করে' গোলটায়—
প্রাণপণে শাঁই করে' সুট্ মারে বল্‌টায়।
মামা ছিল পাশে শুয়ে—অচেতন নিদ্রায়,
দ্রুম করে' লাথিখানি লাগে গিয়ে তার গায়।
আৎকিয়ে মামা তার জেগে ওঠে, তারপর—
কাণ ধরে হাব্‌লার, পটাপট্ থাপ্পর।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

সাপের ওষুধ

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের আমাদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ করে তুল্‌বার ইচ্ছা ছিল। তাঁর জ্বালায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। "কি করে রেলের ইঞ্জিন্ চলে বল?" "মুরগী কেন ডিমে তা দেয় জান কি?" "জোনাকি ধরলে হাত পুড়ে যায় না কেন?" "মাছেরা জলে ডুবে নিশ্বাস নেয় কি করে, আর খোলা বাতাসে খাবি খেয়েই বা মরে কেন?" আচ্ছা বাপু অত খবরে আমাদের দরকার কি? মহা বিপদ! ক্লাসের পড়া কর্‌লে নিস্তার নেই; দুনিয়ার সব খবর মাথায় বোঝাই করে বেড়াতে হবে।

ছেলেদের সঙ্গে থাক্‌লে তাদের বেশী উপকার হবে ভেবে, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় এসে আমাদের বোর্ডিংএ বাসা বাঁধ্‌লেন। সঙ্গে এল তাঁর ছেলে জনার্দ্দন। অমন সাংঘাতিক নাম রাখার কারণ, হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্বাস যে, মিষ্টি মিষ্টি নাম রাখ্‌লে ছেলেদের গায়ে জোর কম হয়, চোখে চশমা ওঠে আর তারা পাকা কুঁড়ে আর অকর্ম্মা হয়ে থাকে। জনার্দ্দনের কুচ্‌কুচে কালো রং মাথার চুলে কদম ফুলের ছাঁট, চোখ একটু ট্যারা আর তার কাণ দুটো দুপাশে সাইনবোর্ডের মত বাইরে বের করা। হরিপদ বলেছিল যে, সে তাকে কাণ নেড়ে নাকের উপর থেকে মাছি তাড়াতে দেখেছে। কিছুই আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু জনার্দ্দন কথাটা শুনে খুব রাগ করেছিল।

জনার্দ্দন হেড্‌মাষ্টার মশায়ের উপযুক্ত ছেলে। সে পৃথিবীর সব কিছুর মানে জানে। মানুষে নাক দিয়ে দেখ্‌তে পায় না কেন তা জনার্দ্দন বলে দিতে পারে। সে সব ফুলের নাম জানে; আমাদের গায়ে কটা হাড় আছে আর কোন্‌টা কি জন্যে আছে তাও সে জানে। ছেলেকে বিদ্যে দেখাবার সুবিধে করে দেবার জন্যেই বোধ হয় মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্ন করার উৎসাহ হঠাৎ ভীষণ বেড়ে উঠ্‌ল। সে দিন কেলো, মোটরকার দম্ দিয়ে চালান হয় বলে জব্দ হয়ে গেল। জনার্দ্দন হেসে উঠে বল্লে, "দূর গাধা! পেট্রোল, কারবুরেটার, সিলিণ্ডার, গিয়ার, গ্যাস্, স্পার্ক,....." আরও দেড় লক্ষ নাম এক নিশ্বাসে বলে তবে সে থাম্‌ল। কেলো রেগে তার কাণ ধরে দিল এক টান্। বল্লে, "থাক্ না! আমি নিজে দেখেছি সাম্‌নে একটা হাতল দিয়ে মোটরকারে দম্ দেয়। সেটা কি খেলা কর্‌বার জন্যে না কি?" হেডমাষ্টার মহাশয় কেলোকে দিলেন বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে। জনার্দ্দনটাকে জব্দ কর্‌তে হবে।

আজ কদিন থেকে হেডমাষ্টার মশায় আমাদের ডাক্তারী শেখাচ্ছেন। সে দিন দুঘণ্টা ধরে (খেলার সময়) আমাদের যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, স্নান করা, দাঁত মাজা, আলু সেদ্ধ খাওয়া, নাক ঢেকে ঘুমান, পেট ভরে খাওয়া, বিছের কামড়, হাত ভাঙ্গা, নেউল পোকা, আরও কত কিছু নিয়ে বুঝিয়েছেন। শেষ অবধি আমাদের খেলা হল না। এদিকে জনার্দ্দন দেওয়ালের উপর বসে আক চিবচ্ছিল। ওকে দেখে নেব!

পরশু দিন সারা সকাল সাপের কামড় নিয়ে এক বক্তৃতা শুনেছি। আমরা সব এখন এক একজন সাপের ওঝা বল্লেও চলে। সাপে কাম্‌ড়ালেই কি কর্‌তে হয় জান? খুব কসে কামড়ের কয়েক ইঞ্চি উপরে দুটা তিনটে বাঁধন লাগাতে হয়। তারপর কামড়ের দাগ বরাবর ছুড়ি দিয়ে আচ্ছা করে চিরে দিতে হয়। আর সেই চেরা জায়গায় ঘা করে পোটাসিয়াম্ পারমাঙ্গানেট বলে এক ওষুধ আছে, তাই লাগাতে হয়। আর রোগীকে খুব সজাগ করে রাখ্‌তে হয়। ঘুমলেই মরণ। কিন্তু মজা যা হয়েছে! জনার্দ্দনকে একেবারে সায়েস্তা করেছি! আজ কদিন থেকে জনার্দ্দনকে সিধে কর্‌ব ভাবছি, কিন্তু সেটা এমন ভীতু, না আসে অন্ধকারে ছাদের উপর, না খেলে কোন খেলা যে কিছু একটা কর্‌ব! কিন্তু কাল বিকেলে ওকে অনেক করে বলে কয়ে বাগানের দিকে নিয়ে গেলাম। আমরা চারজন ছিলাম; জনার্দ্দন, কেলো, ঝণ্টু আর আমি। কোথাও কিছু নেই, কেলো খুব ভয় পাওয়ার মত গলা করে বলে উঠল, "এইরে ঐ গাছটার উপর থেকে দুটো পেত্নীর ঠ্যাং ঝুল্‌ছে! ধর্‌লে বুঝি!" যেই না বলা, জনার্দ্দন অমনি বিকট চীৎকার করে উঠল, "ওরে বাপরে! গেলাম, গেলাম! কাম্‌ড়াল বুঝি!" আমরাও তক্ষুণি জনার্দ্দনকে চিৎ করে ফেল্লাম। কেলো ওর মাথার উপর বস্‌ল, আর ঝণ্টু ওকে খুব ভীষণ কাতুকুতু দিতে লাগল। একে ভূতের ভয় তার উপর কাতুকুতু আর দম বন্ধ! জনার্দ্দন খুব বিশ্রী গোঁ গোঁ কর্‌তে লাগ্‌ল।

গোলমাল শুনে হেড মাষ্টার মশায় তাঁর ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। বেরতে গিয়ে, মালিদের একটা উপুড় করা ঘড়াতে হোঁচট্ খেয়ে, তাঁর রাগ ভীষণ বেড়ে গেল। তিনি চীৎকার করে বল্লেন, "কি হয়েছে, বাঁদর সব?"

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, "আজ্ঞে, স্যার, জনার্দ্দন কেমন কর্‌ছে; ওকে বোধ হয় কিছুতে কাম্‌ড়িয়েছে।" জনার্দ্দন কি একটা তাড়াতাড়ি বল্‌তে গেল; কিন্তু হেড্‌-

মাষ্টার মশায় তাকে ভয়ানক তাড়া দিয়ে বল্লেন, "চুপ করে থাক! নড় না! আমি আস্‌ছি।" তিনি দৌড়ে নিজের ঘরের ভিতর থেকে খানিকটা দড়ি, একটা ছুরি আর একটা বোতল নিয়ে এলেন। জনার্দ্দন তখনও ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, আর কেলো ওর পেটের উপর হাঁটু দিয়ে বসে গুণ্ গুণ্ করে কি যেন গাইছিল। হেড্‌মাষ্টার মশায় আমাদের সকলকে তাড়া দিয়ে বল্লেন, "খুব কসে ওর পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেও।" আমরা ত তাই চাই। এইসান্ কসে বাঁধলাম যে, জনার্দ্দন হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠ্‌ল। ওর বাবা ওকে এক চড় মেরে বল্লেন, "থাম্ শীগ্গির, কাপুরুষ কোথাকার! খবরদার ঘুমবে না। ঘুমলেই মর্‌বে।" এই বল্‌তে বল্‌তে তিনি জনার্দ্দনের পায়ে সাপের কামড়ের দাগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু দাগ কোথায়? প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় চোখে পড়্‌ল দুই আঁচড়ের মত দাগ। বোধ হয় আমাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফলে আঁচ্‌ড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর যায় কোথা! সেই আঁচড় বরাবর মাষ্টার মশায় দিলেন ছুরির টান্। ছুরিটা আবার পোড়ান হয়েছিল এর মধ্যে। গরম ছুরির খোঁচা খেয়ে মাষ্টার মশায়ের পণ্ডিত ছেলের গলা সপ্তমে চড়ে গেল। তার উপর আবার পোটাসিয়াম্ পার্‌মাঙ্গানেটের ধাক্কা। জনার্দ্দন খুব লাফাল কিন্তু ঝণ্টু তার জুল্‌পি ধরে ঝুলে পড়ায় হঠাৎ তার লাফ থেমে গেল। মাষ্টার মশায় ভাব্‌লেন সাপের বিষের ফল। আমাদের বল্লেন, "সারা রাত ওকে যেমন করে হোক জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে।" আমরাও ত তাই চাই। রাত সাড়ে আট্‌টা থেকে ভোর চার্‌টে অবধি জনার্দ্দনের শাস্তি চল্‌ল। সে যতই ঘুমতে যায়, আমরা ততই তাকে দৌড় করাই, চিম্‌টি কাটি আর চুল্ টেনেদি। সকাল বেলা হেড্ মাষ্টার মশায় এসে বল্লেন, "যাক, এ যাত্রা বেঁচে গেলি তুই।" জনার্দ্দন কেঁদে উঠে বল্‌ল, "হ্যাঁ, ভ্যাঁ, তাই বুঝি। আমায় ত সাপে কাম্‌ড়ায় নি!" হেড্‌ মাষ্টার মশায়ের মুখ সাদা হয়ে গেল, তিনি জিজ্ঞেস কল্লেন, "তবে অমন করে চেঁচালি কেন?" জনার্দ্দন বল্ল, "আমি ভূতের ভয় পেয়েছিলাম যে।" মাষ্টার মশায় একেবারে চুপ্। জনার্দ্দন আজ থেকে রোজ অন্ধকার ঘরে বন্ধ থাক্‌বে—ভূতের ভয় সারাবার জন্যে। কিন্তু আমাদের আজ সারাদিন হেড্‌মাষ্টার মশায় কোন প্রশ্ন করেন্‌নি। এর পরে সম্ভবত আমরা শুধু ক্লাশের পড়া পড়েই নিস্তার পাব।

শ্রীঅশোক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

খেলাধূলা

গতবারের "সন্দেশ"এ খেলাধূলার কয়েকটি ছবি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে, দৌড়ান, লাফান ইত্যাদির ছবিই ছিল। এবার কয়েকটি ছবি দিলাম; সেগুলি সবই দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ছবি। প্রথম ছবিতে দেখ, দুই দলে কেমন নৌকাদৌড় (বাইচ্ খেলা) হচ্ছে। এক দলের লোক খুব জোরে দাঁড়ে টান দিয়েছে; আরেক দল এখনও দাঁড়ে টান দেয় নি। বিলাতে এ খেলার খুব

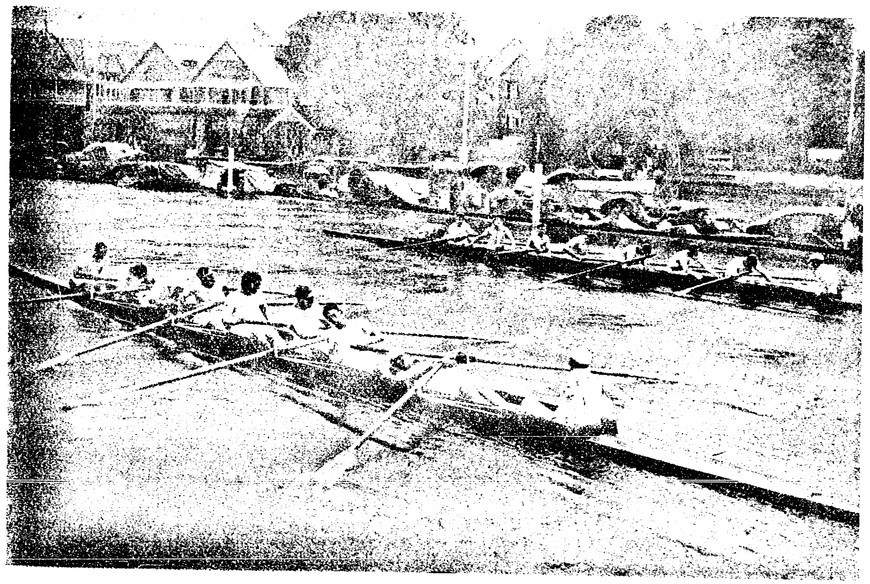

(১)

আদর। অক্সফোর্ড আর কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতি বৎসর নৌকা-দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়; হাজার হাজার লোক সেই খেলা দেখে। বিলাত থেকে সেই খেলার ফল টেলিগ্রাম ক'রে দেশে দেশে জানান হয়ে থাকে।

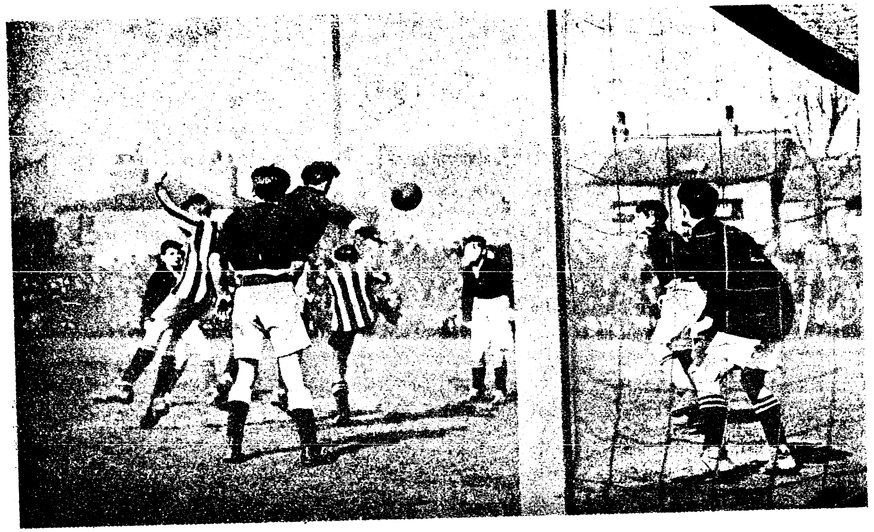

(২)

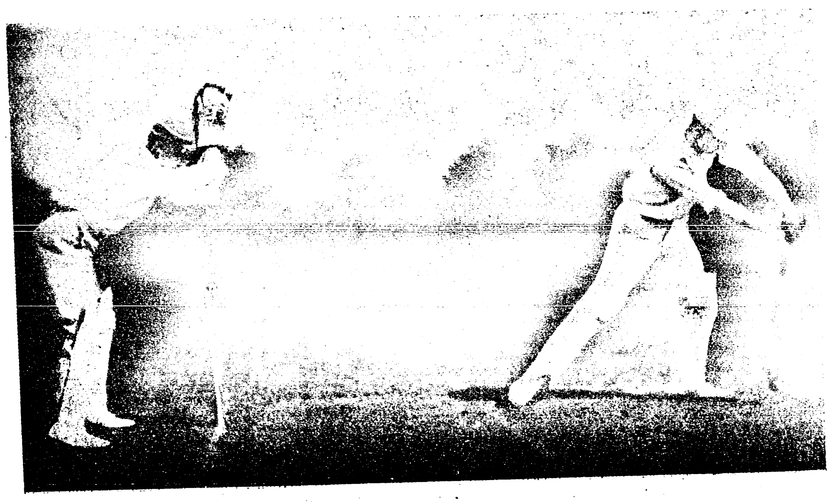

(৩)

দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখ, ফুটবল খেলায় এক পক্ষের গোলের সাম্নে কেমন হুড়াহুড়ি লেগে গেছে। গোল্‌কিপার প্রস্তুত হয়ে আছে—এই বুঝি বিপক্ষেরা গোলে বল মারে। ওদেরই দলের হাফ্-ব্যাক্ 'হেড্' ক'রে বল্‌টাকে বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌ছে; বিপক্ষের একজন তো বল্‌টাকে 'হেড্' করেই দিয়েছে। ছবিতে মানুষের লাফ আর দৌড় কেমন সুন্দর উঠেছে একবার দেখ।

আরেকটি ছবিতে দেখ, উইকেট্‌কিপার ব্যাট্‌স্‌ম্যান্‌কে ষ্টাম্পড্ আউট করেছে। ব্যাট্‌স্‌ম্যান এখনও ক্রীজ্ (Crease) ছেড়ে রয়েছে। একটা বেল্ (Bail) এখনও শূন্যে। আউট সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

খেলাধূলার ভাল ছবি পেলে ভবিষ্যতে আরও ছবি দেবার ইচ্ছা আছে।

মাম্মির পা

অনেকের বাতিক আছে, তাঁরা বহুকেলে পুরাতন দুষ্প্রাপ্য জিনিস কিনে, যত্ন-পূর্ব্বক ঘরে সাজিয়ে রাখেন। জিনিসটি যত বেশী পুরাতন, সুন্দর এবং দুষ্প্রাপ্য তত তার দাম বেশী হয়। দেশে বিদেশে এই সব জিনিসের অনেক দোকান আছে। এক সময়ে ফ্রান্সে এক য়িহুদীর এই রকম একটা দোকান ছিল। একদিন একজন ধনী ভদ্রলোক, রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে এই দোকানে ঢুক্‌লেন। য়িহুদী মহা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে নানা রকমের পুরাতন জিনিসপত্র দেখাতে লাগ্‌ল। কিন্তু কিছুই পছন্দ হলো না। শেষে বল্‌লেন—"এ সব জিনিসের আমার কোন প্রয়োজন নাই। যদি নূতন ধরণের একটা পেপার-ওয়েট্ (যা দিয়ে টেবিলের উপর কাগজ চাপা দেওয়া হয়) দিতে পার, ছোট্ট খাট্ট যা সচরাচর কারো টেবিলে দেখা যায় না, একেবারে নূতন ধরণের—তবে সেটা কিন্‌তে পারি।"

তখন য়িহুদী, পেপার-ওয়েট্ রূপে ব্যবহার করা যায় এরূপ জিনিস একটা একটা করে—পাথরের ব্রহ্মা বিষ্ণু, চিনে-দেবতার মূর্ত্তি, ড্রেগনের মূর্ত্তি এইরূপ আরো কত কিছু দেখাতে লাগ্‌ল। এমন সময় হঠাৎ একটা জিনিসের প্রতি ভদ্রলোকটির নজর পড়্‌ল—সুন্দর একখানা পা, দেখে মনে হয় যেন করিন্থ্ দেশের দুষ্প্রাপ্য ব্রোঞ্জ্ ধাতুর তৈরি—হয় ত বা সুপ্রসিদ্ধ কারিকর লাইসিপাসের হাতেরই প্রস্তুত।

কিন্তু পাখানা হাতে নিয়ে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন! সেটা মোটেই ধাতুর তৈরি নয়, নিতান্ত হাল্‌কা। তখন ভাল করে দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লেন,—সত্যি সত্যি চাম্‌ড়া মাংসের পা, "মাম্মি"র (মস্‌লা দ্বারা রক্ষিত মৃতদেহ) কাটা পা!! পায়ের আঙুলগুলি সরু সরু, নখগুলি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে! পায়ের তলা দেখে মনে হলো, যেন, কোন দিন সে মাটি মাড়ায়নি, সর্ব্বদা মোলায়েম কার্পেটের উপরই চলে বেড়িয়েছে। ভদ্রলোকটি য়িহুদীকে বল্‌লেন—"এই পা-টি আমি পছন্দ কর্‌লাম।"

য়িহুদী মুচ্‌কি হেসে বল্‌ল—"বাঃ, বেশ! আপনার দেখ্‌ছি অদ্ভুত পছন্দ—ফ্যারেওর কন্যা হারমন্‌থিসের পা পছন্দ করেছেন, পেপার্-ওয়েট্ কর্‌বেন বলে—আপনার নজর খুব ভাল আর একটু নূতন ধরণের। বৃদ্ধ ফ্যারেও যখন পাহাড় পর্ব্বত কাটিয়ে তাঁর প্রিয় কন্যার কবর প্রস্তুত করাচ্ছিলেন, তখন যদি কেউ তাঁকে বল্‌ত, যে, একদিন তাঁর কন্যার একখানা পা দিয়ে পেপার-ওয়েট্ হবে—তাহলে তখন তিনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হতেন।"

যাহোক্, ভদ্রলোকটি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"এটার জন্য তোমাকে কত দিতে হবে?"

য়িহুদী—"যতটা আমি আদায় কর্‌তে পারি? কারণ, জিনিসটা কেমন দেখ্‌ছেন ত? ফ্যারেওর মত এতবড় রাজার মেয়ের পা—অতিশয় দুষ্প্রাপ্য জিনিস! এর জোড়া থাক্‌লে কিছুতেই আমি পাঁচশ টাকার কমে বেচ্‌তাম না।"

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—"ও সব বক্তৃতা রেখে দাও। আমার কাছে ৫ পাউণ্ড আছে, এর বেশী কিছুতেই দিতে পার্‌ব না।" য়িহুদী বিড় বিড় করে বল্‌তে লাগ্‌ল—"রাজকুমারী হারমন্‌থিসের পায়ের দাম ৫ পাউণ্ড! বড্ড কম, বড্ড কম—এ যে সত্যি করে রাজকুমারীরই পা।" যাহোক্ শেষে ৫ পাউণ্ড নিয়েই সে পা-খানা ভদ্রলোকটিকে দিল। য়িহুদী টাকগুলি পকেটে ফেল্‌ছে আর বল্‌ছে—"রাজকুমারী হারমন্‌থিসের পাখানি দিয়ে পেপার-ওয়েট্ কর্‌বেন! বৃদ্ধ ফ্যারেও তাঁর মেয়েকে বড্ড ভালবাস্‌তেন, তিনি বোধ হয় এটা পছন্দ কর্‌বেন না।"

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে রোয়ানা হয়েছেন। তাঁর মনে ত আর এসব কুসংস্কার নাই! তিনি মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন,—"তোমার কথা শুনে মনে হয়, যেন, তুমি ফ্যারেওর সময়কারই লোক। কিন্তু তা বলে মনে করোনা, যে, ইজিপ্টের পিরামিডের মত তোমার বয়স!" এই বলে তিনি পেপার-ওয়েট্‌টি নিয়ে চলে গেলেন।

বাড়ী পৌঁছিয়ে আর দেরি কর্‌লেন না, তখনই টেবিলের উপর কাগজ চাপা দিয়ে পেপার-ওয়েট্‌টি রেখে দিলেন। এমন সুন্দর জিনিসটি পেয়ে তাঁর মনে খুবই আনন্দ হয়েছিল। এ সংবাদ বন্ধুবান্ধবদের না বলে কি থাকা যায়? বাড়ীতে অন্য কেউ নাই, তিনি একা থাকেন, তাই তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পথে জন কয়েক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তাদের নিয়ে হোটেলে গেলেন খেতে।

খাওয়া দাওয়ার পরে রাত্রে বাড়ী ফিরেছেন। মনের আনন্দে ডিনারে একটু বেশী মদ খাওয়ার দরুণ, মাথা একটু যেন গোলমেলে বোধ হচ্ছিল। টেবিলের উপরে রাজকুমারীর কাটা পা—পেপার-ওয়েট্। তার মসলার মধুর এবং উগ্র গন্ধে ঘর ছেয়ে গিয়েছে। চার হাজার বৎসর আগেকার গন্ধ, তবু এখনও তার তেজ কমে নাই! ক্রমে তাঁর মাথা যেন আরো ঘোলাটে হয়ে গেল, তন্দ্রার ভাব এল। ঘুমের ঘোরে যেন মনে হতে লাগ্‌ল, তিনি বেশ সজাগই আছেন, আর যেন অদ্ভুত একটা কিছু ঘটনা ঘট্‌বে বলে বোধ হলো।

ঘরের জিনিসপত্র সব যেমনটি তেমনই আছে, আলোটিও মিট্‌মিট্ করে জ্বল্‌ছে। হঠাৎ যেন দেয়ালের কাঠ মড়্‌মড়্ করে উঠ্‌ল, চিম্‌নীর আগুন বেশী করে জ্বলে উঠ্‌ল। এমন সময় তাঁর চোখ পড়্‌ল সেই টেবিলের উপর, যাতে রাজকুমারীর পা খানা রেখেছিলেন। ৪ হাজার বৎসরের মস্‌লা মাখান পা—তার ত চুপ্ করে এক জায়গায়ই থাকা উচিত। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! পা যে টেবিলের উপর বেঙ্গের মত লাফিয়ে বেড়াচ্ছে!! তখন তাঁর যেন একটু ভয়ের মত হয়েছে। এমন সময় আবার দেখ্‌লেন, হঠাৎ তাঁর মশারীটা যেন নড়ে উঠ্‌ল আর সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ধপ্ ধপ্ শব্দ—যেন এক পায়ে কে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে! তাঁর তখন রীতিমত ভয়ই হয়েছে, হাত পা একেবারে ঠাণ্ডা, মাথার চুল সটান খাড়া!

হঠাৎ তখন মশারীর দরজা ফাঁক হয়ে গেল, তিনি দেখ্‌লেন, অতি অদ্ভুত এক মূর্ত্তি তাঁর সমুখে দণ্ডায়মান!

একটি আশ্চর্য্য সুন্দরী মেয়ে, হুবহু ইজিপ্টের লোক! এমন সুন্দরী তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। সুন্দর নীটোল হাতে অতি অদ্ভুত ধাতুর তৈরি দুগাছি বালা এবং কাচের ব্রেস্‌লেট্। মাথার চুল সরু সরু বেণী বাঁধা, ঝুলান। বুকে সবুজ রঙ্গের একটি ছোট দেবমূর্ত্তি চেইনে ঝুল্‌ছে। মাথায় চক্‌চকে সোণার একটি ব্যাণ্ড। পরিচ্ছদ বহুমূল্য এবং তুর্কী রমণীর ন্যায়।

তখন, এই স্বপ্নের অবস্থায়ই হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, য়িহুদীর সেই কথাটি —"বৃদ্ধ ফ্যারেও তাঁর মেয়েকে খুব ভালবাস্‌তেন, তিনি বোধ করি এটা পছন্দ কর্‌বেন না।"

আরো আশ্চর্য্য, মেয়েটির একখানা পা—অন্য পা-টি ঠিক গাঁটের কাছে কাটা! মেয়েটি ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে গিয়ে টেবিলটার কিনারায় বস্‌ল। কাটা পা-টা তখনও লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তা দেখে মেয়েটির চোখে জল এল। সে তখন পর্য্যন্ত একটিও কথা বলে নাই বটে, কিন্তু তবু ভদ্রলোকটি তার মনের অবস্থাটা বুঝ্‌তে পার্‌লেন; সে তার কাটা পা-খানার দিকে চেয়ে আছে—সেটা সত্যি সত্যি তারই পা—হতভাগা টেবিলের চারদিকে লাফিয়েই বেড়াচ্ছে। [ক্রমশঃ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

রবর

সেদিন খবরের কাগজে পড়্‌ছিলাম, বিলাতের রবরের টুক্‌রার সঙ্গে আরো কয়েকটি জিনিস মিশিয়ে তা'দিয়ে রাস্তা তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে। সেই রাস্তার উপর গাড়ী ঘোড়া চল্‌লে খুব কম আওয়াজ হবে। আজকাল গাড়ীর চাকায় রবর লাগান হয়, কিন্তু রবরের রাস্তার উপর সব গাড়ীরই আওয়াজ খুব কম হবে। পুরাণো মোটর-টায়ার দিয়ে প্রথম পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি রবরের রাস্তার চল্ নানা দেশে হয়ে যায়, তা' হ'লে রাস্তা তৈরীর জন্য কত রবর লাগ্‌বে একবার ভেবে দেখ! শুধু পুরাণো মোটর-টায়ারে তখন আর কুলাবে না।

পৃথিবীতে রবরের ব্যবহারটা খুবই বেড়ে গেছে। মোটর-টায়ারে, সাইকেল-টায়ারে, গাড়ীর-টায়ারে রবর লাগে; ডাক্তারী চিকিৎসায় রবরের নল, দস্তানা ইত্যাদি লাগে; রবরের জুতা, রবরের টুপি, রবরের জামা, রবর দেওয়া কাপড় ইত্যাদি কত রবরের জিনিস দৈনিক ব্যবহারে লাগে; ভল্‌ক্যানাইটের ফাউণ্টেন পেন্, চিরুণি ইত্যাদি হয়, তা'ও রবর দিয়ে তৈরী; বৈদ্যুতিক আলোর কাজে রবর না হ'লে চলেই না। এ রকম কত শত কাজে রবর লাগে তা' লিখ্‌তে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে। রবরের খেলনাও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হয়;—ফুট্‌বলের

ব্লাডারে রবর, রবরের পুতুল, রবরের বেলুন, বল ইত্যাদি। একবার ভেবে দেখ তো, পৃথিবীতে মানুষের কাজে কত রবর ব্যবহার হয়?

রবরের ব্যবহারের কথা তো লিখ্‌লাম; রবর কি জিনিস, কোথা থেকে আসে, সে সম্বন্ধে কিছু জান কি? অনেকেই বোধ হয় জান না। রবর একরকম গাছের রস থেকে তৈরী হয়। ব্রেজিল থেকেই প্রথম রবরের আমদানী হয়। একজন ইংরেজ কয়েকটি রবর গাছের চারা আর রববের বীজ লুকিয়ে ব্রেজিল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সে সময়ে ব্রেজিলের শাসনকর্ত্তারা বিদেশে রবরের গাছ অথবা বীজ একটিও নিয়ে যেতে দিতেন না; তাই খুব সাবধানে গাছ আর বীজগুলি আন্‌তে হয়েছিল।



সেই গাছ আর বীজ থেকে ক্রমে ক্রমে লক্ষ লক্ষ গাছ নানা দেশে চালান হ'য়ে, এখন সিংহলে আর মালয় উপদ্বীপে বড় বড় রবরের চাষের বাগান হয়েছে, আর প্রতি বৎসর হাজার হাজার মন রবর বিদেশে চালান যায়। ব্রেজিলে এখনও রবরের চাষ খুব বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে। রবর দুই জাতের হয়;—লাল আর কালো।

রবরের গাছ বেশ বড় হয়। গাছের গায়ে একরকম ধারাল যন্ত্র দিয়ে চিরে দেওয়া হয়। সেই সব চেরা জায়গা থেকে আস্তে আস্তে রস গড়িয়ে পড়্‌তে থাকে। ছবিতে দেখ, একটি সিংহল দেশী মেয়ে রবর গাছ চিরে দিয়েছে আর সাদা রঙের

রবরের রস গড়িয়ে পড়্ছে। এই রস নার্কেলের মালা কিম্বা অন্য কোন ছোট পাত্রে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, আগুনের উপর শুখিয়ে নেওয়া হয়; না হ'লে রস প'চে যায়। ছবিতে দেখ, একটি ছেলে আগুনের উপর রবরের গোলা শুখিয়ে নিচ্ছে। প্রথমে গোলা খুব ছোট থাকে, তারপর আস্তে আস্তে সেটাকে আগুনের উপর ঘোরান হয়, আর অল্পে অল্পে আরো রস ঢালা হয়।



বড় বড় কারখানায় রবরের রসকে নানারকমের আরক দিয়ে পরিষ্কার ক'রে, নরম ক'রে, একটা কলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। সেই কলের ভিতর থেকে লম্বা কাপড়ের থানের মত রবরের থান বেরিয়ে আসে। ছবিতে দেখ, কলে কেমন থান-রবর (অর্থাৎ রবরের সরু লম্বা চাদর) তৈরী হচ্ছে। কোন কোন কারখানায় থান রবর না বানিয়ে চাক্তির আকারে, রুটির আকারে, কিম্বা বড় ইটের মত চাঁই বানিয়ে সেগুলিকে চালান দেওয়া হয়। এই রবর বড় বড় ব্যবসাদারেরা কিনে নিয়ে তা' দিয়ে নানারকম জিনিস বানান। শেষ ছবিতে দেখ, রবরের আড্ডায় নানারকমের রবর বিক্রী কর্বার জন্য আনা হয়েছে। একজন ওজন ক'রে মাল বুঝে নিচ্ছেন, আরেকজন চালান লিখে নিচ্ছেন।





এবার রবর সম্বন্ধে খুবই সংক্ষেপে বলা হ'লো। শুধু রবর সংগ্রহ আর সাধারণ রবর তৈরীর কথাই বল্লাম। এ সম্বন্ধে আরো কিছু অন্যবারে বল্বার ইচ্ছা আছে। আজকাল বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে কৃত্রিম রবর তৈরী করবার চেষ্টা কর্ছেন; দু' একজন এবিষয়ে কিছু কিছু কৃতকার্য্যও হয়েছেন; তবে এখনও খুব ভাল কৃত্রিম রবর তৈয়ারী হয় নি।

পালোয়ানজী

ডিগ্ডিগে রোগা, হাত পা গুলি কাঠির মত, কোমরটি হাতের মুঠোর মধ্যে বোধ হয় ধরা যায়, মাথাটি মস্ত—চেহারাখানি একবার দেখলেই বুঝতে পারবে, তার অমন সুন্দর নামটা থাকা সত্ত্বেও, কেন সবাই তাকে ডাকে "পালোয়ান জী" কিম্বা "ল্যাগ্ ব্যাগ্" সিং!

সন্ধ্যা না হ'তে পালোয়ান জী ঘুমে ঢুলতে থাকে, দুধে এতটুকু সরের কুচি থাকলে সে বমি করে ফেলে, একটু শব্দ হলে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, পোকা মাকড় দেখলে দশহাত তফাতে ছিট্কিয়ে যায়, কিন্তু চড়াই পাখি দেখলে তার খেলার বন্দুকটি নিয়ে দুড়ুম্ করে গুলি করে দেয়!

ঘরের মধ্যে কে যেন ভুলে কি খাবার আ-ঢাকা ফেলে গেছে, রাত্রে বেড়াল এসে খেয়ে যাচ্ছে—পালোয়ান ঘুম ভেঙ্গে সবই দেখ্ছে, কিন্তু কিছু বল্ছে না। ছোট বোন্টি উঠে বেড়াল তাড়াতে যাচ্ছিল—তাকে শুদ্ধ ধম্কে দিল, "চুপ! কিচ্ছু বলিস্ না! যদি কাম্ড়িয়ে দেয়?"

একদিন ভাইবোনেরা মাঠে বেড়াচ্ছে, কোথা থেকে একটা গরু তাদের তেড়ে এল। আর সকলে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল, কিন্তু পালোয়ানজী একেবারে

হাত পা ছড়িয়ে, সোজা গরুর পায়ের গোড়ায় "দণ্ডবৎ" হয়ে পড়ে গেল। এমন সম্মান ত গরুর ভাগ্যে সচরাচর জোটে না, তাই বোধ হয় সে খুসী হয়েই চলে গেল, কিন্তু বাড়ীতে সবাই "হেঁই গরু, তোর পায়ে পড়ি" বলে গান বেঁধে, পালোয়ানজীকে খেপিয়ে অস্থির করে তুল্‌ল।

তখন পালোয়ান ভাবল যে, একটা কিছু না কর্‌তে পার্‌লে আর মান থাকে না। বাহাদুরী দেখাবার সুযোগও চট্ করে জুটে গেল—সেদিন হঠাৎ বাছুরটা ছুটে গেল। পালোয়ান ভয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে, কেমন করে বাছুরের গলার দড়িটায় পা জড়িয়ে হোঁচট্ খেল—বাছুরটাও গলায় হেঁচ্‌কা টান লাগাতে থেমে গেল। তখন পালোয়ান বল্ল, "দেখলে? কেমন কায়দা করে ধরে ফেল্লাম!" তারপর একদিন একটা বেড়ালকে মস্ত লাঠি নিয়ে তাড়া কর্‌তেই, বেড়াল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। উঠানে একটা মস্ত ঝুড়ি দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাড়া করা ছিল, সেটার পাশ দিয়ে পালাবার সময় ঝুড়ি উল্টে হঠাৎ বেড়ালটা চাপা পড়ে গেল—পালোয়ান অমনি একলাফে ঝুড়ির উপর চড়ে, "দিদি! দিদি! বেড়াল ভায়া ফাঁদে পড়েছেন!" বলে চেঁচিয়ে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌ল। সেদিন দাদা-দিদিকেও স্বীকার কর্‌তে হ'ল, "হাঁ, পালোয়ানের আমাদের গায়ে জোর না থাকুক, বুদ্ধি বেশ আছে।" সেই থেকে পালোয়ান কেবল নিত্যি নতুন বাহাদুরী দেখাবার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

সেদিন পালোয়ানের জন্মদিন, সকালে উঠে নতুন কাপড় চোপড় পরে সেজে গুজে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সে দেখ্‌ল ছোট্ট একটি ভেড়ার ছানা ঘাস খাচ্ছে। খানিক ছুটোছুটি করে সে ছানাটার পিছনের পা দুটো ধরে ফেল্ল। ছানা বেচারা প্রাণপণে ব্যা—ব্যা—কর্‌তে কর্‌তে যতই সাম্‌নের দুই পায়ে "আছাড়ি-পিছাড়ি" করে, ততই পালোয়ান হেসে কুটিপাটি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে খোকা, খুকী, নেড়া, বুঁচি, দুখিয়া, লছমনিয়া—কত দর্শক জুটে গেল, পালোয়ানজী মহা উৎসাহে ভেড়ার সার্কাস দেখাতে লাগ্‌লেন—

"নাচ্ বাবাজী নাচ্ বাবাজী
ঠ্যাংটি তুলে খা' ডিগ্‌বাজী
সাবাস নাচন নাচ্ বাছাধন
সাবাস—হেঁই!!—

হঠাৎ কি করে কি হল কেউ জানে না—পালোয়ানজী হুস্ করে সাত হাত শূন্যে উঠে, ডিগ্‌বাজী খেয়ে ছিট্‌কিয়ে পড়্‌লেন, আর তাঁর তলা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে



ঝড়ের মতন কি যেন একটা বয়ে গেল! চিৎকার শুনে সবাই দৌড়োদৌড়ি করে এসে দেখ্‌ল, পালোয়ান কাঁদতে কাঁদতে নর্দ্দামা থেকে উঠ্‌ছেন—তাঁর গায়ে, মাথায়, নতুন পোষাকে কাদা মাখা। একটু দূরে ভেড়ার ছানাটা আর তার মা দাঁড়িয়ে আছে—ছানাটা মাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা, কিন্তু তার মা তখনও পালোয়ানজীর দিকে তাকিয়ে যেন রাগে ফুল্‌ছে!

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

কালোর মাঝে আলো

আফ্রিকায় কয়েক জাতীয় মানুষ আছে, তারা দেখ্‌তে অতি কালো আর কুৎসিৎ, কাপড় পর্‌তে জানে না, চাষবাস বা শিল্প কর্ম্মের ধার ধারে না, গাছের ডালপালা দিয়ে কোনমতে মাথা গুঁজবার মত একটু কুটির বানিয়ে তাতে বাস করে আর তীর ধনুক দিয়ে পশু, পাখী শিকার করে ও বনের ফলমূল কুড়িয়ে খায়।

এদের আমরা "বুনো" বা অসভ্য জাতি বলি, আর নিজেদের সভ্য ও শতগুণে শ্রেষ্ঠ জেনে এদের খুবই কৃপার চক্ষে দেখি। কিন্তু অনেক সময়ে এই সব "অসভ্য" লোকদের মধ্যেও এমন মহৎ গুণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যা থেকে আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেতে পারি। সেদিন একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার হটেণ্টট্ জাতির সম্বন্ধে বড় সুন্দর একটি গল্প পড়্‌লাম ;—

একটি হটেণ্টট্ পরিবার শত্রুর ভয়ে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে বনের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে। গাছের ডালপালা দিয়ে নেহাৎ যেমন-তেমন গোছের একটি কুটির বানিয়ে তার ভিতরে আগুন জ্বেলেছে। ছোট ছোট কালো ছেলেমেয়েগুলি তাদের কালো মায়ের কোল ঘেঁসে বসে আছে—খিদেয় তাদের প্রাণ যায়, কিন্তু ঘরে কিছুই খাবার নাই।

এমন সময়ে তাদের বাবা এসে উপস্থিত হ'ল। সে খাবারের সন্ধানে বনের ভিতর গিয়েছিল—আশা ছিল একটা বড় হরিণ শিকার করে আন্‌বে, কিন্তু ছোট একটি খরগোস ছাড়া আর কিছু ভাগ্যে জোটেনি—ক্ষুধার্ত্ত পরিবারেব সাম্‌নে সে তাই ছুড়ে দিল। তাড়াতাড়ি আগুনে পুড়িয়ে মাংস রান্না হ'ল—ছেলেমেয়েগুলি খিদেয় এমনি অধীর হয়েছে, যে, পারে তো মায়ের হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয়!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খাবার যখন সাম্‌নে উপস্থিত হ'ল, তখন তো তারা তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সঙ্গে খেতে আরম্ভ কর্‌ল না? তারা ধৈর্য্য ধরে বসে রইল, আর তাদের বাবা বাইরে এসে, দুই হাত তুলে সেই গভীর নিস্তব্ধ বন কাঁপিয়ে, বিকট এক চীৎকার কর্‌ল! আবার অন্যদিকে ফিরে আরেক চীৎকার!! তারপর আরেক দিকে ফিরে তৃতীয় বার চীৎকার!!! সে চীৎকারের অর্থ এই—"কে ক্ষুধার্ত্ত আছ? আমার কাছে মাংস আছে।" "কে ক্ষুধার্ত্ত আছ? এস, খাও!" "কে ক্ষুধার্ত্ত আছ? আমার

খাবারের ভাগ নিবে এস!" তিনবার চীৎকারের পরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কোন উত্তর এলনা, তখন তারা নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে প্রাণ বাঁচাল।

এটি সত্য ঘটনা। কোনো হটেণ্টটের হাতে কিছু জিনিস পড়্‌লে, সে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলের মধ্যে সেটা ভাগ করে দেয়। একলা খেয়ে তার তৃপ্তি হয় না—খিদেয় যতই কাতর হোক্ না কেন, যাকে সাম্‌নে দেখে তাকেই ডেকে না খাওয়ালে চলে না। সেজন্যই কিছু খেতে বস্‌বার আগে অমন করে তিনবার ডাক্‌বার নিয়ম—কাউকে না ডেকেই খেতে বসা তাদের পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়।

শ্রীপুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সুন্দরী

মুখখানি তার চাঁদের মত
বংশী নাকের বাহার কত,
পটল চেরা চোখের পরে
ধনুক ভুরু বিরাজ করে,
বিম্ব অধর ওষ্ঠ মাঝে
মুক্তা-দন্ত পাঁতি রাজে,
কেমন সে যে জান্‌বে তবে
পরের পাতায় দেখ্‌বে যবে।

শ্রীসুখলতা রাও।

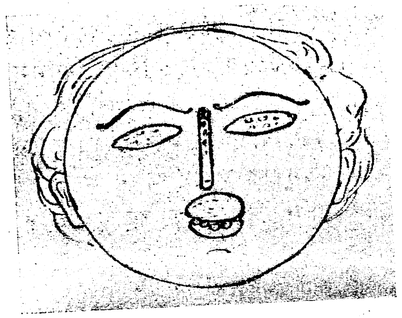

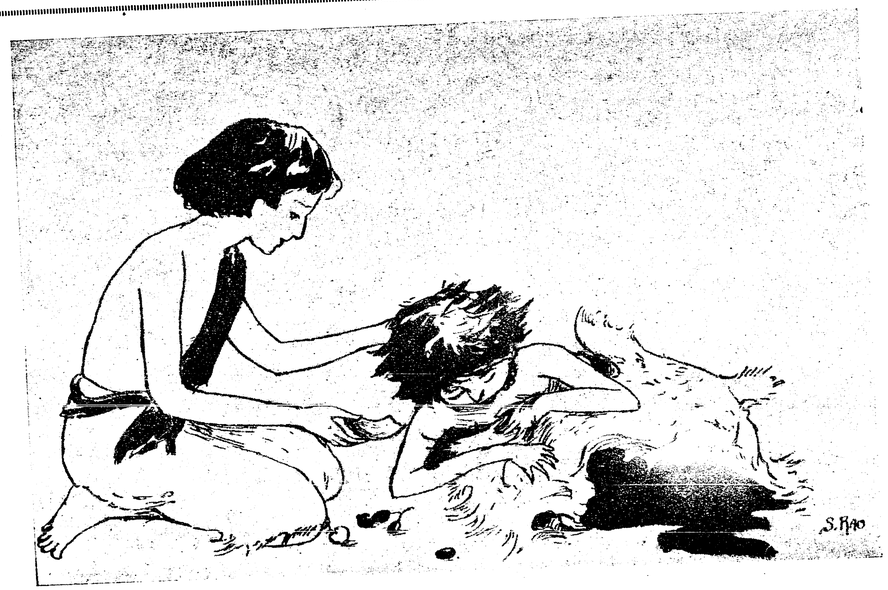

দুখিয়া আর বুনো ছেলে।

দুখিয়ার সুখ—৩২৩ পৃষ্ঠা।

গল্প-স্বল্প

(১) জাপানী কাঁকড়া

জাপানের কাঁকড়ারা কিন্তু জাপানী লোকদের মত ছোট্টো খাট্টো নয়; তা'রা অনেকেই প্রকাণ্ড বড় আর বিশ্রী দেখ্‌তে। যদি সে দেশে গিয়ে কেউ কাঁকড়া খেতে ইচ্ছা কর, তবে একটা কাঁকড়া যেন খেতে চেও না। তা' হ'লে সারাদিন লাগ্‌বে সেটা খেয়ে শেষ কর্‌তে। কাঁকড়ার একটা পা এক বেলার খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

(২) আশ্চর্য্য "টেডি"

ছোট ছেলেদের খেলার লোমওয়ালা ভালুক-পুতুলকে "টেডি" বলে। একবার বিলাতের ওলিম্পিয়া মেলায় একটা বড় মজার টেডি এসেছিল। সেটা অনেক লোককে জলে ডোবা থেকে বাঁচিয়েছিল। তোমরা হয় তো ভাব্‌ছ "টেডি আবার কেমন ক'রে মানুষ বাঁচাল?" দেখ্‌তে সে ঠিক খেল্‌বার ভালুকের মতই ছিল, কিন্তু আকারে প্রকাণ্ড বড় ছিল, আর তার সমস্ত শরীর কর্কের মত হাল্কা এক রকমের জিনিসে ভরা ছিল; এত হাল্কা যে জলে ডোবেই না। টেডিকে কেউ জড়িয়ে ধর্‌লে সেও আপনা থেকে তাকে জড়িয়ে ধর্‌ত—টেডির শরীরের ভিতরে ঐরকমের কলের ব্যবস্থা ছিল। একদিন সেখানেরই একটি ভদ্রলোক—যিনি একটুও সাঁতার জানেন না—টেডির ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে প'ড়েই তিনি টেডিকে জড়িয়ে ধর্‌লেন আর টেডিও অমনি তাঁকে জড়িয়ে ধর্‌ল;—তিনি আর ডুব্‌লেন না।

(৩) বহুরূপী ব্যাঙ্

সবুজ গেছো-ব্যাঙ্ নিজের গায়ের রং বদ্‌লাতে বড় ওস্তাদ। একবার বিলাতে একজন দোকানদার এরকম অনেক ব্যাঙ্ বিক্রীর জন্য এনেছিল। একটি ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্ পুষ্‌বার ইচ্ছায় সে দোকানে ব্যাঙ্ কিন্‌তে গেলেন। সেখানে সবুজ, পাট্‌কিলে আর ধূসর রংএর ব্যাঙ্ ছিল। তিনি একটা ভাল সবুজ ব্যাঙ্ কিনে একটা পাট্‌কিলে কাগজের ঠোঙায় ভ'রে সেটাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। পরদিন ভদ্রমহিলাটি ফিরে এসে দোকানদারের উপর খুব রাগ ক'রে বল্‌লেন, "আমি সবুজ ব্যাঙ্ চেয়েছিলাম, তুমি কেন পাট্‌কিলে রংএর ব্যাঙ্ দিয়েছ?" দোকানদার বল্‌ল, "আপনার সাম্‌নেই তো আমি সবুজ ব্যাঙ্ ঠোঙায় ভরে দিয়েছিলাম। পাট্‌কিলে ঠোঙায় ছিল ব'লে সে তার রং বদ্‌লে নিয়েছে।"

শ্রীপুষ্পলতা রায়।

১৫০

কুমীর-চড়া

চার্ল্‌স্ ওয়াটারষ্টন নামে একটি সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানা দেশে থাক্‌তেন। জীবন্ত কুমীর ধর্‌বার জন্য তাঁর বড় সখ ছিল, কিন্তু, অনেক চেষ্টা ক'রেও একটিও জীবন্ত কুমীর ধর্‌তে পার্‌লেন না। শেষটায় তিনি ঐ কাজের জন্য একটি দেশী লোককে নিযুক্ত কর্‌লেন। সে কর্‌ল কি, একটা লম্বা দড়ির সঙ্গে একটা বাঁশ বেঁধে সেই বাঁশের আগায় চারটা কাঠ লাগিয়ে, তার সঙ্গে চারটে বঁড়শির মত বাঁকা তার এমন-ভাবে লাগালো যে, কুমীর ভায়া সে জিনিষটিকে যত গিল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে ততই সেটা তার গলায় আরো শক্ত হয়ে ব'সে যাবে। তারপর সেই বঁড়শিগুলিতে বেশ ক'রে টোপ লাগিয়ে জলের ধারে রেখে দেওয়া হ'লো। কুমীরকে ডাক্‌বার জন্য সে লোকটি একটা কচ্ছপের খোলার উপর ঘা মেরে অদ্ভুত আওয়াজ কর্‌তে লাগ্‌ল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, তার একটু বাদেই প্রকাণ্ড এক কুমীর এসে সেই টোপ ক'রে গিলে ফেল্‌ল। আর যাবে কোথা! অম্নি কুমীর ভায়া ধরা প'ড়ে গেল। লোকটি তার ৩।৪টি সঙ্গী এনে দড়ি ধ'রে হেঁইয়ো-জোয়ান ক'রে টান লাগাতেই, কুমীরও লক্ষ্মী ছেলের মত জল থেকে উঠে এল। ওয়াটারষ্টন সাহেব গোলমাল শুনে দৌড়ে এসেই তড়াক্ ক'রে কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বস্‌লেন। প্রথমে সে বিষম আপত্তি কর্‌ল আর প্রাণপণে ল্যাজ নাড়িয়ে সাহেবকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু, সাহেবও তাড়াতাড়ি তার সাম্নের ঠ্যাং-জোড়া পিঠ-মোড়া ক'রে ধ'রে ফেলায় কুমীর বেশী কিছু কর্‌তে পার্‌ল না। তারপর টানা হিচ্‌ড়া ক'রে কুমীরভায়াকে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে, আচ্ছা ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হ'লো যাতে সে আর অনিষ্ট না কর্‌তে পারে। পরের পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, সাহেব কুমীরের পিঠে চ'ড়ে চ'লেছেন আর কয়েকজনে মিলে হেঁইয়ো-জোয়ান ক'রে কুমীরকে টেনে নিয়ে চ'লেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা



একাদশ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৩০ | ১২শ সংখ্যা

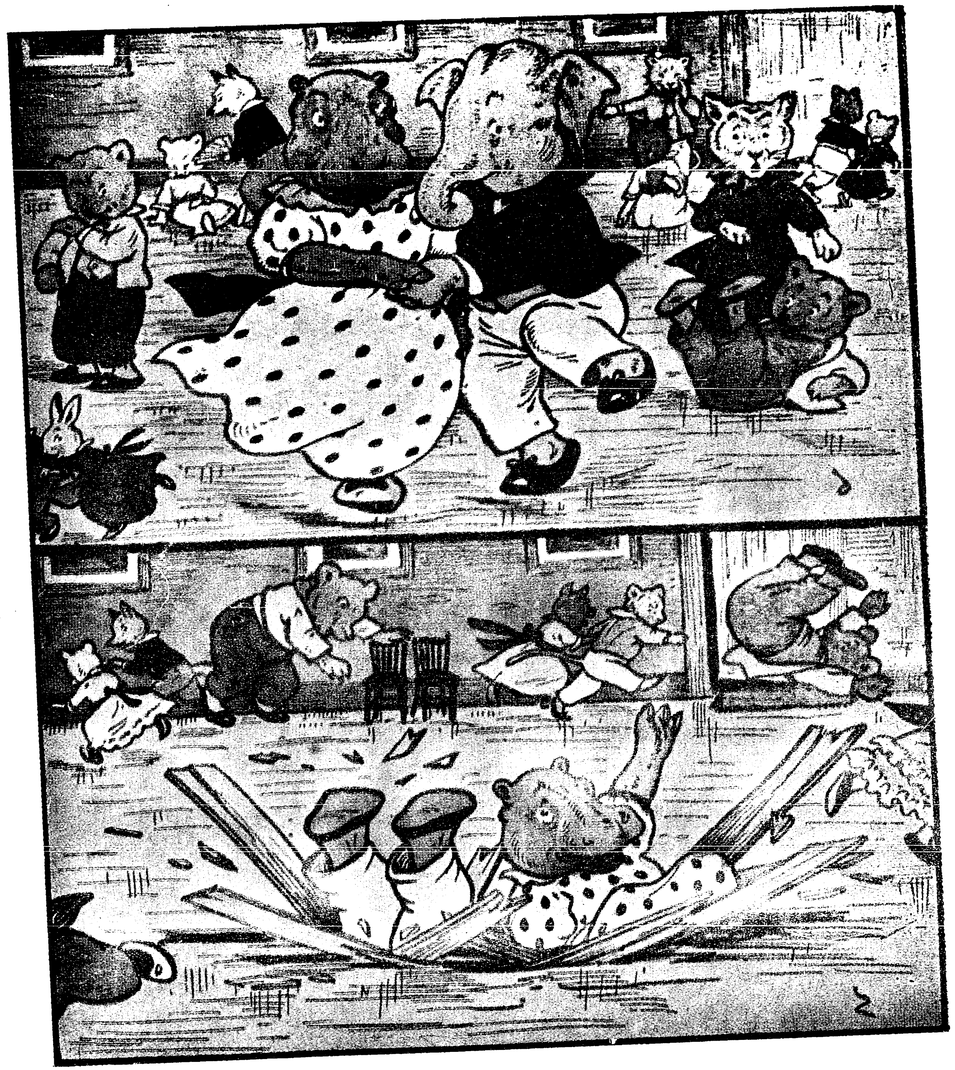

(১) সবায় ছেড়ে নাচ্‌ছে তেড়ে হোঁৎকা ছুটো আহ্লাদী,
বল্‌ছে হেঁকে সবায় ডেকে, "আয় না নাচের পাল্লা দি'।"

(২) তক্তা-ঢাকা, পোক্ত-পাকা, কাঠের মেজে ভাঙ্‌ল রে,
হিপ্পো-হাতীর নাচের পালা সাঙ্গ হ'লো চট্ ক'রে।

শিশুর জয়

শিশুরা সব জিদ্ ধরেছে, ছোট তারা রইবে না ;
হাত পা নেড়ে উঠ্‌বে বেড়ে, আধ কথা কইবে না।
দুধ্ খেয়ে তাই এক চুমুকে খাচ্ছে পরে ডিগ্‌বাজি ;
বাবার লাঠি জুতার পাটি নিতে আছে ঠিক রাজি।
ফাঁকের বায়ু লাগিয়ে আয়ু বাড়ায় গিয়ে ময়দানে ;
জয়-ধ্বজা উড়িয়ে চেঁচায়, মেরে পিটে শয়তানে।
আনন্দেতে চল্‌ছে মেতে আরাম করার স্বাদ ভুলে ;
শিশুর বিজয় বুড়া গাহে আশীর্ব্বাদের হাত তুলে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

COLOURED DOCUMENT.

সেলাই-বাক্স

লীলা একটা ছোট সহরে তার ঠাকুরমার কাছে থাকে। তাদের বাড়ীটা সহরের বাইরে খোলা জায়গায়। বাড়ীর এক পাশে স্কুল, আর একদিকে মাঠের মধ্যে একটি কুঁড়ে ঘর, সেটাতে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থাকে, তাদের কেউ নাই, তারা খুব গরীব—ছোট্ট ঘরটিতে অনেক কষ্টে থাকে। তাদের সবচেয়ে বড় বোন শোভার সঙ্গে লীলার খুব ভাব। লীলা প্রায়ই তাদের বাড়ী যায় আর যাবার সময়ে শোভার ছোট ছোট ভাই বোনদের জন্য কিছু না কিছু কিনে নিয়ে যায়। তারা জিনিষ পেয়ে খুসী হয়, তাই দেখ্‌তে লীলার খুব ভাল লাগে।

একদিন লীলা স্কুলে গিয়ে দেখ্‌ল, তার ক্লাসের বীণা বলে একটি মেয়ে খুব সুন্দর একটা সেলাইএর বাক্স এনেছে, তার ঢাক্‌নীতে কেমন সুন্দর ফুলপাতা কাটা, বাক্সের ভিতর কেমন সিল্কের গদি দেওয়া, ছোট ছোট খোপের মধ্যে কাঁচি, ছুঁচ, উল বুন্‌বার কাঁটা, রঙ্গিন সুতার রিল, আর সেলাই কর্‌বার নানান্ রকম জিনিষ সাজান রয়েছে। বাক্সটা দেখে লীলারও সে রকম একটা কিন্‌বার ইচ্ছা হ'ল, সে বীণাকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লো যে বাক্সটার দাম 'দশ টাকা'।

বাড়ী এসে লীলা তার ঠাকুরমার কাছে সেই রকম একটা সেলাইএর বাক্স চাইল; কিন্তু দাম শুনে তার ঠাকুরমা বল্লেন, "ও বাবা! অত দামের জিনিষ কোথা থেকে পাব?" লীলা তখন ভাব্‌লো যে, তার হাত খরচের টাকা জমিয়ে সে সেলাই বাক্স কিন্‌বে, কিন্তু হাত খরচ তো বেশী পায় না, দশ টাকা জমাতে ঢের দেরী হবে—তা যতই দেরী হোক্, সে ঠিক কর্‌লো যে টাকা জমাবেই। লীলা লজঞ্চুস আর কাঁচের পুতুল খুব ভালবাস্‌তো কিন্তু টাকা জমাতে আরম্ভ করার পর থেকে, সে সব সখ ছেড়ে দিল। সে শোভার ভাই বোনদের জন্য সর্ব্বদা কিছু না কিছু নিয়ে যেত, এখন সে শোভাদের বাড়ীতে যায় না, পাছে শোভার ভাই বোনেরা কিছু চায়, তাহলে ত টাকা খরচ হয়ে যাবে। কত সময়ে পথে শোভার সঙ্গে দেখা হয়, শোভা তাদের বাড়ী যেতে বলে, লীলা "যাব" বলে কিন্তু যায় না,—কিছু না নিয়ে গেলেও ভাল লাগে না, অথচ দিতে গেলেই বা চলে কি করে? স্কুল থেকে আস্‌বার সময় রাস্তার ধারে একটি খোঁড়া ভিখারী বসে থাকে, লীলা তাকে রোজ

একটা করে পয়সা দিত, আর ভিখারীও তাকে দূর থেকে দেখ্‌তে পেলেই হাস্‌ত। সে দিনও তাকে আস্‌তে দেখে ভিখারী হাস্‌তে লাগ্‌ল। লীলা একবার ভাব্‌ল "একটা পয়সাই তো, দিয়ে দিই।" তারপর আবার ভাব্‌ল, "রোজ একটা করে দিতে দিতে শেষকালে অনেক খরচ হয়ে যাবে।" পয়সা দেওয়া হ'ল না, ভিখারী ওর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। লীলারও মনে কষ্ট হ'ল, কিন্তু বাক্সটার উপরে তার খুবই লোভ ছিল, তাই সে মন শক্ত করে রইল—এরপর থেকে আর কখনও সেই রাস্তা দিয়ে সে বাড়ী ফির্‌ত না।

এমনি করে যে দিন লীলার দশটি টাকা জম্‌ল, সেই দিন বিকালে বেড়াতে যাবার সময়ে সে তার টাকার থলিটি সঙ্গে নিল; ভাব্‌ল, ফির্‌বার সময় বীণাদের বাড়ী গিয়ে তাকে বল্‌বে ঐ রকম একটি বাক্স আনিয়ে দিতে। বেড়াতে বেড়াতে টাকাগুলো আর একবার গুণে নেবার জন্য, লীলা ঘাসের উপর বসে সেগুলো কোলে ঢাল্‌লো। টাকা গুণ্‌ছে, এমন সময় শোভার ছোট ভাই খোকা এসেই অবাক্ হয়ে বল্ল, "কত টাকা! লীলাদিদি, এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?" লীলা তার কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লো, "খোকা, তোমার মুখ এমন শুখ্‌নো কেন? জলখাবার খেয়েছ?" ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বল্ল, "না।"—"কেন? দিদি তোমাকে খেতে দেয়নি?"

খোকা কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্ল, "না—দিদির কাছে পয়সা নাই।" তখন লীলার মনে কে যেন বল্ল, "দেখ্‌ছ না ওরা কত গরীব খেতে পায় না, তোমার টাকাগুলো ওদের দাও।" লীলা তার সমস্ত টাকা পয়সা খোকার হাতে দিয়ে বল্ল, "এইগুলো তোমার দিদিকে দাও, এই দিয়ে দিদি খাবার কিনে দেবে।" খোকা নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল, আর লীলাও খানিকক্ষণ কি ভাব্‌ল, তারপর বাড়ী চলে গেল।

এত কষ্ট করে টাকা জমিয়েও বাক্স কেনা হ'ল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তার জন্যে ত লীলার মনে বিশেষ কিছুই কষ্ট হচ্ছে না!

পরদিন স্কুলে যাবার সময়ে লীলা দেখ্‌ল, তার বইএর সঙ্গে সেই রকম একটা সেলাইএর বাক্স রয়েছে। সেটার হাতলের সঙ্গে একটা ছোট কাগজ বাঁধা, তাতে লেখা আছে—

"লীলা যে একটা খুব ভাল কাজ করেছে, তার পুরস্কার স্বরূপ তাকে এটা দিলাম
ঠাকুরমা।"

ঠাকুরমা যে আবার তার গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌ছেন তা লীলা জান্‌ত না। সেই থেকে লীলা বুঝ্‌ল যে, স্বার্থপরের মতন শুধু নিজের জন্য টাকা জমানর চেয়ে অন্যের কাজে লাগালেই বেশী সুখ!

শ্রীকল্যাণী চক্রবর্ত্তী।

প্রতারণার ছাই

লোমীর মায়ের বড্ড অসুখ, তাই সে মাকে খুব মন দিয়ে দেখ্‌ছিল; মায়ের জন্য তার মনটা ভারি খারাপ।

অনেক দিন হ'ল তার বাবা দূরদেশে চাক্‌রীর চেষ্টায় গিয়েছেন; আর তাঁর কোন খবরও পাওয়া যায়নি। বিদেশ থেকে তাদের খরচের জন্য যখন তিনি একটী পয়সা পর্য্যন্ত পাঠালেন না, তখন তারা ভেবেছে যে, তিনি দূরদেশে বুঝি মারাই গিয়েছেন।

যদিও লোমী আর তার মা একেবারে অচেনা এক গ্রামে থাক্‌তেন, তবু প্রথমে তাঁদের কোন কষ্ট পেতে হয়নি। কারণ, তাঁদের সেই ছোট বাগানটীতে যথেষ্ট তরী-তরকারী হ'ত, তাতেই খাওয়া চলে যেত; আর রাস্তার ধার থেকে খড় কুটো তুলে এনে আগুন জ্বালান হ'ত। কিন্তু এখন মায়ের অসুখ করেছে, তাই লোমী একেবারে অসহায়। সে একা কি কর্‌তে পারে? যতবার সে নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাব্‌ছে, তত তার ভবিষ্যৎটা অন্ধকার মনে হচ্ছে।

এই সময়ে একদিন একজন বিদেশী জ্ঞানী লোক সেই গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোমীদের বাড়ীর কাছে এলে পর, সে সাহস করে তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌ল—"মশাই! অনুগ্রহ করে আমার মাকে একবার এসে দেখে যান। তাঁর বড্ড অসুখ করেছে, দয়া করে বলে দিন্ আমাকে কি কর্‌তে হবে।" ভদ্রলোকটী লোমীর কাতর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে তাদের কুঁড়ে ঘরে ঢুক্‌লেন। অল্পক্ষণ ঘরে থেকে, বাইরে এসে লোমীর হাতে একটা ওষুধের শিশি দিয়ে বল্‌লেন—"যখনই তোমার মার ক্ষিদে পাবে তখনই তাঁকে পুষ্টিকর খাদ্য বেশ পেট ভরে খেতে দিবে; তাহ'লেই শরীর আবার সেরে যাবে। আর পুষ্টিকর খাদ্য যদি জোগাড় কর্‌তে না পার, তাহ'লে শুধু ডিম খেতে দিলেই চল্‌বে।" এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

ভদ্রলোকটী চলে গেলে লোমী ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "কি করে আমি ডিম পাব? বাড়ীতে একটাও মুরগী নাই আর থলিতে একটা পয়সাও নাই। বিদেশী ডাক্তারেরা শুধু হুকুম দিয়েই যেতে পারেন, তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন না যে, গরীবের পক্ষে এ সব সংগ্রহ করা কি রকম কষ্টকর। নিজেদের গ্রামে যদি থাক্‌তাম, তবে আর বিশেষ কোন মুস্কিল হতো না—কেউ না কেউ ডিম জোগাড় করে দিত।"

একলাটী দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাব্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ তার নজর পড়্‌ল এক দল দোয়েল পাখীর উপর। তারা কাছেই তাদের বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হ'ল যে, নিশ্চয়ই তাদের বাসায় ডিম আছে আর সেই ডিম তো তার মায়ের জন্য নিয়ে গেলেই পারে?—তক্ষুণি সে কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নদীর ধারে, সেই দোয়েল পাখীদের যে গাছে বাসা ছিল তার তলায় গিয়ে উপস্থিত! সে শুন্‌তে পেল, গাছের উপর উঁচুতে পাখীরা কিচির মিচির কর্‌ছে। তাড়াতাড়ি সে জুতো খুলে একটা সহজ গাছ বেছে নিয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। চীনদেশের ছেলেরা সাধারণতঃ গাছে উঠ্‌তে জানে না, কিন্তু লোমী এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সে খুব তাড়াতাড়ি একেবারে উপরে উঠে গিয়েছিল। দোয়েল পাখীদের বাসার মধ্যে হাত দিয়ে যখন তিন্‌টে ডিম পেল, তখন আর তার আনন্দের সীমা রইল না। যাতে ভেঙ্গে না যায় সেই জন্য একটী ডিম মুখের মধ্যে রেখে, আর দুটো সাবধানে নিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। পাছে মা ব্যস্ত হ'ন এই ভেবে সে ছুটে বাড়ীতে এসে দেখে, তিনি তখনও খুব ঘুমাচ্ছেন। খুব সাবধানে লোমী আগুন জ্বেলে ডিমগুলি সিদ্ধ কর্‌ল। যেই সিদ্ধ করা শেষ হয়েছে আর তার মারও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে।

তিনি বল্‌লেন—"আমাকে খেতে দাও; বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ভুট্টা খেতে আর ভাল লাগে না।" লোমী বল্‌ল—"মা! দেখ, তোমার জন্য আমি ডিম এনেছি।" এই বলে খুব আনন্দের সঙ্গে ডিমগুলি মাকে দিল।

তার মা অবাক্ হয়ে ডিমগুলির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"লোমী, এগুলো কিসের ডিম, এত ছোট হ'ল কি করে?" সত্যি কথা বল্‌লে মা বক্‌বেন এই ভেবে লোমী উত্তর দিল—"মা! ছোট মুরগীর ডিম তাই ডিমগুলোও ছোট হয়েছে।" এই বলে সে একটা ডিম নিয়ে ভাঙ্গতে আরম্ভ কর্‌ল। কিন্তু তার মধ্যে থেকে কুসুম টুসুম না বেরিয়ে, একটু জলের মত কি জানি কালো জিনিষ তার হাতে পড়ল।

বিরক্ত হয়ে লোমী সেটা ফেলে দিল। দ্বিতীয় ডিমটা তুলে নিয়ে যখন আবার ভাঙ্গতে যাবে, তখন মা বল্‌লেন—"লোমী, এটার যে দেখ্‌ছি খোসার উপর কাল কাল দাগ।"

লোমী বল্‌ল—"না মা, একেবারে শাদা ধপ্‌ধপে। অসুখে তোমার চোখ্‌টা বোধ হয় খারাপ হয়েছে।" কিন্তু এবারে ডিমটা ভাঙ্গতেই, একটা তীব্র গন্ধ বের হ'ল। লোমী ভারি রাগ করে আর নিরাশ হয়ে, ডিমটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে একেবারে চুরমার করে দিল। তখন লোমীকে একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে, তার মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আরও আছে?" সে বল্‌ল—"হ্যাঁ মা আর একটা আছে, কিন্তু ভাঙ্গতে ভয় হচ্ছে, পাছে এই রকম একটা কিছু হয়।" তবু মা তাকে ভাঙ্গতে আদেশ দিলেন।



এবারে লোমী ডিমটাকে আলোর কাছে নিয়ে খুব মন দিয়ে পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। মার মনে কি রকম সন্দেহ হওয়াতে ছেলেকে বল্‌লেন—"লোমী, নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছ, বল কি হয়েছে?"

এইবারে লোমী সমস্ত দোষ স্বীকার করে বল্‌ল—"মা, ডাক্তার তোমাকে ডিম খেতে বলেছিলেন কিন্তু ঘরে একটীও পয়সা না থাকাতে, আমি দোয়েল পাখীর

বাসা থেকে ডিম চুরি করে নিয়ে এসেছি।" এই কথা বলে সে তার তৃতীয় ডিমটা ভাঙ্গতেই তার চক্ষু স্থির। সেটা থেকে ছোট্ট খাট্ট কি রকম একটা জীব তার হাতে পড়ল। খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে লোমী দেখ্‌ল যে, সেটা আঙ্গুলের মত ছোট্ট, রামধনু রংএর পোষাক পরা, একজন পরী! পরী হাত নেড়ে লোমীকে ডাক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। তারপর যখন লোমী তাকে টেবিলের উপর রেখেছে তখন পরী বল্‌ল—"লোমী ভয় পেও না। আমি তোমার কোন অনিষ্ট কর্‌ব না।"

লোমী তো এই কথা শুনে হেসেই অস্থির। এইটুকু প্রাণী তার আবার অনিষ্ট কর্‌বে কি? কিন্তু তক্ষুণি তার পায়ে হঠাৎ এমন কট্ কট্ করে উঠ্‌ল যে, যন্ত্রণায় সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তাই দেখে পরী বল্‌ল—"কেঁদ না লোমী। আমাকে বিশ্বাস কর।"

পরীর কথার উত্তর দিবে কি? লোমীর জিব আট্‌কিয়ে গিয়ে চোখ উল্টে আস্‌তে লাগ্‌ল। তাই দেখে পরী বল্‌ল—"এইবারে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর্‌বে? তা না হ'লে আবার তোমাকে পরীক্ষা কর্‌ব।"

লোমী বল্‌ল—"না,না! যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যা বল্‌বে সব আমি বিশ্বাস কর্‌ব।"

তখন পরী বল্‌ল—"বেশ, তুমি আর মার জন্য কিছু ভেবো না। আমি যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ তাঁর আর কোন কষ্ট হবে না। দেখ, এখন তিনি কেমন আরামে ঘুমাচ্ছেন।"

পরীর কথা বাস্তবিকই সত্যি দেখে লোমীর খুব আনন্দ হ'ল। কিছুক্ষণ পর পরী আবার বল্‌ল—"লোমী! আমি তোমাকে একটা কাজ কর্‌তে দেব, যদি তুমি ভাল করে কাজটা কর তাহ'লে তোমার মা সেরে যাবেন। শুধু তাই নয়, তোমার বাবাও আবার ফিরে আস্‌তে পারেন। কেমন রাজী আছ ত?" লোমী তক্ষুণি রাজী হল।

পরী বলল—"তাহ'লে শিগ্‌গির যাও; পাহাড়ের উপর ঐ মন্দিরে গিয়েই দেখ্‌বে, দরজার কাছে একটা কাঁসার পাত্রে ধূপ ধূনার ছাই আছে; একমুঠো ছাই আমার জন্য নিয়ে এস। দেখো, দেরী করো না যেন—কারণ, সকাল হ'লে আমি আর এখানে থাক্‌ব না। এর মধ্যে যদি না ফির্‌তে পার তাহ'লে তোমার মা আর ভাল হবেন না।"

লোমী তো তক্ষুণি অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। কাছেই মন্দিরটা ছিল। মন্দিরে ঢুকে পরীর কথা মত ছাই নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে আস্‌ছে, এমন সময়

পাহাড়ের নীচে মন্দিরের দরজার প্রহরী তাকে ধরে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"তুমি হাতের মুঠোর মধ্যে এত শক্ত করে ধরে কি নিয়ে যাচ্ছ?"

লোমী সত্যি কথা বল্‌তে ভয় পেল, পাছে প্রহরী ভাবে যে সে মন্দির থেকে কিছু চুরী করে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই শুধু বল্‌ল—"কিছু না, শুধু খানিকটা ভুষি নিয়ে যাচ্ছি—মায়ের ওষুধে মিশাতে হবে।"

প্রহরীর সন্দেহ হওয়ায় সে এত জোরে লোমীর হাত চেপে ধর্‌ল যে, বেচারার হাত খুলে গেল আর বাতাসে সব ছাই উড়ে গেল। তখন প্রহরী ধমক দিয়ে লোমীকে তাড়িয়ে দিল। বেচারা লোমী কি কর্‌বে ভেবেই পেল না। পরী বলে দিয়েছে, ছাই না নিয়ে বাড়ীতে ফির্‌লে তার মা আর ভাল হবেন না। এখন এক মাত্র উপায় আছে যে, আবার দৌড়ে গিয়ে সেই পূজার ছাই নিয়ে আসা। দূর ছাই! তার চেয়ে পাহারাওয়ালাকে সত্যি কথা বল্‌লেই ত হ'ত। যাহোক্, বেচারা আবার মন্দিরের দিকেই ফির্‌ল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে পা আর তার চল্‌ছে না। তখন সে ভাব্‌ল—"অন্য ছাই নিয়ে গেলেও তো চলে। কে টের পাবে যে ঠিক মন্দিরের ছাই কি না।" এই ভেবে সে কাছেই অন্য একটা মন্দির থেকে ছাই নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। বাড়ীর দরজার কাছে এসে, লোমী আশ্চর্য্য হয়ে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল যে, ছাইয়ের চিহ্নমাত্রও তার হাতে নাই; বাতাসও হয়নি, যে তা উড়িয়ে নেবে! দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ করে, পরীর কাছে ফিরে যেতে তার ভারি লজ্জা বোধ হতে লাগ্‌ল। যখন তার নিজের মনটাকেই সে প্রতারণাদ্বারা মলিন করে ফেলেছে, তখন তার পরীর সাহায্যের আশা করারই বা কি অধিকার আছে? এই ভেবে, সে তার ক্লান্তি সত্ত্বেও পরীর নির্দ্দেশ মত সেই পাহাড়ের ডগার মন্দিরে গিয়েই এক মুঠো ছাই নিয়ে আবার ফিরে এ'ল। এখন তার মনে বাস্তবিকই খুব আনন্দ হয়েছে; জীবনে কখনও সে এত আনন্দ পায়নি। এবারে সে খুব ভাল করেই বুঝ্‌তে পেরেছে যে, মিথ্যার চেয়ে সত্যের বল কত বেশী।

বাড়ীর কাছে এসে সে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল; এবারে আর দরজার কাছে এক মিনিট দাঁড়ালও না। তখন সবে ভোর হয়ে আস্‌ছে; লোমীর বড় ভয় হ'ল, পাছে পরী তার প্রতিজ্ঞা না রেখে চলে যায়। ঘরে ঢুক্‌তেই কে যেন বল্‌ল—"লোমী, তুমি এসেছ? অনেকক্ষণ হ'ল ত তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে!"

আশ্চর্য্য হয়ে সে তাকিয়ে দেখ্‌ল যে, তার মা পোষাক-টোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন।

লোমী হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল—"মা, কেন উঠেছ, তুমি মরে যাবে যে?"

মা বল্‌লেন—"না, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। একজন পরী আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিল, আর আমিও আবার আগের মত ভাল হয়ে গিয়েছি। তুমি যেই বাড়ীর দরজায় ঢুক্‌লে তখন পরীও "আর ভাবনা নাই" বলে চলে গেল।"

লোমী বড় নিরাশ হয়ে বল্‌ল—"মা, পরী "ছাই" সম্বন্ধে কিছু বলে যায়নি?"

মা বল্‌লেন—"ছাইএর বিষয় কি জানি বলেছিল। হাঁ, হাঁ আমার মনে হয়েছে—পরী বলেছিল—'প্রতারণার ছাই থেকেই, ভগবানের কৃপায়, এখন সুখের উৎপত্তি হয়েছে'।" তখন লোমী তার হাতের মুঠো খুলেই আশ্চর্য্য হয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল! দেখ্‌ল, হাতের মুঠোতে ছাইএর বদলে, ঠিক দোয়েল পাখীর ডিমের মত তিন্‌টে সোণার ডিম রয়েছে!

ঠিক এই সময়ে বাইরে দরজা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হ'ল। মা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"লোমী! দরজা খুলে দাও, তোমার বাবা এসেছেন।"

শ্রীইলা রায়।

মাম্মির পা

(২)

মেয়েটি দুই তিন বার হাত দিয়ে কাটা পা-কে ধর্‌তে চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু ধর্‌তে পার্‌ল না। তখন পায়ের সঙ্গে মেয়েটির কথাবার্ত্তা আরম্ভ হলো—মিশর দেশীয় ভাষায়। সৌভাগ্যবশতঃ ভদ্রলোকটি ঐ ভাষা জান্‌তেন। তিনি শুন্‌লেন, মেয়েটি বল্‌ছে—"লক্ষ্মী পা আমার! কেন তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? তোমাকে ত আমি খুবই যত্ন কর্‌তাম। স্ফটিকের পাত্রে সুগন্ধি জল নিয়ে তোমাকে আমি কত যত্ন করে ধুয়ে দিতাম। সোণার কাঁচি দিয়ে তোমার নখ কেটে নিতাম।—তবু কেন তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ, আমাকে ধরা দাও না?"

পা উত্তর কর্‌ল—"তুমি ত জান, এখন আমি আর আমার নিজের নই—আমাকে বিক্রী করে ফেলেছে। তোমার উপর হতভাগা য়িহুদীর রাগ ছিল, তাই, সে গুপ্তচর পাঠিয়ে কবর থেকে তোমার পা কাটিয়ে এনেছে—যাতে নাকি মরার

পর তোমার জাতির সঙ্গে তোমার পুনর্মিলন না হয়। তোমার কাছে যদি পাঁচ পাউণ্ড থাকে, তবে, আমাকে আবার কিনে নাও।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজকুমারী হারমন্‌থিস্ বল্‌লেন—“হায়! আমার হীরা, মুক্তা, মণি, মাণিক্য, টাকা মোহর সবই যে চুরি হয়েছে—পাঁচ পাউণ্ড কোথায় পাব?”

এমন সময় ভদ্রলোকটি বলে উঠ্‌লেন—“রাজকুমারি! অন্যায় করে আমি কারো পা রাখ্‌তে চাই না। পাঁচ পাউণ্ড এখনই আপনাকে দিচ্ছি। আমার জন্য যদি রাজকুমারী হার্‌মন্‌থিসের ন্যায় সুন্দরীর পা খোঁড়া হয়ে থাকে—তবে আমাকে ধিক্।” এই বলে তিনি তখনই রাজকুমারীকে পাঁচটি মোহর দিলেন আর রাজকুমারী ভারি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর দিকে চাইলেন।

তখন আর কথা কি? বিনা আপত্তিতে পা ধরা দিল, রাজকুমারী পরম যত্নে, যেন নূতন জুতা পায়ে দিচ্ছেন, তেমনি করে কাটা পা-টি নিজের খোঁড়া পায়ে লাগিয়ে দিলেন। আর তখনই চেষ্টা করে দেখ্‌লেন, যে, ঠিক আগেকার মতই আবার তিনি হাঁট্‌তে পার্‌ছেন।



তা দেখে ভদ্রলোকটিকে বল্‌লেন—“বাবা কত খুসী হবেন! আমার পা কাটা যাওয়ায় তাঁর মনে ভারি দুঃখ হয়েছিল, দেশ বিদেশে কত সন্ধান করেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করে চলুন আমার সঙ্গে বাবার কাছে—তিনি আপনাকে কত ধন্যবাদ কর্‌বেন। আপনার আদর যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।”

রাজকুমারীর অনুরোধ শুনে ভদ্রলোকটি তখনই প্রস্তুত হলেন। পায়ে তুর্কি

চটি পরে, গায়ে বড় বড় ফুলওয়ালা কাপড়ের ড্রেসিং-গাউন পরে—যেন তিনিও ইজিপ্টেরই লোক।

রোয়ানা হবার আগে, রাজকুমারী তাঁর গলা থেকে সেই ঝুলান সবুজ পুতুলটি নিয়ে, টেবিলের উপর যে কাগজগুলি ছড়ান ছিল, সেগুলি চাপা দিলেন। চাপা দিতে দিতে ভদ্রলোকটিকে বল্‌লেন—“আপনার ত একটা পেপার্-ওয়েট্ চাই, তাই এটাই দিয়ে গেলাম।” এই বলে ভদ্রলোকটির একখানা হাত ধরে, শূন্যে রোয়ানা হলেন।

সে কি সহজ রোয়ানা! কাণ শোঁ শোঁ কর্‌তে লাগ্‌ল, দম বন্ধ হবার জোগাড়—তাঁরা যেন কামানের গোলার মত ছুটেছেন। চারিদিকে খালি আকাশ আর সমুদ্র; ক্রমে দূরে যেন বড় বড় চূড়াওয়ালা ঘরবাড়ী দেখা গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁরা গন্তব্য স্থানে এসে পড়লেন।

রাজকুমারী ভদ্রলোকটিকে নিয়ে, একটা গোলাপী মারবল্ পাথরের পাহাড়ের কাছে নাম্‌লেন। সেই পাহাড়ের গায়ে খুব সরু একটা ফাটল ছিল, সেখানে গিয়ে রাজকুমারী আলো জ্বেলে আগে আগে চল্‌লেন। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য বারান্দা পার হয়ে, একটা বড় ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘরের মাঝখানে বিশাল গর্ত্ত, স্ক্রুর পেঁচের মত পাকান লোহার সিঁড়ি বেয়ে দুজনে নীচে নাম্‌লেন। তারপর আরো ঘর আরো বারান্দা পার হয়ে, অবশেষে প্রকাণ্ড একটা হলে গিয়ে উপস্থিত। তেমন বড় হল ভদ্রলোকটি জীবনে কখন দেখেন নাই, হলের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত দেখাই যায় না। হলের চারিদিকে প্রকাণ্ড বড় বড় থাম, তার মধ্যে তারার মত মিট্ মিট্ করে প্রদীপ জ্বল্‌ছে—হল যুড়ে সারি সারি সব মাম্মি বসে রয়েছে। রাজকুমারী তখনও ভদ্রলোকটির হাত ধরেই চলেছেন, আর তাঁর পরিচিত মাম্মি দেখ্‌লেই নমস্কার কর্‌ছেন।

ক্রমে ভদ্রলোকটির চক্ষু সেই মৃদু আলোকে অভ্যস্ত হলে, তিনিও দেখ্‌লেন—হল ভরা ইজিপ্টের প্রাচীন রাজাদের মাম্মি। সকলেই বৃদ্ধ। গায়ের চাম্‌ড়া শুক্‌নো আর পার্চ্চমেণ্ট্ কাগজের মত কোঁচ্‌কান হলেও, সকলেরই খুব জম্‌কাল চেহারা—গলায় বুকে সোণার উজ্জ্বল বর্ম্ম, তাতে মূল্যবান্ পাথরের কাজ। চক্ষু উজ্জ্বল এবং পলক-শূন্য আর প্রত্যেকের পিছনে, তাঁদের সঙ্গী দণ্ডায়মান!

খানিকক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়ে, রাজকুমারী তাঁকে তাঁর পিতা ফ্যারেওর নিকট

নিয়ে গেলে পর, ফ্যারেও ভদ্রলোকটিকে মাথা নীচু করে নমস্কার কর্‌লেন। তখন রাজকুমারী আহ্লাদে হাততালি দিতে দিতে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"বাবা! আমার কাটা পা ফিরিয়ে পেয়েছি—আর এই ভদ্রলোকটির অনুগ্রহেই পেয়েছি।"

ফ্যারেওর হাতে সোণার রাজদণ্ড ছিল, তার ডগায় একটি পদ্মফুল। সেই দণ্ড দিয়ে ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে আনন্দে বলে উঠ্‌লেন—"খুব বাহাদুর ছেলে বটে! তুমি কি পুরস্কার চাও বাবা?"

স্বপ্নের ঘোরে লোকের সাহসের সীমা থাকে না। সেই সাহসের ভরে ভদ্রলোকটি অসম্ভব প্রার্থনা করে ফেল্‌লেন—"আমি রাজকুমারী হারমন্‌থিস্‌কে বিয়ে কর্‌তে চাই।"

এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনে, ফ্যারেও বিস্ময়ে চক্ষুদুটি বড় করে বল্‌লেন—"তুমি কোন্ দেশের লোক? তোমার বয়স কত?"

ভদ্রলোক—"পূজ্যপাদ ফ্যারেও! আমি ফরাসী, আমার বয়স ২৭ বৎসর।" এই কথা শুনে হলের প্রতি সিংহাসন থেকে গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হলো—"২৭ বৎসরের ছেলে রাজকুমারী হারমন্‌থিস্‌কে বিয়ে কর্‌তে চায়? যাঁর বয়স ত্রিশ শতাব্দী পূর্ণ হয়েছে!! কি অদ্ভুত!" ভদ্রলোকটির প্রার্থনা শুধু হারমন্‌থিস্‌ই অসঙ্গত বলে মনে কর্‌লেন না।

ফ্যারেও বল্‌লেন—"বাছা! তোমার বয়স যদি অন্ততঃ দুই হাজার বৎসরও হতো, তবু রাজকুমারীকে দিতে পারতাম। কিন্তু, এ-যে ভীষণ তফাৎ। তাছাড়া, যার শরীর কোনদিন নষ্ট হবে না, তেমন লোকই রাজকুমারীর স্বামী হবার যোগ্য; তোমার শরীর কি করে রক্ষা হবে, তা ত তুমি জাননা? এমন কি, ১৪।১৫ শতাব্দী পূর্ব্বেও যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের শরীরও ত এখন এক মুঠা ধূলি বই আর কিছুই নয়! কিন্তু, এই দেখ! আমার মাংস এখনও পাথরের মত শক্ত আর শরীরের হাড় লোহার মত মজবুত। দেখ, এখনও আমার শরীরে কত শক্তি আছে।" এই বলেই ফ্যারেও সাহেবি কায়দায় ভদ্রলোকটির করমর্দ্দন কর্‌লেন।

বাপ্‌রে বাপ্, কি ভীষণ মর্দ্দন!! ভদ্রলোকটির আঙ্গুল কেটে আংটিটা তাঁর মাংসের মধ্যে ঢুকে গেল—দারুণ যন্ত্রণায় বা কোথায় গেল তাঁর তন্দ্রার ভাব আর কোথায় বা গেল তাঁর স্বপ্ন! ধড়ফড় করে জেগে দেখেন, তাঁর এক বন্ধু তাঁকে জাগাবার জন্য তাঁর কাঁধ ধরে ক্রমাগত নাড়া দিচ্ছেন আর বল্‌ছেন—"একি

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা! তোমার ঘুম ভাঙ্গার জন্য কি কাণের কাছে কামান দাগ্‌তে হবে নাকি? বেলা বারটা যে বেজে গিয়েছে, আমাকে না বলেছিলে আজ সকালে কোথায় নিয়ে যাবে?"

বল্‌তেই ত ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে পোষাক পর্‌তে পর্‌তে বল্‌লেন—"কি সর্ব্বনাশ! তাইত ভাই, বড্ড ভুলে গিয়েছি—চল, এখনই যাই।"

ভদ্রলোকটি স্বপ্নের ঘটনা বন্ধুকে কিছুই বল্‌লেন না কিন্তু টেবিলের দিকে চেয়েই অবাক্ হয়ে গেলেন—মাম্মির কাটা পা-টি টেবিলের উপর নাই, তার বদলে রাজকুমারী হারমন্‌থিস্ যে সবুজ রংএর পুতুলটি রেখে গিয়েছিলেন, সেটিই পেপার-ওয়েটের কাজ কর্‌ছে!!

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

দাবা-বড়ে খেলা

বহুকাল আগে আমাদের দেশে এক অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁর একটি ব্রাহ্মণ প্রজা মনে মনে ভাব্‌ল, "যে কোন রকমে হোক্, রাজা মশায়ের অত্যাচার করার স্বভাবটা দূর কর্‌ব।" সে একটা নূতন খেলা বের কর্‌ল, তার নাম দিল "দাবা-বড়ে"। এই খেলায় রাজা একলা থাক্‌লে তার কোন ক্ষমতা থাকে না আর তাকে একজন সামান্য প্রজাও ("ব'ড়ে") রক্ষা কর্‌তে পারে, আবার অন্যদিকে একটি প্রজা হারিয়ে রাজা একেবারেই হেরে যেতে পারে।

কিছুদিন বাদে দাবা-বড়ে খেলার নাম দেশ-বিদেশের লোকে জান্‌তে পার্‌ল আর এই অত্যাচারী রাজাও সে খেলা শিখ্‌তে চাইলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ রাজা মশাইকে খেলা শেখাল, আর ভাল ভাবে চালালে প্রজা দ্বারা কত সুবিধা হয় তাও শেখাল।

এ খেলায় রাজার অনেক শিক্ষা হ'লো আর তিনি দেখ্‌লেন যে, ভাল ক'রে শাসন কর্‌লে প্রজারও কত সুখ হয়। তিনি ব্রাহ্মণকে বল্লেন, "তুমি যা' চাও তাই পাবে। বল কি দেবো!" ব্রাহ্মণ দাবা-বড়ের ছকের ঘরগুলি দেখিয়ে বল্ল, "এই দাবা-বড়ের ছকের ঘর হিসাব ক'রে প্রথম ঘরে একটা চাল, দ্বিতীয় ঘরে তার দ্বিগুণ

অর্থাৎ দুটো চাল, তৃতীয় ঘরে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ চারটা চাল, চতুর্থ ঘরে তারও দ্বিগুণ অর্থাৎ আটটা চাল—এমনি করে ৬৪টা ঘরের হিসাবে মোট যত চাল হয়, ততগুলি চাল পেলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে।"

রাজা তো শুনে চটেই উঠ্‌লেন—"রাজার কাছে এইটুকু পুরস্কার চাইতে তোমার লজ্জা কর্‌ল না? অন্য দামী কিছু চাও।" ব্রাহ্মণ আর কিছু চাইতে রাজী হ'লো না। তখন রাজামশাই খাজাঞ্চীকে হুকুম দিলেন যে, তাকে এই সামান্য চাল দিয়ে বিদায় ক'রে দেওয়া হোক্। খাজাঞ্চী হিসাব ক'রে কিছুক্ষণ পরে ব্যস্ত হয়ে রাজাকে খবর দিলেন যে, অত চাল তাঁর রাজ্যেই নেই!

রাজা তখন খুবই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন আর সেই বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণকে ডেকে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত কর্‌লেন। এর ফলে সে রাজ্যের লোকেরা যে সুখী হয়েছিল, সে কথা তোমরা সহজেই বুঝ্‌তে পার।

তোমরা হিসাবটি একবার করে দেখ্‌তে চেষ্টা কর; দেখ্‌বে কত বড় হিসাব হয়।

শ্রীপুষ্পলতা রায়।

দুখিয়ার সুখ

(৪)

যত দিন হ'ল দুখিয়া শিকারে গিয়েছে, তার মা খাওয়া দাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছে। সে দিন সকাল বেলা সে পুকুরে স্নান করে বাড়ী ফিরে এসে দেখে, দুখিয়া ঘরে ব'সে আছে। তখন দুজনে কত কথাই বল্‌তে লাগ্‌ল। মা জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, দুখিয়ার কোন অসুখ করেনি ত, তার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হয়নি ত, তারা কোথায় কোথায় গিয়েছিল, ভালুক দেখেছে কিনা, এই সব। আর দুখিয়া মহা উৎসাহ করে বল্‌ছে তারা কত রকম জন্তু মেরেছে, কি রকম গভীর বনে গিয়েছে, হাতীর পাল দেখেছে। পাগ্‌লা হাতীটা কেমন ক'রে গাছে ঢুঁ মার্‌ছিল তাই বল্‌তে বল্‌তে সে বল্‌ল, "মা, আর একটা ভারি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছি, তাকে আমরা সঙ্গে ক'রে এনেছি।" মা। "কি রকম জন্তু সেটা?"

দুখিয়া। "জন্তু নয় মা, মানুষ। কিন্তু সে একেবারে জংলি। তার চুলগুলো জটা পাকান, মস্ত মস্ত নখ। কথা বল্‌তে পারে না, খালি জন্তুদের মতন শব্দ করে।

সে আমার হাতে ছাড়া কারো হাতে খেতে চায় না। আমি তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আস্‌তে চেয়েছিলাম। সর্দ্দার বল্‌ল, "তোদের নিজেদের খাওয়া চলা মুস্কিল, আবার একজন বাড়্‌লে কষ্ট হবে, তা'ছাড়া তোরা ওকে সাবধান ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বি না, হয়ত কোথাও পালিয়ে যাবে। আমার এখানে ঢের লোকজন আছে, দেখ্‌বে শুন্‌বে। আমি ওকে খুব যত্ন কর্‌ব, তুই কিছু ভাবিস্‌না। আর তুই ত রোজই এসে ওকে দেখ্‌তে পারিস্, যতক্ষণ ইচ্ছা ওর কাছে থাক্‌তে পারিস্।—তোকে একবার তাকে দেখ্‌তে হবে মা।" মা খুব আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তাকে পেলি কোথা?" দুখিয়া। "নদীর ওপারের বড় জঙ্গলে ছিল, সেখান থেকে ধরে এনেছি।"

মা। "নদীর ওপারে? কত বড় সে? কোথায় ছিল সে? তার মা বাপ আছে?"

দুখিয়া। "আমরা তার মা বাপ ত দেখিনি, সে একাই ছিল। একটা গর্ত্তের ভিতর থাক্‌ত বোধ হয়। বেশী বড় না। আমার চেয়ে ছোটই হবে বোধ হয়।" দুখিয়া সাহস করে মাকে তার সন্দেহের কথা বল্‌ছে না।

মা। "তোর চেয়ে ছোট? কি রকম দেখ্‌তে? তোর মত কি?"

দুখিয়া হেসে বল্‌ল, "আমার কি জঙ্গলি চেহারা? তুই একবার গিয়ে তাকে দেখে আসিস্।"

মা। "চল্ এখনি চল্, আমার ভারি ইচ্ছা হচ্ছে দেখ্‌তে।"

দুখিয়া। "বাঃ, আমাকে খেতে টেতে দিবি না? একটু পরে যাস্ অখন। আর জানিস্ মা, তার গলায় একটা মালা আছে। তার গর্ত্তের ভিতর আবার একটা শুকান হরণের চাম্‌ড়াও ছিল, সে চাম্‌ড়াটা আমরা নিয়ে এসেছি। সর্দ্দার বল্‌ছিল, "সে নিশ্চয় এক সময়ে মানুষের কাছে ছিল, তা না হ'লে মালা আর চাম্‌ড়া এল কোথা থেকে?"

মা। "বলিস্ কি? চল্, শীঘ্র চল্ তাকে দেখে আসি।"

দুখিয়া। "তুই কি পাগল হলি? আমার ভারি খিদে পেয়েছে, আগে খেয়ে নি তারপর যাব। ঘরে কিছু থাকে ত দে।"

অল্প স্বল্প ফল যা ঘরে ছিল, তাই খেয়ে দুখিয়া আর তার মা সর্দ্দারের বাড়ী চল্‌ল। সেখানে সে ছেলেটিকে দেখ্‌বার জন্য ভীড় জমে গেছে। দুখিয়ার মা সকলকে ঠেলে ঠুলে একেবারে ছেলেটির কাছে গেল, তারপর খানিক তার মুখের

দিকে তাকিয়ে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মাটিতে বসে পড়্‌ল। তাই দেখে দু একজন তার কাছে এল, সর্দ্দারও এল। দুখিয়ার মা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "সর্দ্দার, এ আমার ছেলে।" সবাই একেবারে অবাক্। সর্দ্দার আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "সে কি রকম?" দুখিয়ার মা তখন তাদের কাছে তার ছেলে হারানর কথা বল্‌ল, আর বল্‌ল, "এই মালা আমি ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর দেখ, আমার ছেলের ডান পায়ের তলায় মস্ত একটা তিল ছিল, এই সেই তিল। মুখও দেখ্‌ছ না কি দুখিয়ারই মত?"

মুখ দেখে অবশ্য অন্য লোকে বিশেষ কিছু সাদৃশ্য বুঝ্‌ল না, মালা আর তিল দেখে তারা বুঝ্‌ল যে এ দুখিয়ারই ভাই। ছেলেটি এতক্ষণ ভয়ে শক্ত হয়ে মার কোলে বসেছিল, এত লোকজন দেখে সে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তাই সর্দ্দার লোকদের সরিয়ে দিয়ে, দুখিয়ার মাকে বল্‌ল, "তোমার ছেলেকে এখন এখানেই রাখ। আমরা ওকে যত্ন কর্‌ব। ওখে খেতে পরতে শেখাতে হবে। তুমি একলা সে সব পার্‌বে না। আমার বাড়ীতে তোমাকে আমি একটা ঘর দেব, সেই ঘরে তুমি দুখিয়া আর তোমার এই ছেলে থাক্‌বে। একটু ওর বুদ্ধি সুদ্ধি হ'লে পর ওকে নিয়ে বাড়ী যেও।" দুখিরার মা সর্দ্দারকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে, তার বাড়ীতেই রইল।

এই জংলি ছেলেকে মানুষ কর্‌তে তাদের অনেক পরিশ্রম হ'ল। সে খালি "মা" বল্‌তে পার্‌ত; আরও দু একটা অস্পষ্ট কি কথা বল্‌ত, বোঝা যেত না। বোধ হয়, ছেলে বেলা যা শিখেছিল, তাই একটু একটু মনে পড়্‌ত। কিন্তু ছেলেটির খুব বুদ্ধি, সে বেশ শীঘ্র শীঘ্র শিখে নিতে লাগ্‌ল। এতটুকু ছেলে অমন ভয়ানক জঙ্গলে কেমন ক'রে বেঁচে রইল, সে কথা কেউ ভেবে পেত না।

একদিন দুখিয়াদের বাড়ীর ছোট্ট উঠানটিতে তার মা ব'সে ঘাসের দড়ি পাকাচ্ছে। সেই উঠানের একপাশে একটা বাতাপি লেবুর গাছ। দুখিয়া হাতে তীর ধনুক নিয়ে একটা বাতাপি লেবুকে লক্ষ্য করে, তীর ছুড়তে যাচ্ছে। আর তার ছোট ভাই অবাক্ হয়ে দাদার দিকে চেয়ে আছে, তার ভাইয়ের চেহারা আর এখন জংলি নেই। মাথার জটা কেটে ফেলা হয়েছে, গলার সেই পুরাণ আঁট মালা বদ্‌লিয়ে নূতন মালা পরান হয়েছে। এখন তার মুখে দুখিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য বেশ বোঝা যায়। তাকে দেখ্‌তে বয়সের চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। বোধ হয়

অযত্নে, শরীর বেশী বাড়তে পায়নি, তাছাড়া মুখে কেমন ছেলে মানুষের মত ভাব। এখন সে অনেক কথা বল্‌তে শিখেছে; এখন আর লোক দেখ্‌লে ভয় পায় না।

দুখিয়া তার ভাইকে এক দণ্ড ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। ভাইও সর্ব্বদা তার কাছে কাছে ফির্‌ছে। দুখিয়ার এখন সুখের সীমা নেই। দুখিয়া লেবুটাকে বিঁধ্‌তে তীর ছাড়্‌বে ঠিক এই সময়—



একজন বুড়ো লোক সেই উঠানে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে দুখিয়ার মা উঠে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল সে কি চায়।

বুড়ো লোক। "আমি দুখিয়ার মার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।"

মা। "আমিই দুখিয়ার মা। আমার সঙ্গে কোন কাজ আছে? এইখানে বস।"

বুড়ো লোক। "হাঁ একটু কথা ছিল। সর্দ্দারের বাড়ীতে এসে শুন্‌লাম, তোমার একটি ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার পেয়েছ, সেই ছেলেকে দেখ্‌তে এসেছি।"

মা। "এই যে সেই ছেলে। এসত বাপ্।" বলে ছেলেকে ডাক্‌ল। ছেলেটি মার কাছে এসে দাঁড়িয়ে, ভয়ে ভয়ে বুড়োর দিকে চেয়ে রইল। দুখিয়ার মা বল্‌তে লাগ্‌ল, "দেবতার দয়া। না হ'লে এত ছোট ছেলে কি ভালুকের মুখে গিয়েও বেঁচে থাকে?"

বুড়ো। "সেই কথাই বল্‌তে এসেছি। সর্দ্দার বল্‌ছিল 'আমরা ভেবেই পাই না, ভালুকে কি করে ওকে মানুষ কর্‌ল?' তখন আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। যে জঙ্গলে ওকে পাওয়া গেছে, সেই জঙ্গলের ওপারে দু একখানা গ্রাম আছে। আমি ঐ গ্রামের একটাতে থাকি। আমাদের গ্রামে এক পাগ্‌লা যোগী ছিল। সে মাঝে মাঝে কিছু দিন চলে গিয়ে বনে থাক্‌ত, আবার হঠাৎ একদিন গ্রামে ফিরে আস্‌ত। একদিন সে ছোট্ট একটি ছেলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল। তার গলায় মালা, গায়ে একখানা হরিণের চাম্‌ড়া জড়ান। যোগীর ঘরে ত মেয়ে মানুষ কেউ নেই, গ্রামের অন্য মেয়েরা দুধ টুধ এনে ছেলেটিকে খাওয়াত। তারপর একদিন যোগী বনে চলে গেল, সঙ্গে ছেলেটিকেও নিয়ে গেল। এমনি করে সে, বনে কি ঘরে কি, সেই ছেলেকে কাছে কাছে রাখ্‌ত; বনে তাকে কি খাওয়াত কি কর্‌ত, সেই জানে। আমরা কত বল্‌তাম, 'বনে যখন যাও আমাদের কাছে রেখে যেও।' সে শুন্‌ত না, পাগ্‌লা কিনা। একবার সে যে বনে গেল, আর ফির্‌ল না। আমরা মনে কর্‌লাম দুজনকে বাঘে খেয়েছে। তারপর আজ একটা কাজে এখানে এসে সর্দ্দারের বাড়ীতে উঠে, সর্দ্দারের শিকারের গল্প, তোমাদের কথা সব শুন্‌লাম। শুনে মনে হ'ল 'এ সেই যোগীর পালা ছেলে নয়ত'?"

দুখিয়ার মা বার বার কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "সবই দেবতার কাজ, সবই তাঁদের দয়া।"

সমাপ্ত

শ্রীসুখলতা রাও।

এগ্‌বার্টের লাঞ্ছনা

(পিয়ার্‌সন্ ম্যাগেজিন্ হইতে)

ষ্টেজে য়্যাক্‌টিং করে রোজ রোজ বাহবা পেলে, কার না ভাল লাগে? এগ্‌বার্ট যে ষ্টেজে তামাসা দেখান মোটেই পছন্দ কর্‌ত না—প্রতিদিন প্রশংসা শুনে শুনে তারও রুচি বদ্‌লিয়ে গেল। এখন সে রোজ রাত্রে, বল্‌বামাত্রই দর্শকদের নমস্কার করে, মর্‌সকোডের তামাসা দেখায়—আর খুব ভাল করেই দেখায়। আবার খেলার শেষে ষ্টেজ থেকে চলে যাবার সময়ও, বেশ কায়দামাফিক্ মাথাটি নীচু করে "নড্" (নমস্কার) করে যায়। সুতরাং এরূপ উঁচুদরের শিক্ষিত গণ্ডারের তামাসা দেখ্‌তে যে প্রতি রাত্রে লোকে লোকারণ্য হত, সেটা বলাই বাহুল্য।

এড্‌ওয়ার্ড দেখ্‌ল, যে, খরচ পত্র বাদে তার হাতে যা থাকে, তত টাকা সে তার মামার আপিসে কাজ করে কখনও পেত না। উপার্জ্জনের নেশায় তারা বেচারি এগ্‌বার্টের মুক্তির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সেই যে খবরের কাগজে ম্যাজিসিয়ানের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, তা ছাড়া অন্য কোন রকম চেষ্ট করা হয়নি। বিজ্ঞাপনের ফল ত আমরা জানি। মাঝে মাঝে এগ্‌বার্টের কথা মনে হলেই এর্ডওয়ার্ড ভাব্‌ত—"ম্যাজিসিয়ান্‌কে খুঁজে পাওয়া গেলেও, সে যে এগ্‌বার্টকে আবার মানুষ করে দিতে রাজি হবে, তা কে জানে? হয়ত বা বেশী পীড়াপীড়ি কর্‌লে, সে রেগে আমাকেই কোন একটা জানোয়ার বানিয়ে দিবে, আর তখন আমিও এগ্‌বার্টের সঙ্গে একই খাঁচায় থাক্‌ব!" এই সব নানা কথা ভেবে, এগ্‌বার্টের শাপের কথা মনে পড়্‌লেও, এড্‌ওয়ার্ড সেটাকে চাপা দিয়ে ফেল্‌ত।

ক্রমে লণ্ডনের বাইরে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেজ্ থেকে, বোরেস্‌ফোর্ড সাহেবের দলের নিমন্ত্রণ আস্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বৎসরের খেলার আগাম ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঘুরে বেড়াতে হলে এগ্‌বার্টের জন্য একটা "ট্রাভেলিং" (ঘুরে বেড়ানর উপযুক্ত) খাঁচার দরকার—তারও ব্যবস্থা করা বাকি রইল না।

আয়োজন শেষ হলে পর, বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবের দল মাস কয়েক এখানে সেখানে, নানা ষ্টেজে গণ্ডারের খেলা দেখিয়ে বেড়ালেন; তাতে দলের প্রশংসা যেমন ছড়িয়ে পড়্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জনেরও কসুর হলো না। ক্রমে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হলে, দেখা গেল, যে, এগ্‌বার্টের উৎসাহ যেন কমে যাচ্ছে। শুধু ষ্টেজের খেলায় তার কি হবে, গণ্ডারের উপযুক্ত পরিশ্রম ত আর তার হয় না—সুতরাং বেচারির উৎসাহ কমে যাওয়াটা আর আশ্চর্য্য কি? মাঝে মাঝে এড্‌ওয়ার্ডকে একা পেলেই এগ্‌বার্ট মর্‌সকোডে খালি বলে, যাদুকরকে খুঁজে বা'র কর্‌তে। তা দেখে এড্‌ওয়ার্ডেরও মন খারাপ হয়, কিন্তু সে-ই বা করে কি?

এই সময়ে হঠাৎ যেন একটা গরম বাতাসের ঢেউ এসে উপস্থিত হলো, আর যেন টেকা যায় না। এইরূপ অবস্থায় বেরেস্‌ফোর্ড সাহেবের দল খুব বড় একটা বনের ধারে ওয়েষ্টবরো সহরে গিয়ে উপস্থিত! সেখানে একটা ষ্টেজে জলের খেলা দেখান হতো। খেলাটার নাম ছিল "বাষ্টিং ড্যাম্" অর্থাৎ বাঁধ ভাঙ্গা। প্রকাণ্ড বাঁধে জলভর্ত্তি, তাতে এমন কল কৌশল করা, যে, ইচ্ছা কর্‌লেই, কল টিপে দেবামাত্র বাঁধের জল ফোয়ারার মত, বৃষ্টির মত এবং বন্যার জলের মত নানা

রকমের হয়ে এসে ষ্টেজ ভাসিয়ে দেয়। অবশ্যি তাতে ষ্টেজের লোক জনের কাপড় চোপড় ভিজে যায় বটে, কিন্তু আমোদ মন্দ নয়। আর এই দারুণ গরমে সেটা বরং ভালই। এই "বার্ষ্টিং ড্যাম্" ষ্টেজেই গণ্ডারের খেলাও দেখাতে হবে। সেদিন ছিল রবিবার, সোমবার রাত্রে য়্যাক্‌টিং আরম্ভ হবে প্রথমেই গণ্ডারের খেলা দিয়ে।

সোমবার রাত্রে এগ্‌বার্টের তামাসা ভাল মতেই শেষ হলো। তারপরই বার্ষ্টিং ড্যামের তামাসা, তারপর আবার এগ্‌বার্ট। বার্ষ্টিং ড্যাম্ হয়ে গেলে, দেখা গেল ষ্টেজ একেবারে জল-ময়। এড্‌ওয়ার্ড ষ্টেজের চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌ল, পরের খেলার আগেই ষ্টেজ্ পরিষ্কার করা হবে।

গণ্ডারের খাঁচা খুলে দিয়ে এড্‌ওয়ার্ড দর্শকদের পাশে এসে দাঁড়াল। তখনও ষ্টেজ্ ভিজা, জল আসা বন্ধ হচ্ছে না। কি আর করা যায়, ভিজা ষ্টেজেই এগ্‌বার্ট খেলা দেখাবে। ধীরে ধীরে ক্যাথেলিন্ গণ্ডার নিয়ে এসে উপস্থিত। এড্‌ওয়ার্ড দর্শকদের চেয়ে দেখ্‌ছিল, এমন সময় সে দেখ্‌তে পেল, যে, দর্শকদের মধ্যে, চতুর্থ লাইনে সেই যাদুকর বসে আছে !! আর একটু হলেই সে চীৎকার করে উঠেছিল আর কি! খুনী লোকের যেমন খুন করার পর, খুনের জায়গা আবার দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়, তেমনি দুষ্ট যাদুকরও বোধ হয় একটা অদম্য আকর্ষণে এগ্‌বার্টের খেলা দেখ্‌তে এসেছে।

যাহোক্, এড্‌ওয়ার্ডের মনের অবস্থা তখন গুরুতর! খানিক দূরেই এগ্‌বার্টের উদ্ধারকর্ত্তা বসে আছে। এদিকে আবার এগ্‌বার্টের তামাসা শেষ হতেই, তাকে নিয়ে খাঁচায় বদ্ধ করা চাই—সুতরাং, তখনই এড্‌ওয়ার্ডকে ষ্টেজে যেতে হবে। আবার খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত যাদুকর দিবে চম্পট—এরূপ অবস্থায় এড্‌ওয়ার্ডের কর্ত্তব্য কি? সে একটু ভেবে, ষ্টেজের ম্যানেজারকে গিয়ে ডেকে আন্‌ল। এনে যাদুকরকে দেখিয়ে বল্‌ল—"মশায়! অনুগ্রহ করে ঐ লোকটার দিকে নজর রাখুন, আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি।" বলেই সে ছুটে গেল, এগ্‌বার্টকে বন্ধ কর্‌তে। ক্যাথেলিন্ কিংবা এগ্‌বার্টকে যাদুকরের কথা কিছু বল্‌ল না। ভাব্‌ল, আগে থেকে আশা দেওয়াটা ঠিক হবে না, পরে যদি সব ফেঁসে যায়? তাই সে এগ্‌বার্টকে তাড়াতাড়ি খাঁচায় পুরে, ধড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েই, আবার দর্শকদের গ্যালারিতে এসে দেখে—কি সর্ব্বনাশ! যাদুকরের জায়গাটি খালি পড়ে আছে !!

ম্যানেজার তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এড্‌ওয়ার্ড রাগে আগুন হয়ে তাকে সবে বলেছে—"মশায়!" অম্‌নি ম্যানেজার তাকে বাধা দিয়ে বল্‌ল—"দোহাই আপনার, এখন আমাকে বিরক্ত কর্‌বেন না, ষ্টেজে কি জানি একটা কাণ্ড হয়েছে!"

এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"তাত, বুঝ্‌লাম, কিন্তু লোকটা যে চলে গিয়েছে—আপনাকে না দেখ্‌তে বলে গিয়েছিলাম?"

ম্যানেজার—"কে, ডাক্তার উইলিয়াম্‌সন্? আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন মশায়। কিন্তু—

এড্‌ওয়ার্ড বাধা দিয়ে বল্‌ল—"কে ডাক্তার উইলিয়াম্‌সন্?"—"এই যাঁর সঙ্গে আপনি কথা বল্‌তে চেয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি তাঁকে জানেন। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌লেই ত পারেন?"

এড্‌ওয়ার্ড—"তাঁর ঠিকানা কি?"

ম্যানেজার—"দি প্লেসেন্স্, সাউথ্ রোড্। না মশায়, আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌ছি না—বার্ষ্টিং ড্যামের জানি কি একটা গোলমাল হয়েছে।" বলেই ম্যানেজার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। তখন এড্‌ওয়ার্ড ষ্টেজের দিকে চেয়ে দেখে, বৃষ্টিধারার মত জল ক্রমাগতই ষ্টেজে পড়্‌ছে, লোকেরা শত চেষ্টা করেও থামাতে পার্‌ছে না। হয়ত বা ড্যাম্ (বাঁধ) এখনই ফেটে যাবে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সত্যি সত্যি ড্যাম্ ফেটে গেল! আর তখন ষ্টেজে রীতিমত বন্যা! দর্শকেরা "সর্ব্বনাশ হয়েছে, ড্যাম্ ফেটে গিয়েছে—পালা, পালা" বলে, কে যে কোন্ দিকে ছুটে পালাবে তার ঠিক নাই—চার্‌দিকে মহা এক হুলস্থুল ব্যাপার লেগে গেল!

এড্‌ওয়ার্ড অবাক্ হয়ে সব দেখ্‌ছিল, এমন সময় কে যেন তার কোটের হাতায় ধরে টান্‌ল। চেয়ে দেখে, ষ্টেজেরই এক ছোক্‌রা! সে বল্‌ল—"মিষ্টার য়্যাল্‌বেট্! (এড্‌ওয়ার্ড) এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? শীগ্‌গির যান—আপনার গণ্ডার ছুটে পালিয়েছে !!" তখন এড্‌ওয়ার্ডের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে, যাদুকরকে ধর্‌বে বলে তাড়াতাড়ি কর্‌তে গিয়ে, সে, এগ্‌বার্টের খাঁচার খিল্‌টা না লাগিয়েই চলে এসেছিল। একে এই ভীষণ গরমে এগ্‌বার্টের মেজাজ খারাপ, তার উপর ষ্টেজে বন্যার এই হুলস্থুল ব্যাপার! সুতরাং খোলা দরজার সুযোগটি সে ছাড়তে না পেরে, পালিয়েছে।

ষ্টেজের ছোক্‌রার সঙ্গে খাঁচার কাছে পৌঁছে এড্‌ওয়ার্ড দেখ্‌ল—ঐ দূরে রাস্তায় গণ্ডার ছুটে যাচ্ছে, আর যাচ্ছে ঠিক সেই বনটির দিকে!! রাস্তার লোকজনের দুরবস্থার কথা আর বিশেষ করে বল্‌বার আবশ্যক নাই—চীৎকার, চেঁচামেচি, হোঁচট্ খাওয়া, এ ওর ঘাড়ে পড়া—তাছাড়া আরো কত যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা কে জানে? এড্‌ওয়ার্ড বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, এগ্‌বার্টকে ধরা বড় সহজ ব্যাপার হবে না, কারণ, এসব জায়গার খবর তার খুব ভাল রকমই জানা আছে—একবার বনে গিয়ে ঢুক্‌তে পার্‌লে, কার সাধ্য তাহাকে সহজে ধরে। হায় রে হায়! যাদুকরের সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এগ্‌বার্টের পলায়ন!! এযে দুর্ভাগ্যের একেবারে চরম সীমা!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে এগ্‌বার্টের পলায়নের সংবাদ সহরময় ছড়িয়ে পড়্‌ল। একদল পুলিষ, কুকুর টুকুর নিয়ে ছুট্‌ল গণ্ডারের সন্ধানে। কিন্তু তাকে পাবে কোথা? এগ্‌বার্ট কখন গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এমন চালাকি করে গিয়েছে, যে, পথে কোন চিহ্ন রেখে যায়নি যা ধরে কেউ তার সন্ধান পাবে। পুলিষের দল বনের ধারে নদীর পার দিয়ে, অনেক দূর পর্য্যন্ত সন্ধান কর্‌ল কিন্তু সবই হলো বিফল।



এভাবে দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে একজন লোক এসে বল্‌ল, সে বনের ধারে গণ্ডার দেখেছে—প্রকাণ্ড বড় গণ্ডার, কি ভীষণ ছুট্‌তে পারে! তারপর এক গৃহস্থ টেলিফোন করে বল্‌ল, যে, আগের দনি রাত্রে তার খড়ের গাদার অর্দ্ধেক খড় কিসে জানি খেয়ে গিয়েছে! তা শুনে এড্‌ওয়ার্ড বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, এটা এগ্‌বার্টেরই কাজ না হয়ে যায় না।

এড্‌ওয়ার্ড তখনই তার মটরগাড়ী নিয়ে হোটেলের দরজায় গিয়ে ক্যাথেলিনের অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। ক্যাথেলিন্ নেমে এলেন, তাঁর হাতে বিকালের খবরের কাগজ—মুখ গম্ভীর। এসেই বল্‌লেন—"এড্‌ওয়ার্ড! কাগজটা পড়ে দেখ।" কাগজ নিয়ে এড্‌ওয়ার্ড পড়্‌ল—"গত সোমবার যে গণ্ডারটা পালিয়েছে, সেটা এখনও ধরা পড়েনি। ওয়েষ্টবরোর লোকজন ভয়ে অস্থির, তাই গভর্ণমেণ্ট্ বিখ্যাত শিকারী স্যার্ হেন্‌রি টমাস্ ফরেষ্টার্‌কে অনুরোধ করেছেন, গণ্ডারটাকে মেরে ফেল্‌তে। স্যার হেন্‌রি এখন লণ্ডনে, বন্দুক টন্দুক নিয়ে যাত্রার আয়োজন কর্‌ছেন, কাল তিনি ওয়েষ্টবরোতে পৌঁছাবেন।"

এই সংবাদ পড়ে এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"ক্যাথেলিন্, এযে বড় সাংঘাতিক সংবাদ! স্যার হেন্‌রি বিখ্যাত শিকারী। আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ হাতী প্রভৃতি শিকার করে তাঁর খুব নাম হয়েছে। তিনি এসে পড়্‌লে এগ্‌বার্টের দফা রফা। তার আগেই



একটা কিছু উপায় কর্‌তে হবে—শীগ্‌গির মটরে উঠ।"

মটর গৃহস্থের বাড়ী পৌঁছাতেই সে ছুটে এসে বল্‌ল—"এই দেখুন মশায়! খড়ের গাদায় কত বড় গর্ত্ত!" গর্ত্তটা দেখেই এড্‌ওয়ার্ড বল্‌ল—"তা ত দেখ্‌ছি কিন্তু এতবড়

গর্ত্তটা ত এক দিনের খাওয়ায় হতে পারে না? নিশ্চয় তাহলে গণ্ডারটা পালিয়ে অবধি রোজ রাত্রে এসে খেয়েছে। আচ্ছা, গর্ত্তটা প্রথম দিনেই দেখ্‌তে পেলে না কেন?"

গৃহস্থ—"আজও দেখ্‌তে পাওয়া যেত না। আমার ছোট্ট মেয়েটি এসে ঠিক এই খান্‌টায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতে গিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়ে, তাই ত দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছে? মনে হয়, যেন, গণ্ডারটা খড় খেয়ে ইচ্ছা করেই গর্ত্তটা খড় দিয়ে চাপা দিয়েছিল। আবার ভাবি, দূর্, গণ্ডারের কি এতটা বুদ্ধি থাক্‌তে পারে?"

এড্‌ওয়ার্ড খালি বল্‌ল—"এ গণ্ডারের সে বুদ্ধিটুকু আছে।" তখন তার মাথায় কি জানি একটা মতলব খেল্‌ছে। খানিকক্ষণ ভেবে ক্যাথেলিন্‌কে বল্‌ল—"সত্যি সত্যি যদি এগ্‌বার্টই গর্ত্তটাকে এমন করে চাপা দিয়ে থাকে, তাহলে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, যে, আজ রাত্রেও সে আবার খড় খেতে আস্‌বে।" ক্যাথেলিন্ বুঝ্‌লেন, এড্‌ওয়ার্ডের অনুমান ঠিক। তখন বল্‌লেন—"এখন তাহলে কি কর্‌বে?" এড্‌ওয়ার্ড—"গর্ত্ত খুঁড়ে তাকে ফাঁদে ফেল্‌ব।"

আর এক মুহূর্ত্তও দেরি কর্‌লে চল্‌বে না, এড্‌ওয়ার্ড তখনই গৃহস্থকে দিয়ে জন কয়েক মজুর আনিয়ে প্রকাণ্ড বড় এবং গভীর একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়ে ফেল্‌ল। তারপর ডাল পালা খড় কুটো দিয়ে এমন ভাবে সেটাকে চাপা দিল, যে, সহজে যাতে গর্ত্ত বলে টের পাওয়া না যায়—ঠিক যেমন করে বুনো শিকারীরা, বাঘ ভালুক ধর্‌বার জন্য জঙ্গলে গর্ত্তের ফাঁদ তৈরি করে। ফাঁদটা হলো খুবই সুন্দর কিন্তু তবু এড্‌ওয়ার্ডের ভাবনা হলো—এগ্‌বার্টের মত এমন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি জন্তু কি এ ফাঁকিতে ভুল্‌বে? যাহোক্, এতেই কাজ বাগাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে—এই ভেবে সে ক্যাথেলিন্‌কে বল্‌ল—"ক্যাথেলিন্! এই ফাঁদে তাকে টেনে আন্‌বার জন্য একটা কিছু আকর্ষণ চাই। আচ্ছা, এগ্‌বার্ট কোন্ জিনিষ খেতে খুব ভালবাসে?"

ক্যাথেলিন্ বল্‌লেন—"ষ্ট্রবেরির পুডিং তার খুব প্রিয় খাদ্য, তার গন্ধে সে পাগল হয়ে যায়।" এড্‌ওয়ার্ড—"বাস্, খাসা হবে। শুক্‌নো খড় খাবার পর ষ্ট্রবেরির গন্ধ পেলে সে দিশেহারা না হয়ে যাবে না।"

ষ্ট্রবেরির পুডিং তৈরি হলো—এই বড় প্রকাণ্ড পুডিং! গৃহস্থের সমস্ত গাছ নিঃশেষ হয়ে গেল, অবশ্যি তার দাম পেল সে পাঁচ গুণ। পুডিংটাকে গরুর বিছালি খাবার একটা কাঠের গামলায় করে, সেই গর্ত্তের ঠিক মধ্যখানে রেখে দেওয়া হলো।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলে, এড্‌ওয়ার্ড আর ক্যাথেলিন্ কাছেই খড়ের গাদার উপরে বসে রইলেন, পাহারা দিবার জন্য।

দুইজন খড়ের গাদার উপর, নড়া নেই চড়া নেই, প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে বসে অনেকক্ষণ কাটালেন। ক্রমে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল, মেরুদণ্ডে ব্যথা হলো—তবু এগ্‌বার্টের দেখা নাই। দুইজন বসে বসে আর পারেন না, নিরাশই হয়েছেন—এমন সময় হঠাৎ এড্‌ওয়ার্ড দেখ্‌ল—ঐ বেড়ার অন্ধকারের ভিতর থেকে, ছায়ার মত একটা কি তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। খানিক এসেই আবার থম্‌কে দাঁড়াল, যেন কাণ পেতে শুন্‌ছে—একটু সন্দেহ হলেই ছুটে পালাবে। ঐ অল্প আলোতেই এড্‌ওয়ার্ড দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, এগবার্টের মুখে পূর্ণ সন্দেহের ভাব।

হঠাৎ দেখা গেল, নাকটি তুলে এগ্‌বার্ট যেন কিসের গন্ধ নিচ্ছে। শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে দু চার পা এগিয়ে গেল—ফাঁদের দিকে। ততক্ষণে ষ্ট্রবেরির গাম্‌লা তার চোখে পড়েছে, আর অম্‌নি যেন সে খুব চম্‌কে উঠ্‌ল। বুঝিবা এবারে ভোঁ দৌড় দিয়ে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু তা নয়। ধীরে ধীরে একটু একটু করে এগুতে লাগ্‌ল। এমন সময় হঠাৎ ঘোঁৎ করে এক শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে এগ্‌বার্টের পিছিয়ে যাওয়া দেখে, এড্‌ওয়ার্ড বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, সব মাটি—এগ্‌বার্ট ফাঁদ টের পেয়েছে।

এগ্‌বার্ট তখনই একেবারে ঘুরে দাঁড়াল, যেন বনে পলায়ন কর্‌বার মতলব। যাহোক্, চারিদিকে নিস্তব্ধতা দেখে তার ভরসা ফিরে এলো, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সাম্‌নের একখানা পা ফাঁদের উপর তুলে দিল—কতটা মজবুত তা দেখ্‌বার জন্য। ফাঁদের আবরণটা গাম্‌লার পক্ষে খুবই মজবুত ছিল বটে, কিন্তু সেটা গণ্ডারের পক্ষে কিছুই নয়।

এগ্‌বার্ট তখন মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে, ঠিক সাপের মত করে গা মুড়ামুড়ি দিয়ে, গর্ত্তের উপরে খানিকটা গিয়েছে, ভারি হুঁশিয়ার হয়ে, আস্তে আস্তে একটু একটু করে। এমন সময় মড় মড় শব্দ করে উঠাতে, সে বুঝ্‌তে পার্‌ল, যে, আর এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। তখন সেই অবস্থায় থেকেই মুখটা বাড়িয়ে দিল। এড্‌ওয়ার্ড বুঝ্‌তে পার্‌ল, কোন রকমে যদি গাম্‌লার হাতোলের ফুটোতে তার শিং ঢুকিয়ে দিতে পারে, তবে সহজেই সেটাকে টেনে আন্‌তে পার্‌বে। কিন্তু ভীষণ চেষ্টার পরও এগ্‌বার্ট দেখ্‌ল, যে, হাতোলটা তবু ফুট্‌খানেক দূরে আছে।

তখন সে উঠে বস্‌ল, বসে খানিকক্ষণ যেন কি চিন্তা কর্‌ল। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে যেন ভারি তৃপ্তির ভাব। কাছেই একটা খুব ভারি পুরাণো গাড়ী ছিল—খড় নেবার। এই গাড়ীটা দেখ্‌তে পেয়ে, সেটার পিছনে গিয়ে ঠেলে ঠেলে সেটাকে গর্ত্তের দিকে নিয়ে চল্‌ল। গর্ত্তের কিনারায় নিয়ে গিয়ে, সে যা কর্‌ল তা দেখে এড্‌ওয়ার্ডের ত চক্ষু স্থির! এগ্‌বার্ট কর্‌ল কি, ঠিক আগের মত মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে, পিছনের একটা পা গাড়ীর চাকার ডাণ্ডাটার তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে, খুব মজবুত

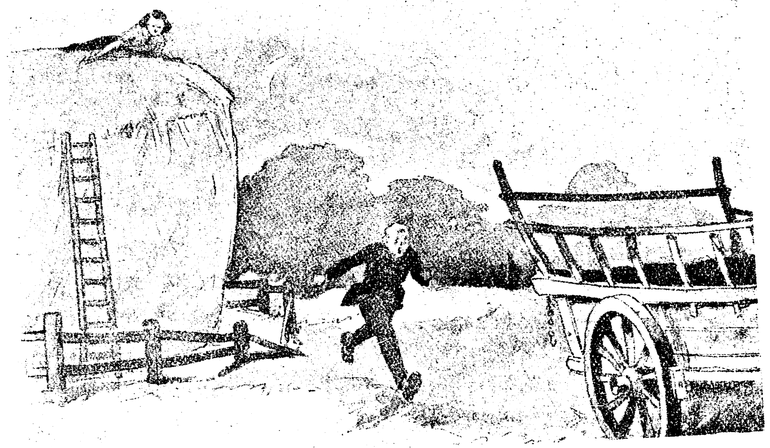

করে আট্‌কে দিয়েছে। এতবড় ভারি একটা জিনিষে পা-টা আট্‌কিয়ে নেওয়ায়, শরীরটাকে আগেকার চাইতে অনেকখানি বেশী এগিয়ে নিতে পার্‌ল। তখন দেখা গেল, যে, গলাটি বাড়িয়ে দিবামাত্র, তার শিং গাম্‌লার হাতোলের ফুটোতে ঢুকিয়ে দিতে আর কোন মুস্কিল হলো না। কি সর্ব্বনাশ! এবারে ত ষ্ট্রবেরি পুডিং সাবার কর্‌বে? আর সাবার করেই ত চম্পট দিবে বনে—তবেই ত কাল স্যার হেন্‌রির হাতে এগ্‌বার্টের দফা রফা!

এড্‌ওয়ার্ড আর মুহূর্ত্তও দেরি কর্‌ল না। এগ্‌বার্ট তখন পুডিংএর লোভে উন্মত্ত, অন্য দিকে তার খেয়ালই নাই। এই সুযোগে এড্‌ওয়ার্ড খড়ের গাদা থেকে নেমে,

পা টিপে টিপে সেই গাড়ীটার পিছনে গিয়ে উপস্থিত! গিয়েই গাড়ীতে পিঠ লাগিয়ে প্রাণপণে এক ঠেলা—সে কি সহজ ঠেলা, তার শরীরের সমস্ত মাংসপেশী চড় চড় করে উঠ্‌ল, হাড্ডিগুলি মড় মড় করে উঠ্‌ল। আর গাড়ীটা তাতে আট দশ ইঞ্চি এগিয়ে গেল। তাতেই যে কাজ হলো, তার প্রমাণও পাওয়া গেল তখনই।

গাড়ী সাম্‌নের দিকে হঠাৎ এগিয়ে যাওয়াতে, এগ্‌বার্টের পিছনের পা হয়ে গেল ঢিলা, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের ওজনটা সাম্‌নের দিকে গিয়ে ঝুঁকে পড়্‌ল। তখনই শোনা গেল গর্ত্তের উপরের আবরণের মড় মড় শব্দ আর এগ্‌-বার্টের ভীষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ। মুহূর্ত্তের জন্য গর্ত্তের কিনা-রায় প্রাণপণে

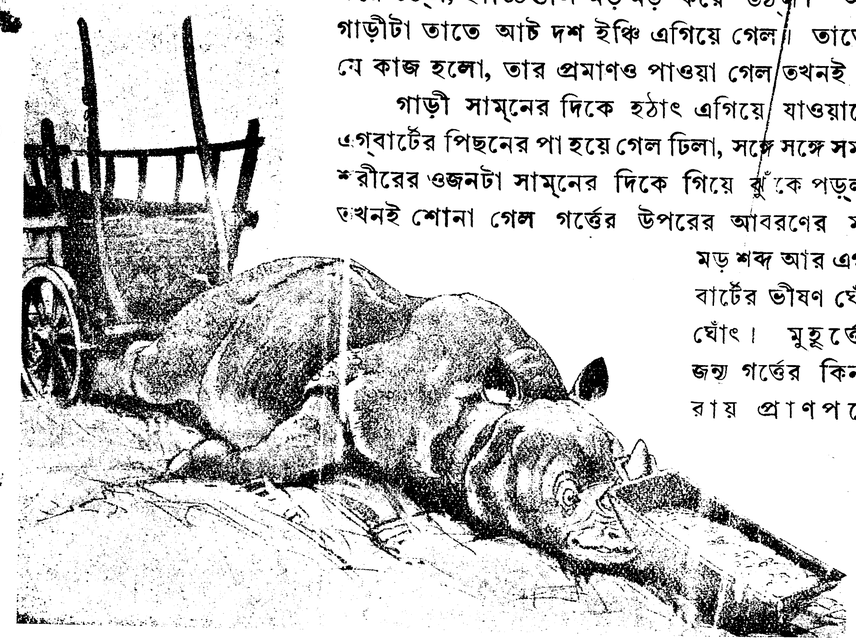

খাম্‌ছা খাম্‌ছি করে, শেষে এগ্‌বার্ট আবরণ টাবরণ শুদ্ধ একেবারে গর্ত্তের নীচে! তখন ভীষণ "ধ্বপ্" করে একটা শব্দ যা হলো! আর পুডিংএর পাত্রটা উল্টে যাওয়ায়, ষ্ট্রবেরির গন্ধে চারিদিক্ একেবারে ভরপূর!

আগামীবারে যাঁদুকরের সন্ধান এবং এগ্‌বার্টের লাঞ্ছনার শেষ হবে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

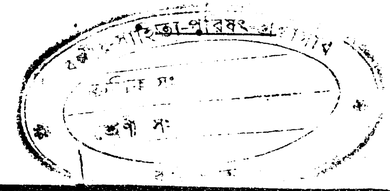

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

দাঁ
ছি
সো
ত্রে
শু

মায়ের আদর

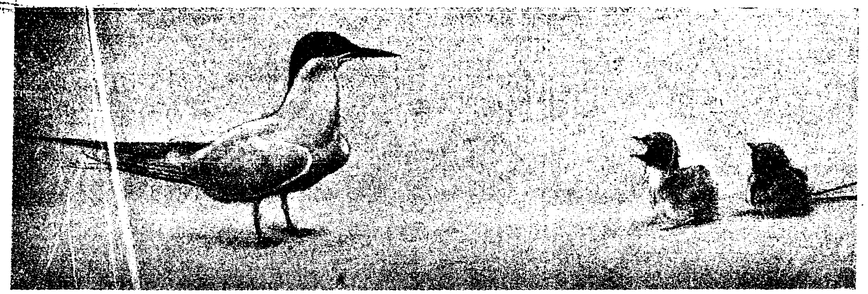

হাঁটি হাঁটি পা পা।



হাতির বাচ্চার স্নান

তোমরা যেমন মায়ের কাছে আদর যত্ন পাও, পশু-পাখীর ছোট ছানারাও তাদের মায়ের কাছ থেকে সেই রকম আদর-যত্ন পেয়ে থাকে। তারাও তাদের মায়ের কোলে নিরাপদে থাকে। এবার কতগুলি ছবি দিলাম; সবগুলিই মায়ের কাছে পশু-পাখীর ছানার ছবি। আশা করি এগুলি দেখে তোমাদের ভাল লাগ্‌বে।

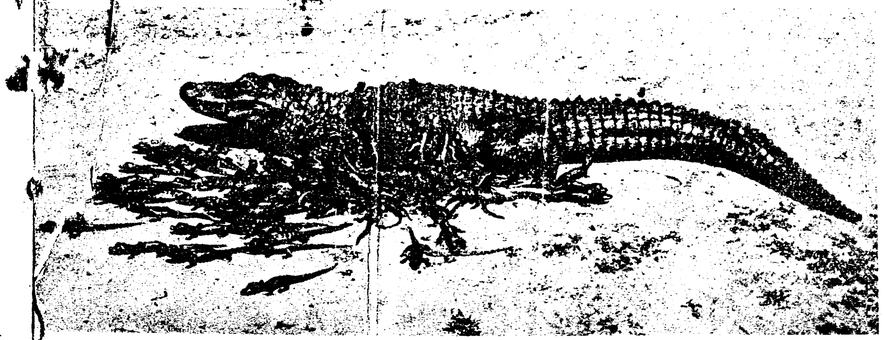

কুমীর-মায়ের ছেলেপিলে!



হরিণ-মায়ের পাশে হরিণছানা

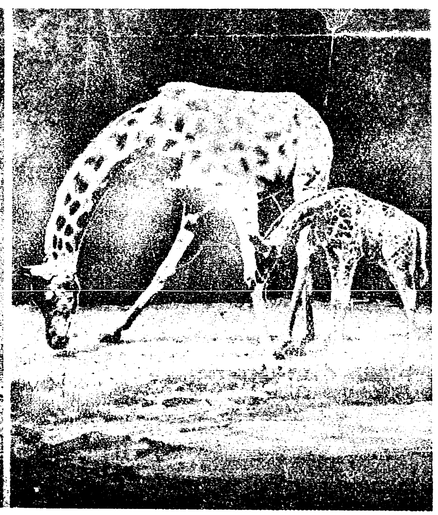

জিরাফ-মা আর তার ছানা

পোষা বানরের কোলে বানর-ছানা

চিড়িয়াখানার সিংহ আর তার ছানা

পেঙ্গুইন মা আর ছানা

রাজহাঁসের পিঠে বানা

Repaired
Document